জন্ম-শতবর্ষ-স্মরণে

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

দশম খণ্ড

উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা

প্রকাশক
স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
কলিকাতা-৩

প্রথম সংস্করণ
পৌষ-কৃষ্ণাসপ্তমী, ১৩৬৭

মুদ্রক
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

শ্রীহরেকৃষ্ণ ঘোষ
অথেণ্টিক প্রেস
৩০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৫

প্রকাশকের নিবেদন

এই খণ্ডটিই 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'র দশম ও শেষ খণ্ড। এই দশ খণ্ডে স্বামীজীর সব বক্তৃতা ও রচনার অনুবাদ যে আমরা দিতে পারিয়াছি, ঐ-কথা জোর করিয়া বলা যায় না। মৌলিক বাংলা রচনা কিছু বাদ গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না, অনুবাদ সামান্য কিছু বাদ গিয়াছে, অল্প কিছু অনুবাদ করা সম্ভব হয় নাই। তবে পাঠক-পাঠিকাগণ বুঝিবেন, স্বামীজী একই তত্ত্ব বহুবার বুঝাইয়াছেন, বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাবে বুঝাইয়াছেন।

অতএব বক্তৃতা বা রচনা দু-চারিটি বাদ গেলেও স্বামীজীর প্রধান ভাবগুলি এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে যথাসম্ভব সংগ্রথিত হইয়াছে। কালক্রমে অবশ্য আরও পত্র, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়া যাইতে পারে।

এই দশম খণ্ডটিকে এই গ্রন্থাবলীর পরিশিষ্ট বলা যায়। ইহার প্রথমাংশ 'আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট', প্রধানতঃ শ্রীমতী মেরী লুই বার্কের মহাগ্রন্থ 'New Discoveries' হইতে সংগৃহীত এবং স্যান ফ্রান্সিস্কো আশ্রমের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ কর্তৃক অনূদিত।

দ্বিতীয়াংশ আইডা আনসেলের সংক্ষিপ্ত নোট অবলম্বনে তাঁহার দ্বারাই লিখিত রচনার অনুবাদ।

তৃতীয়াংশ বিবিধ সংগ্রহ—ছোট বড় নানা বিষয়ের সমাবেশে স্বামীজীর বহুমুখী চিন্তাধারার বিচিত্র বিকাশ ও প্রকাশ।

শেষাংশ 'উক্তি-সঞ্চয়ন' প্রধানতঃ ভগিনী নিবেদিতার অমর গ্রন্থ 'Master as I saw Him' হইতে স্বামীজীর উক্তি-চয়ন।

অতঃপর সন্নিবেশিত হইয়াছে স্বামীজীর লেখার, বক্তৃতার ও ভ্রমণের সময়সূচী। সর্বশেষে এই গ্রন্থাবলীতে স্বামীজী কর্তৃক আলোচিত বিষয়গুলির একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী (Subject Index) প্রদত্ত হইল। আশা করি গবেষণাকারীদের ইহা বিশেষ কাজে লাগিবে।

এই গ্রন্থাবলী প্রকাশে যে-সকল শিল্পী ও সাহিত্যিক আমাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা

জানাইতেছি। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বর্তমান গ্রন্থাবলীর প্রচ্ছদপটও অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় তাঁহারই পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা' প্রকাশে আংশিক অর্থসাহায্য করিয়া আমাদের প্রাথমিক প্রেরণা দিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে আমরা পুনরায় ধন্যবাদ জানাইতেছি।

প্রকাশক

সূচীপত্র

আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট

ভূমিকা

'আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট'—এই অংশ চিকাগো মহাসভার পূর্বে ও তাহার পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত স্বামীজী যে সব বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহারই আংশিক বিবরণীর অনুবাদ। এগুলি যে-সব কাগজে যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, বহু পরিশ্রমে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া ১৯৫৮ খৃঃ মেরী লুই বার্ক তাঁহার বিখ্যাত 'Swami Vivekananda in America—New Discoveries' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর স্বামীজী সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তদানীন্তনকালে স্থানীয় সংবাদপত্রে স্বামীজীর সংবাদগুলি কিভাবে প্রকাশিত ও পরিবেশিত হইয়াছিল, তাহাই এখানে লক্ষণীয়। বক্তৃতার বিবরণীতে বা বিষয়বস্তু ধারণায় অনেক ভুল ধরা পড়িবে। স্বামীজীর নামের বানানও ঠিক নাই, এগুলি সংশোধন করা হয় নাই, প্রয়োজনীয় পাদটীকা প্রদত্ত হইয়াছে। শিরোনামাগুলি অবশ্য আমাদের দেওয়া, কোথাও কোথাও দু-চারিটি ব্যাখ্যামূলক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন—উদ্বোধনের প্রাক্তন সম্পাদক, অধুনা স্যানফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির সহকারী 'আচার্য' স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

ভারতের ধর্ম ও রীতিনীতিসমূহ

'সালেম ইভনিং নিউজ', ২৯শে অগস্ট, ১৮৯৩

গতকল্য বিকালবেলায় আবহাওয়া খুব গরম থাকা সত্ত্বেও 'থট্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব'-এর ('চিন্তা ও কাজ সমিতি') বেশ কিছু সভ্য-সভ্যা তাহাদের অতিথিগণ-সহ হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানোন্দের[১] বক্তৃতা শুনিবার জন্য ওয়েসলি হলে জড় হইয়াছিলেন। এই ভদ্রলোক এখন এই দেশে ভ্রমণ করিতেছেন। বক্তৃতাটি ছিল একটি ঘরোয়া ভাষণ। প্রধান আলোচ্য বিষয়: 'হিন্দুগণের ধর্ম—তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বেদে যেভাবে ব্যাখ্যাত।' বক্তা জাতিপ্রথা সম্বন্ধেও বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে জাতি একটি সামাজিক বিভাগমাত্র, উহা ধর্মের উপর নির্ভর করে না।

বক্তা ভারতীয় জনগণের দারিদ্র্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা ভারতবর্ষের আয়তন অনেক ক্ষুদ্র হইলেও তথাকার জনসংখ্যা হইল ২৭ কোটি আর ইহাদের মধ্যে তিন কোটি লোক গড়ে মাসে ৫০ সেণ্টেরও কম উপায় করে। দেশের কোন কোন অঞ্চলে মানুষ মাসের পর মাস, এমন কি বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া একপ্রকার গাছের ফুল সিদ্ধ করিয়া খাইয়া জীবনধারণ করে।

কোন কোন জেলায় পরিবারের জোয়ান মরদরাই খায় ভাত, স্ত্রীলোক ও শিশুগণকে ভাতের ফেন দিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হয়। কোন বৎসর ধান না হইলে দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। অর্ধেক লোক একবেলা খাইয়া বাঁচে, বাকী অর্ধেক একবার কোনমতে খাইতে পাইলে পরের বারে কোথায় খাবার জুটিবে, তাহা জানে না। স্বামী বিবে কিওন্দের মতে ভারতের অধিবাসিগণের প্রয়োজন অধিক ধর্ম বা উন্নততর কোন ধর্ম নয়, প্রয়োজন কর্মনিপুণতা। আমেরিকার অধিবাসিগণকে ভারতের লক্ষ লক্ষ দুঃস্থ এবং অনশনক্লিষ্ট জনগণের সাহায্যে উন্মুখ করিবার আশাতেই তিনি এই দেশে আসিয়াছেন।

১ ঐ সময়ে আমেরিকার খবরের কাগজসমূহে স্বামী বিবেকানন্দের নাম নানা ভাবে বানান করা হইত। রিপোর্টগুলিতে ভুল-ভ্রান্তিও থাকিত প্রচুর।

বক্তা কিছুক্ষণ তাঁহার স্বদেশবাসিগণের অবস্থা এবং ধর্ম সম্বন্ধে বলেন। তাঁহার ভাষণের সময় মাঝে মাঝে সেণ্ট্রাল ব্যাপটিস্ট চার্চের ডক্টর এফ. এ. গার্ডনার ও রেভারেণ্ড এস. এফ. নব্‌স্‌ খুঁটিয়া খুঁটিয়া তাঁহাকে প্রশ্ন করেন। বক্তা উল্লেখ করেন, মিশনরীরা ভারতে অনেক দামী দামী কথা আওড়ান এবং শুরুতে অনেক হিতকর কল্পনাও তাঁহাদের ছিল, কিন্তু তাঁহারা কার্যক্ষেত্রে দেশের লোকের শ্রমশিল্প-সংক্রান্ত উন্নতির জন্য কিছুই করেন নাই। তাঁহার মতে আমেরিকানদের কর্তব্য—ভারতে ধর্মপ্রচারের জন্য মিশনরীদের না পাঠাইয়া শ্রমশিল্পের শিক্ষা দিতে পারেন, এমন লোক পাঠানো।

দুর্দৈবের সময় খ্রীষ্টান মিশনরীদের কাছে লোকে সাহায্য পায় এবং মিশনরীরা হাতেনাতে শিক্ষাদানের স্কুলও যে খোলেন, ইহা সত্য কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে বক্তা বলেন, কখনও কখনও তাঁহারা এরূপ করেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্ব নাই, কেন-না ঐরূপ সময়ে লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা আইনতঃ নিষিদ্ধ বলিয়া ঐ চেষ্টা স্বভাবতই তাঁহাদিগকে বন্ধ রাখিতে হয়।

ভারতে স্ত্রীজাতির অনুন্নত অবস্থার কারণ—বক্তার মতে—হিন্দুদের নারীর প্রতি অত্যধিক সম্মান। নারীকে ঘরের বাহিরে যাইতে না দেওয়াই ঐ সম্মান রক্ষার অনুকূল মনে করা হইত। নারী সর্বসাধারণের সংস্পর্শ হইতে দূরে গৃহাভ্যন্তরে শ্রদ্ধা ও পূজা লাভ করিতেন। স্বামীর সহিত চিতায় সহমরণ-প্রথার ব্যাখ্যায় বক্তা বলেন, পত্নী পতিকে এত ভালবাসিতেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। বিবাহে তাঁহারা এক হইয়াছিলেন, মৃত্যুতেও তাঁহাদের এক হওয়া চাই।

বক্তাকে প্রতিমা পূজা এবং জগন্নাথের রথের সম্মুখে স্বেচ্ছায় পড়িয়া মৃত্যুবরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, রথের ঐ ব্যাপারে হিন্দুদিগকে দোষ দেওয়া উচিত নয়, কেন না উহা কতকগুলি ধর্মোন্মাদ এবং প্রধানতঃ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত লোকের কাজ।

বক্তা স্বদেশে তাঁহার কর্মপদ্ধতির বিষয়ে বলেন, তিনি সন্ন্যাসীদের সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশের শিল্পবিজ্ঞান-শিক্ষণের কাজে লাগাইবেন, যাহাতে জনগণ প্রয়োজনীয় কার্যকরী শিক্ষালাভ করিয়া নিজেদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারে।

আজ বিকালে বিবে কানোন্দ ১৬৬ নং নর্থ স্ট্রীটে মিসেস উড্‌স্‌-এর বাগানে ভারতবর্ষের শিশুদের সম্বন্ধে বলিবেন। যে কোন বালক বালিকা বা তরুণরাও ইচ্ছা করিলে আসিতে পারেন। বিবে কানোন্দের চেহারা বেশ চমৎকার, রঙ কিছু ময়লা, কিন্তু প্রিয়দর্শন। কোমরে দড়ি দিয়া বাঁধা পীতাভ লাল রঙ-এর একটি আলখাল্লা তিনি পরিয়াছিলেন। মাথায় হলুদ রঙ-এর পাগড়ি। সন্ন্যাসী বলিয়া তাঁহার কোন জাতি নাই, সকলের সঙ্গেই তিনি পানাহার করিতে পারেন।

'ডেলি গেজেট', ২৯শে অগস্ট, ১৮৯৩

ভারতবর্ষ হইতে আগত রাজা[১] স্বামী বিবি রানন্দ গতকাল ওয়েস্‌লি চার্চে সালেমের 'থট্ অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ক্লাব'-এর অতিথিরূপে বক্তৃতা দিয়াছেন। বহুসংখ্যক ভদ্রমহোদয় ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন এবং সম্ভ্রান্ত সন্ন্যাসীর সহিত আমেরিকান রীতিতে করমর্দন করিয়াছিলেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি কমলালেবু রঙের আলখাল্লা, উহার কটিবন্ধটি লাল। তিনি একটি পাগড়িও পরিয়াছিলেন। পাগড়ির প্রান্ত একদিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছিল। উহা তিনি রুমালের কাজে লাগাইতেছিলেন। তাঁহার পায়ে ছিল কংগ্রেস জুতা।

বক্তা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার দেশবাসীর ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিষয় বলেন। সেণ্ট্রাল ব্যাপটিস্ট চার্চের ডক্টর এফ. এ. গার্ডনার এবং রেভারেণ্ড এস. এফ. নব্‌স্ বক্তাকে ঘন ঘন খুঁটিনাটি প্রশ্ন করেন। বক্তা বলেন, মিশনরীরা ভারতবর্ষে সুন্দর সুন্দর মতবাদ প্রচার করেন, গোড়াতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যও ছিল ভাল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেশের লোকের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য তাঁহারা কিছুই করেন নাই। বক্তার মতে আমেরিকানদের উচিত ধর্মপ্রচারের জন্য ভারতে মিশনরী না পাঠাইয়া ভারতবাসীকে শিল্প-বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য কাহাকেও পাঠানো।

ভারতে স্ত্রী এবং পুরুষের সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছুক্ষণ বলিবার সময় বক্তা বলেন, তাঁহার দেশে পতিরা পত্নীর কাছে কখনও মিথ্যা বলে না

[১] আমেরিকান সাংবাদিকগণ স্বামীজীর নামের সঙ্গে নানা মন-গড়া বিশেষণ বসাইয়া দিত। যেমন: রাজা, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ইত্যাদি।

এবং পত্নীর উপর অত্যাচারও করে না। তিনি আরও অনেক দোষের উল্লেখ করেন, যাহা হইতে ভারতের পতিরা মুক্ত।

বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, এ-কথা সত্য কিনা, দৈবদুর্বিপাকের সময় ভারতের জনগণ খ্রীষ্টান মিশনরীদের নিকট সাহায্য পাইয়া থাকে এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য তাঁহারা স্কুলও চালান। উত্তরে বক্তা বলেন, কখন কখন মিশনরীরা এই ধরনের কাজ করেন বটে, তবে তাহাতে তাঁহাদের কোন কৃতিত্ব নাই, কেন-না এরূপ সময়ে লোককে খ্রীষ্টধর্মে প্রভাবান্বিত করিবার চেষ্টা বাধ্য হইয়া তাঁহাদিগকে বন্ধ রাখিতে হয়, কারণ আইনতঃ উহা নিষিদ্ধ।

ভারতে নারীগণের দুর্দশার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া বক্তা বলেন, হিন্দুরা স্ত্রীজাতিকে এত শ্রদ্ধা করে যে, তাঁহাদিগকে তাহারা বাড়ির বাহিরে আনিবার পক্ষপাতী নয়। গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া নারী পরিবারের সকলের সম্মান লাভ করেন। স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমৃতা হইবার প্রাচীন প্রথার ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, পতির উপর পত্নীর এত গভীর ভালবাসা থাকে যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া জীবন-ধারণ করা পত্নীর পক্ষে অসম্ভব। একদিন উভয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, মৃত্যুর পরও সেই সংযোগ তাঁহাদের ছিন্ন হইবার নয়।

প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে বক্তা বলেন, তিনি খ্রীষ্টানদের জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, উপাসনার সময় তাঁহারা কি চিন্তা করেন? কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা গির্জার কথা ভাবেন, কেহ কেহ বা ঈশ্বরের চিন্তা করেন। বেশ কথা। তাঁহার দেশে লোকে ভগবানের মূর্তির কথা ভাবে। দরিদ্র জনগণের জন্য মূর্তিপূজা প্রয়োজন। বক্তা বলেন, প্রাচীনকালে ভারতীয় ধর্মের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়ে নারীরা আধ্যাত্মিক প্রতিভা এবং মানসিক শক্তির জন্য প্রসিদ্ধা ছিলেন। তবে বক্তা স্বীকার করেন, আধুনিক কালে তাঁহাদের অবনতি ঘটিয়াছে। খাওয়া-পরা গল্প-গুজব এবং অপরের কুৎসা-প্রচার ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা তাঁহাদের নাই।

বক্তা স্বদেশে তাঁহার কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বলেন, একদল সন্ন্যাসীকে তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া দেশে কারিগরী শিক্ষা প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিবেন। ইহা দ্বারা জনগণের অবস্থার উন্নতি হইবে।

'সালেম ইভনিং নিউজ', ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

যে পণ্ডিত সন্ন্যাসীটি এই শহরে কিছুদিন হইল আসিয়াছেন, তিনি রবিবার সন্ধ্যা ৭৷৩০এ ঈস্ট চার্চ-এ বক্তৃতা করিবেন। স্বামী (রেভারেণ্ড) বিবা কানন্দ গত রবিবার সন্ধ্যায় অ্যানিস্কোয়াম শহরে এপিস্কোপাল গির্জায় ভাষণ দিয়াছিলেন। ঐ গির্জার পাদরী এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রাইট তাঁহাকে তথায় আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিলেন। অধ্যাপক রাইট এই আগন্তুক সন্ন্যাসীকে খুব সমাদর করিতেছেন।

সোমবার রাত্রে ইনি সারাটোগায় যাইবেন। ওখানে সমাজবিদ্যা সমিতিতে বক্তৃতা দিবেন। পরে শিকাগোর আগামী ধর্মসম্মেলনে তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা। ভারতে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত, তাঁহাদের মতো বিবা কানন্দও প্রাঞ্জল এবং শুদ্ধ ইংরেজী বলিতে পারেন। গত শুক্রবার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কাছে তিনি ভারতীয় শিশুদের খেলাধূলা, স্কুল এবং চাল-চলন সম্বন্ধে যে সরলভাবে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা খুব উপকারী এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। একটি ছোট মেয়ে যখন বলিতেছিল যে, তাহার শিক্ষিকা একবার তাহার আঙুল জোরে চুষিতে থাকায় আঙুলটি প্রায় ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন বিবা কানন্দের দরদী হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। * * * স্বদেশে সকল সন্ন্যাসীর ন্যায় তাঁহাকেও সত্য, শুচিতা ও সৌভ্রাত্রের ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইতে হয় বলিয়া মহৎ কল্যাণকর যাহা, তাহা তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না, আবার যদি কোথাও বিষম কোন অন্যায় ঘটে, তাহাও তাঁহার নজরে আসে। এই সন্ন্যাসী অন্যধর্মাবলম্বীর প্রতি অত্যন্ত উদার, কাহারও সহিত মতে মিল না হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে সদয় কথাই ইঁহার মুখ দিয়া বাহির হয়।

'ডেলি গেজেট', ৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

ভারত হইতে আগত রাজা স্বামী বিবি রানন্দ রবিবার সন্ধ্যায় ঈস্ট চার্চ-এ ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দরিদ্র জনগণ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছেন। যদিও শ্রোতৃ-সংখ্যা ভালই ছিল, তবুও বিষয়টির গুরুত্ব এবং বক্তার আকর্ষণের বিবেচনায় আরও বেশী লোক হওয়া উচিত ছিল। সন্ন্যাসী তাঁহার দেশী পোশাক পরিয়াছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ মিনিট বলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আজিকার

ভারতবর্ষ পঞ্চাশ বৎসর আগেকার ভারত নয়। ভারতবর্ষে গিয়া এখন মিশনরীদের ধর্মপ্রচারের কোন প্রয়োজন নাই। গুরুতর প্রয়োজন এখন লোককে কারিগরী এবং সামাজিক শিক্ষাদান। ধর্ম বলিতে যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা হিন্দুদের আছে। হিন্দুধর্ম পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্ম। সন্ন্যাসী খুব মধুরভাষী। শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোযোগ তিনি বেশ ধরিয়া রাখিয়াছিলেন।

'ডেলি সারাটোগিয়ান', ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

* * * বক্তৃতামঞ্চে তাহার পর আসিলেন হিন্দুস্থানের মাদ্রাজ হইতে আগত সন্ন্যাসী বিবে কানন্দ। ইনি ভারতের সর্বত্র প্রচার করিয়া বেড়ান। সমাজবিদ্যায় ইহার অনুরাগ আছে, এবং বক্তা হিসাবে ইনি বুদ্ধিমান্ ও চিত্তাকর্ষক। ভারতে মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে ইনি বলিলেন।

অদ্যকার সূচিতে কয়েকটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয় আছে, বিশেষতঃ হার্টফোর্ডের কর্নেল জেকব গ্রীনের আলোচ্য 'স্বর্ণ ও রৌপ্য—উভয় ধাতুর মুদ্রামান।' বিবে কানন্দ পুনরায় বক্তৃতা করিবেন। এইবার তাঁহার বিষয় হইবে—'ভারতে রৌপ্যের ব্যবহার'।

বিশ্বমেলায় হিন্দুগণ

'বস্টন ইভনিং ট্রান্‌স্‌ক্রিপ্ট', ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

চিকাগো, ২৩শে সেপ্টেম্বর ঃ

আর্ট প্যালেসের প্রবেশদ্বারের বামদিকে একটি ঘর আছে, যাহাতে একটি চিহ্ন ঝুলিতেছে—'নং ১—প্রবেশ নিষেধ।' এই ঘরে ধর্ম-মহাসম্মেলনের বক্তারা সকলেই শীঘ্র বা দেরীতে, পরস্পরের সহিত অথবা সভাপতি মিঃ বনীর সহিত কথাবার্তা বলিতে আসিয়া থাকেন। এই গৃহের এক কোণে মিঃ বনীর খাস দফতর। ঘরের জোড়া কবাট সতর্ক পাহারা দ্বারা জনসাধারণ হইতে দূরে সংরক্ষিত, উঁকি দিয়া দেখিবার উপায় নাই। কেবলমাত্র মহাসভার প্রতিনিধিরাই এই 'পুণ্য' সীমানায় ঢুকিতে পারেন, তবে বিশেষ অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ যে একেবারে অসম্ভব, তাহা নয়। কেহ কেহ ঐরূপ ঢুকেন এবং খ্যাতনামা অতিথিদের একটু নিকট সংস্পর্শ উপভোগ করেন। কলম্বাস হলে বক্তৃতা-মঞ্চের উপর যখন তাঁহারা বসিয়া থাকেন, তখন তো এই সুযোগ পাওয়া যায় না।

এই সাক্ষাৎকার-কক্ষে সমধিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি হইলেন ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। লম্বা মজবুত চেহারা, হিন্দুস্থানীদের বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী, মুখ কামানো, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন সুসমঞ্জস, দাঁতগুলি সাদা, সুচারু ওষ্ঠদ্বয় কথোপকথনের সময় স্নিগ্ধ হাসিতে একটু ফাঁক হইয়া যায়। তাঁহার সুবিন্যস্ত মাথায় পীতাভ বা লালরঙের পাগড়ি থাকে। তিনি কখনও উজ্জ্বল কমলালেবু বর্ণের, কখনও বা গাঢ় লাল আলখাল্লা পরেন। আলখাল্লাটি কোমর বন্ধ দিয়া বাঁধা এবং হাঁটুর নীচে পড়ে। বিবেকানন্দ চমৎকার ইংরেজী বলেন এবং আন্তরিকতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলে সানন্দে যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দেন।

তাঁর সহজ চালচলনের সহিত একটি ব্যক্তিগত গাম্ভীর্যের স্পর্শ পাওয়া যায়। যখন তিনি মহিলাদের সহিত কথা বলেন, তখন বোঝা যায়, ইনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁহার সম্প্রদায়ের নিয়ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, 'আমি যাহা খুশী তাহা করিতে পারি, আমি স্বাধীন। কখনও আমি হিমালয় পর্বতে বাস করি, কখনও বা শহরের রাস্তায়। পরের বারের খাবার

কোথায় জুটিবে, তাহা আমি জানি না। আমার কাছে কোন টাকা পয়সা থাকে না। চাঁদা তুলিয়া আমাকে এখানে পাঠানো হইয়াছে।' নিকটে দুই একজন তাঁহার স্বদেশবাসী দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহাদের দিকে তাকাইয়া বিবেকানন্দ বলিলেন, 'এঁরা আমার ভার লইবেন।' ইহা দ্বারা অনুমিত হয়, তাঁহার চিকাগোর খাইখরচ অপরে দিতেছে। যে পোশাক তিনি পরিয়া ছিলেন, উহা তাঁহার স্বাভাবিক সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ কিনা জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, 'ইহা তো একটি উৎকৃষ্ট পোশাক। দেশে আমি সামান্য কাপড় ব্যবহার করি। জুতাও পরি না।' জাতিভেদে তিনি বিশ্বাসী কিনা প্রশ্ন করিলে বলিলেন, 'জাতি একটি সামাজিক প্রথা। ধর্মের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। আমি সব জাতির লোকের সঙ্গে মেলামেশা করি।'

মিঃ বিবেকানন্দের চেহারা এবং চালচলন হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি অভিজাত বংশে জন্মিয়াছেন। বহু বৎসরের স্বেচ্ছাকৃত দারিদ্র্য এবং গৃহহীন পরিব্রজ্যা সত্ত্বেও তাঁহার জন্মগত আভিজাত্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার পারিবারিক নাম কেহ জানে না। ধর্মজীবন বরণ করিয়া তিনি তাঁহার 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্বামী' কথাটি সন্ন্যাসীর প্রতি সম্মানসূচক প্রয়োগ। তাঁহার বয়স ত্রিশ হইতে খুব বেশী নয়। তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন এই জীবনের পরিপূর্ণতা এবং পরজীবনের ধ্যানের জন্যই সৃষ্ট। তথাপি মনে অনিবার্য কৌতূহল জাগে : ইঁহার সংসার-বিমুখতার মূলে কি কারণ নিহিত ছিল?

সব কিছু ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া সম্বন্ধে একটি মন্তব্য শুনিয়া বিবেকানন্দ হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'প্রত্যেক নারীর মধ্যে আমি যখন শুধু জগন্মাতাকেই দেখিতে পাই, তখন আমি বিবাহ করিব কেন? এই সব ত্যাগ করিয়াছি কেন? সাংসারিক বন্ধন এবং আসক্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য, যাহাতে আর পুনর্জন্ম না হয়। মৃত্যুকালে আমি দৈবী সত্তায় মিশিয়া যাইতে চাই, ভগবানের সহিত এক হইয়া যাইতে চাই। আমি তখন বুদ্ধত্ব লাভ করিব।'

এই কথা দ্বারা বিবেকানন্দ বলিতে চান না যে, তিনি বৌদ্ধ। কোন নাম বা সম্প্রদায় তাঁহাকে চিহ্নিত করিতে পারে না। তিনি উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য-

ধর্মের সার্থক পরিণতিস্বরূপ, বিশাল স্বপ্নময় আত্মত্যাগপ্রধান হিন্দু সংস্কৃতির সুযোগ্য সন্তান, তিনি একজন যথার্থ সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ।

বিবেকানন্দের কাছে তাঁহার গুরু পরমহংস রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তিকা বিলি করিবার জন্য থাকে। রামকৃষ্ণ ছিলেন একজন হিন্দু সাধক। তাঁহার উপদেশে লোকে এত আকৃষ্ট হইত যে, অনেকে তাঁহার মৃত্যুর পর সংসারত্যাগ করিয়াছেন। মজুমদার[১] এই সাধুপুরুষকে গুরুর ন্যায় দেখিতেন। তবে মজুমদারের আদর্শ, যেমন যীশুখ্রীষ্ট শিক্ষা দিতেন, সংসারে অনাসক্ত ভাবে থাকিয়া পৃথিবীতে দেবভাব-প্রতিষ্ঠা।

ধর্ম-মহাসভায় বিবেকানন্দের ভাষণ আমাদের উপরকার আকাশের ন্যায় উদার। সকল ধর্মের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই হইবে ভবিষ্যতের সর্বজনীন ধর্ম। সকল মানুষের প্রতি সহানুভূতি আর শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে নয়, ঈশ্বরের প্রীতির জন্য সৎকর্ম—ইহাও তাঁহার ভাষণের অন্যতম বক্তব্য। তাঁহার চমৎকার ভাবরাশি ও চেহারার জন্য তিনি ধর্ম-মহাসভায় অত্যন্ত সমাদৃত। মঞ্চের উপর দিয়া তাঁহাকে শুধু চলিয়া যাইতে দেখিলেও লোকে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠে। হাজার হাজার মানুষের এই অভিবাদন, তিনি বালকসুলভ সরলতার সহিত গ্রহণ করেন, তাহাতে আত্মশ্লাঘার লেশ মাত্র নাই। এই বিনীত তরুণ ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর পক্ষে নিঃস্বতা ও আত্মবিলুপ্তি হইতে সহসা ঐশ্বর্য ও প্রখ্যাতিতে আবর্তন নিশ্চিতই একটি অভিনব অভিজ্ঞতা। যখন জিজ্ঞাসা করা হইল, থিওজফিস্টরা হিমালয়ে 'মহাত্মা'দের অবস্থান সম্বন্ধে যে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করেন, ঐ-বিষয়ে তিনি কিছু জানেন কিনা। বিবেকানন্দ শুধু বলিলেন, 'আমি তাঁদের কাহাকেও কখনও দেখি নাই।' ইহার তাৎপর্য এই যে, হিমালয়ে ঐরূপ মহাত্মা হয়তো আছেন, তবে হিমালয়ের সহিত যথেষ্ট পরিচয় থাকিলেও তাঁহার এখনও 'মহাত্মা'দের সহিত সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

---

১ ধর্ম-মহাসভায় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিনিধি প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

ধর্ম-মহাসভায়

দি ডিউবুক, আইওয়া 'টাইম্‌স্', ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩

বিশ্বমেলা, ২৮শে সেপ্টেম্বর (বিশেষ সংবাদ) :

ধর্ম-মহাসভা এমন এক অবস্থায় পৌঁছিয়াছিল যে, রূঢ় বাগ্‌বিতণ্ডা দেখা দিয়াছিল। ভদ্রতার পাতলা আবরণটি অবশ্য বজায় ছিল, কিন্তু উহার পিছনে বৈরভাব প্রকাশ পাইতেছিল। রেভারেণ্ড জোসেফ কুক হিন্দুদের তীব্র সমালোচনা করেন, হিন্দুরা তাঁহাকে তীব্রতরভাবে আক্রমণ করেন। রেভারেণ্ড কুক বলেন, বিশ্বসংসার অনাদি—এ-কথা বলা একপ্রকার অমার্জনীয় পাগলামি। প্রত্যুত্তরে এশিয়ার প্রতিনিধিগণ বলেন, কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে সৃষ্ট জগতের অযৌক্তিকতা স্বতঃসিদ্ধ। ওহাইও নদীর তীর হইতে লম্বা-পাল্লার কামান দাগিয়া বিশপ জে. পি. নিউম্যান গর্জন করিয়া ঘোষণা করিলেন, "প্রাচ্য-দেশীয়েরা মিশনরীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা উক্তি দ্বারা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজকে অপমানিত করিয়াছেন, আর প্রাচ্য প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের বিরক্তিকর শান্ত ও গর্বিত হাসি হাসিয়া উত্তর দিলেন, উহা শুধু বিশপের অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়।

বৌদ্ধ দর্শন

সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তরে তিনজন সুপণ্ডিত বৌদ্ধ অসাধারণ সরল ও মনোজ্ঞ ভাষায় ঈশ্বর, মানুষ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মুখ্য বিশ্বাস উপন্যস্ত করেন। ইহার পরে ধর্মপালের 'বুদ্ধের নিকট জগতের ঋণ' সংজ্ঞক বক্তৃতাটির চুম্বক দেওয়া হইয়াছে। অন্য এক সূত্রে জানা যায়, ধর্মপাল ভাষণের আগে একটি সিংহলী স্বস্তিবাচন গাহিয়াছিলেন। অতঃপর সাংবাদিক লিখিতেছেন :

ধর্মপালের বক্তৃতার উপসংহারভাগ এত সুন্দর হইয়াছিল যে, চিকাগোর শ্রোতৃমণ্ডলী পূর্বে ঐরূপ কখনও শুনেন নাই। বোধ করি ডিমসথেনীজও উহা ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই।

বদমেজাজী মন্তব্য

হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের অদৃষ্ট কিন্তু এত ভাল ছিল না। তাঁহার মেজাজ বিগড়াইয়াছিল, অথবা বাহ্যতঃ কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছিল। তিনি কমলালেবু রঙের আলখাল্লা পরিয়াছিলেন। মাথায় ছিল ফিকা হলুদ রঙের পাগড়ি। বক্তৃতা দিতে উঠিয়াই তিনি খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বী জাতিদের ভীষণ আক্রমণ করিলেন ও বলিলেন, 'আমরা যাঁহারা প্রাচ্য দেশ হইতে আসিয়াছি, এখানে বসিয়া দিনের পর দিন মাতব্বরী ভাষায় শুনিতেছি যে, আমাদিগের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত, কেন-না খ্রীষ্টান জাতিসমূহ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী। আমাদের চারিপাশে তাকাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীতে খ্রীষ্টান দেশসমূহের মধ্যে ইংলণ্ড ২৫ কোটি এশিয়াবাসীর ঘাড়ে পা দিয়া বিত্তবিভব লাভ করিয়াছে। ইতিহাসের পাতা উলটাইয়া আমরা দেখি, খ্রীষ্টান ইওরোপের সমৃদ্ধি শুরু হয় স্পেনে। আর স্পেনের ঐশ্বর্যলাভ মেক্সিকো আক্রমণের পর হইতে। খ্রীষ্টানরা সম্পত্তিশালী হয় মানুষ-ভাইদের গলা কাটিয়া। এই মূল্যে হিন্দুরা বড়লোক হইতে চায় না।'

(বক্তারা এই ভাবে আক্রমণ করিয়া চলিলেন। প্রত্যেক পরবর্তী বক্তা, পূর্বগামী বক্তা অপেক্ষা যেন বেশী খিটখিটে হইয়া উঠিতেছিলেন।)

'আউটলুক', ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩

* * * ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনরীদের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা উঠিলে বিবেকানন্দ তাঁহার ধর্মযাজকের উপযোগী উজ্জ্বল কমলালেবু রঙের পোশাকে জবাব দিবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠেন। খ্রীষ্টীয় মিশনসমূহের কাজের তিনি তীব্র সমালোচনা করেন। ইহা সুস্পষ্ট যে, তিনি খ্রীষ্টধর্মকে বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই; তবে তিনি যেমন বলেন, ইহাও সত্য যে, খ্রীষ্টান ধর্মযাজকরাও হাজার হাজার বৎসরের বদ্ধমূল বিশ্বাস এবং জাতিসংস্কারযুক্ত হিন্দুধর্মকে বুঝিবার কোনও প্রয়াস দেখান নাই। বিবেকানন্দের মতে—মিশনরীরা ভারতে গিয়া শুধু দুইটি কাজ করেন, যথা—দেশবাসীর পবিত্রতম বিশ্বাসসমূহের নিন্দা করা এবং জনগণের নীতি ও ধর্মবোধকে শিথিল করিয়া দেওয়া।

'ক্রিটিক', ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩

ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধিগণের মধ্যে দুই ব্যক্তি ছিলেন সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক—সিংহলের বৌদ্ধ ধর্মযাজক এইচ. ধর্মপাল এবং হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। ধর্মপালের একটি ধারালো উক্তি: 'যদি ধর্মসংক্রান্ত ব্যাখ্যান ও মতবাদ তোমার সত্যানুসন্ধানের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে উহাদিগকে সরাইয়া রাখো। কোন পূর্ব ধারণার বশীভূত না হইয়া চিন্তা করিতে, ভালবাসার জন্যই মানুষকে ভালবাসিতে, নিজের বিশ্বাসসমূহ নির্ভীক ভাবে প্রকাশ করিতে এবং পবিত্র জীবন যাপন করিতে শেখো, সত্যের সূর্যালোক নিশ্চয়ই তোমাকে দীপ্ত করিবে।'

যদিও এই অধিবেশনের (ধর্ম-মহাসভার অন্তিম অধিবেশন) সংক্ষিপ্ত ভাষণসমূহের অনেকগুলিই খুব চমৎকার হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবৃন্দের ভিতর প্রভূত উৎসাহ উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীর ন্যায় অপর কেহই মহাসভার আদর্শগত ভাব, উহার ত্রুটি এবং উহার উৎকৃষ্ট প্রভাব সুন্দররূপে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ভাষণটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হইতেছে। শ্রোতৃমণ্ডলীর উপর এই ভাষণের কি আশ্চর্য প্রভাব হইয়াছিল, তাহার শুধু ইঙ্গিত মাত্র আমি দিতে পারি। বিবেকানন্দ যেন দেবদত্ত বাগ্মিতার অধিকার লইয়া জন্মিয়াছেন। তাঁহার হলুদ ও কমলালেবু বর্ণের নয়নাকর্ষী পোশাক এবং প্রতিভাদীপ্ত দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখচ্ছবি তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ বাণী ও সুমিষ্ট সতেজ কণ্ঠস্বর অপেক্ষা কম আকর্ষণ বিস্তার করে নাই।

* * * স্বামীজীর ধর্ম-মহাসভার শেষ ভাষণটির অধিকাংশ উদ্ধৃত করিয়া সাংবাদিক মন্তব্য করিতেছেন:

বৈদেশিক মিশন সম্বন্ধে যে-সকল মনোবৃত্তি ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রকাশ পাইয়াছিল, উহাই বোধ হয় এই সম্মেলনের সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ফল। বিদ্যা ও জ্ঞানে গরিষ্ঠ প্রাচ্য পণ্ডিতগণকে শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের শিক্ষানবীশকে পাঠাইবার ধৃষ্টতা ইংরেজী-ভাষাভাষী শ্রোতৃবর্গের নিকট ইহার আগে এমন দৃঢ়ভাবে আর তুলিয়া ধরা হয় নাই। আমরা যদি হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই, তবে পরমতসহিষ্ণুতা এবং সহানুভূতির ভাব লইয়া উহা বলিতে হইবে। এই দুইটি গুণ আছে, এমন সমালোচক খুব দুর্লভ। বৌদ্ধেরা যেমন আমাদের নিকট হইতে শিখিতে পারে,

আমাদেরও যে বৌদ্ধদের নিকট হইতে অনেক শিখিবার আছে, ইহা আজ হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। সামঞ্জস্যের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ প্রভাব কার্যকর হয়।

লুসি মনরো

চিকাগো, ৩রা অক্টোবর, ১৮৯৩

'নিউ ইয়র্ক ওয়ার্লড' পত্রিকা ১লা অক্টোবর (১৮৯৩) ধর্ম-মহাসভার প্রত্যেক প্রতিনিধিকে একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি দ্বারা ঐ মহতী সভার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করিবার অনুরোধ করিলে স্বামীজী গীতা এবং ব্যাসের বচন হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিদ্বয় বলিয়াছিলেন :

'মণিমালার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট সূত্রের ন্যায় আমি প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে আসিয়া উহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি।'

'প্রত্যেক ধর্মেই পবিত্র, সাধুপ্রকৃতি, পূর্ণতাসম্পন্ন মানুষ দৃষ্ট হয়। অতএব সব মতই মানুষকে একই সত্যে লইয়া যায়, কারণ বিষ হইতে অমৃতের উৎপত্তি কি সম্ভবপর ?'

ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য

'ক্রিটিক', ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩

ধর্ম-মহাসভার একটি পরিণাম এই যে, উহা একটি সত্যের প্রতি আমাদের চোখ খুলিয়া দিয়াছিল। ঐ সত্যটি হইল এই : প্রাচীন ধর্মমতসমূহের অন্তর্নিহিত দর্শনে বর্তমান মানুষের উপযোগী অনেক চমৎকার শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। একবার যখন ইহা আমরা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিলাম, তখন ঐ-সকল ধর্ম-ব্যাখ্যাতাগণের প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য বাড়িয়া চলিল এবং স্বভাবসুলভ অনুসন্ধিৎসা লইয়া আমরা জ্ঞানার্জনে তৎপর হইলাম। ধর্ম-মহাসভা শেষ হইলে উহা সুলভ হইয়াছিল সিউআমি বিবেকানন্দের বক্তৃতা এবং প্রসঙ্গগুলির মাধ্যমে। বিবেকানন্দ এখন এই শহরে (চিকাগো) রহিয়াছেন। তাঁহার এই দেশে আসিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল— তাঁহার স্বদেশবাসী হিন্দুগণের মধ্যে নূতন নূতন শ্রমশিল্প আরম্ভ করিতে আমেরিকানগণকে প্ররোচিত করা। কিন্তু বর্তমানে সাময়িকভাবে তিনি ঐ পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছেন, কেন-না তিনি দেখিতেছেন, আমেরিকান

জাতি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বদান্য বলিয়া এই দেশে বহু লোক নানা উদ্দেশ্যে সাহায্যের জন্য আসিতেছে। আমেরিকায় এবং ভারতে দরিদ্রদের আপেক্ষিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বিবেকানন্দ জবাব দিলেন, আমেরিকায় যাহাদিগকে গরীব বলা হয়, তাহারা ভারতে গেলে রাজার হালে থাকিতে পারিবে। তিনি চিকাগোর নিকৃষ্ট পাড়া ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তই পাকা হইয়াছে। আমেরিকার অর্থনৈতিক মান দেখিয়া তিনি খুশী।

যদিও বিবেকানন্দ উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি সন্ন্যাসিসঙ্ঘে যোগদান করিবার জন্য তিনি কুলমর্যাদা ত্যাগ করিয়াছেন। সন্ন্যাসীকে স্বেচ্ছায় জাতির সব অভিমান বিসর্জন দিতে হয়। বিবেকানন্দের আকৃতিতে তাঁহার আভিজাত্য সুচিহ্নিত। তাঁহার মার্জিত রুচি, বাগ্মিতা এবং মনোমুগ্ধ-কর ব্যক্তিত্ব আমাদিগকে হিন্দু সংস্কৃতি সম্বন্ধে নূতন ধারণা দিয়াছে। তাঁহার প্রতি লোকে স্বতই একটি আকর্ষণ অনুভব করে। তাঁহার মুখশ্রীতে এমন একটি কমনীয়তা, বুদ্ধিমত্তা ও জীবন্তভাব আছে যে, উহা তাঁহার গৈরিক পোশাক এবং গভীর সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের সহিত মিলিয়া মানুষের মনকে অবিলম্বে তাঁহার প্রতি অনুকূল করে। এই জন্য ইহা মোটেই আশ্চর্য নয় যে, অনেক সাহিত্য-সভা তাঁহাকে বক্তৃতার জন্য আহ্বান করিয়াছে এবং বহু গির্জাতেও তিনি ধর্মালোচনা করিয়াছেন। ইহার ফলে বুদ্ধের জীবন এবং বিবেকানন্দের ধর্মমত আমাদের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি কোন স্মারকলিপি ছাড়াই বক্তৃতা দেন, তথ্য এবং সিদ্ধান্ত এমন নিপুণভাবে ন্যস্ত করেন যে, তাঁহার আন্তরিকতায় দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে। তাঁহার বলিবার উদ্দীপনা মাঝে মাঝে এত বাড়িয়া যায় যে, শ্রোতারা মাতিয়া উঠে। বিবেকানন্দ একজন যোগ্যতম জেসুইট ধর্মযাজকের মতোই পণ্ডিত ও সংস্কৃতিমান্। তাঁহার মনের প্রকৃতিতেও জেসুইটদের খানিকটা ধাঁচ আছে। তাঁহার কথোপকথনে ছোট ছোট ব্যঙ্গোক্তিগুলি ছুরির মতো ধারালো হইলেও উহারা এত সূক্ষ্ম যে, তাঁহার অনেক শ্রোতাই উহা ধরিতে পারে না। তথাপি তাঁহার সৌজন্যের কথনও অভাব হয় না। তিনি আমাদের রীতিনীতির এমন কোন সাক্ষাৎ সমালোচনা কথনও করেন না, যাহাতে উহা কটু শোনায়। বর্তমানে তিনি আমাদিগকে তাঁহার বৈদান্তিক ধর্ম ও দার্শনিকগণের বাণী সম্বন্ধে শিক্ষা

দিতেছেন। বিবেকানন্দের মতে অজ্ঞান জনগণের জন্য মূর্তিপূজার প্রয়োজন রহিয়াছে; তবে তিনি আশা করেন, এমন সময় আসিবে যখন আমরা সাকার উপাসনা এবং পূজা অতিক্রম করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিতে ভগবানের সত্তা অনুভব করিব, মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি করিতে পারিব। বুদ্ধ দেহত্যাগ করিবার আগে যেমন বলিয়াছিলেন, বিবেকানন্দও সেইরূপ বলেন— 'তোমার নিজের মুক্তি তুমি নিজেই সম্পাদন কর। আমি তোমাকে কোন সাহায্য করিতে পারি না। কেহই পারে না। নিজেই নিজেকে সাহায্য কর।'

লুসি মনরো

'ইভানস্টন ইনডেক্স', ৭ই অক্টোবর, ১৮৯৩

গত সপ্তাহে কংগ্রীগেশনাল চার্চ-এ অনেকটা সম্প্রতি-সমাপ্ত ধর্ম-মহাসভার ন্যায় একটি বক্তৃতামালার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন দুইজন: সুইডেনের ডক্টর কার্ল ভন বারগেন এবং হিন্দু সন্ন্যাসী সিউআমি বিবেকানন্দ। *** সিউআমি বিবেকানন্দ ছিলেন ধর্ম-মহাসভায় একজন ভারতীয় প্রতিনিধি। তিনি তাঁহার অপূর্ব কমলালেবু-রঙের পোশাক, ওজস্বী ব্যক্তিত্ব, অসাধারণ বাগ্মিতা এবং হিন্দুদর্শনের আশ্চর্য ব্যাখ্যার জন্য বহুলোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার চিকাগোতে অবস্থান অবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও উল্লাসের হেতু হইয়াছে। বক্তৃতাগুলি তিনটি সন্ধ্যায় আয়োজিত হইয়াছিল।

শনিবার এবং মঙ্গলবার সন্ধ্যার আলোচ্য বিষয়গুলির তালিকা দিয়া সাংবাদিক বলিতেছেন:

বৃহস্পতিবার ৫ই অক্টোবর সন্ধ্যায় ডক্টর ভন বারগেনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'সুইডেনের রাজকন্যা'-বংশের প্রতিষ্ঠাতা 'হালডাইন বীমিশ'। হিন্দু সন্ন্যাসী বলেন 'পুনর্জন্ম' সম্বন্ধে। শেষের বক্তৃতাটি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল, কেন-না এই বিষয়টির আলোচ্য মতসমূহ পৃথিবীর এই অঞ্চলে বিশেষ শোনা যায় না। 'আত্মার জন্মান্তর-গ্রহণ' তত্ত্বটি এই দেশে অপেক্ষাকৃত

নূতন এবং খুব কম লোকেই উহা বুঝিতে পারে; কিন্তু প্রাচ্যে উহা সুপরিচিত এবং ওখানে উহা প্রায় সকল ধর্মেরই বনিয়াদ। যাঁহারা মতবাদরূপে ইহার ব্যবহার করেন না, তাঁহারাও ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলেন না। পুনর্জন্মতত্ত্বের মীমাংসার প্রধান বিষয় হইল—আমাদের অতীত বলিয়া কিছু আছে কিনা। বর্তমান জীবন আমাদের একটি আছে, তাহা আমরা জানি। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও একটা স্থির অনুভব আমাদের থাকে। তথাপি অতীতকে স্বীকার না করিয়া বর্তমানের অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? বর্তমান বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছে যে, জড়ের কখনও বিনাশ নাই, অবিচ্ছিন্ন উহার অস্তিত্ব। সৃষ্টি শুধু আকৃতির পরিবর্তন মাত্র। আমরা শূন্য হইতে আসি নাই। কেহ কেহ সব কিছুর সাধারণ কারণ-রূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন, এই স্বীকার দ্বারাই সৃষ্টির পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা হইল। কিন্তু প্রত্যেক ব্যাপারেই আমাদিগকে ঘটনাগুলি বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে—কোথা হইতে এবং কিভাবে বস্তুর উৎপত্তি ঘটে। যে-সব যুক্তি দিয়া ভবিষ্যৎ অবস্থান প্রমাণ করা হয়, সেই যুক্তিগুলিই অতীত অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়াও অন্য কারণ স্বীকার করা প্রয়োজন। বংশগতির দ্বারা ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়। কেহ কেহ বলেন, 'কই, আমরা পূর্বেকার জন্ম তো স্মরণ করিতে পারি না।' কিন্তু এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া গিয়াছে, যেখানে পূর্বজন্মের স্পষ্ট স্মৃতি বিদ্যমান। এখানেই জন্মান্তরবাদের বীজ নিহিত। যেহেতু হিন্দুরা মূকপ্রাণীর প্রতি দয়ালু, সেইজন্যই অনেকে মনে করেন, হিন্দুরা নিকৃষ্টযোনিতে জন্মান্তরে বিশ্বাসী। ইহারা নিম্ন প্রাণীর প্রতি দয়াকে কুসংস্কার ছাড়া অন্য কিছু মনে করিতে পারেন না। জনৈক প্রাচীন হিন্দু ঋষি ধর্মের সংজ্ঞা দিয়াছেন: যাহাই মানুষকে উন্নত করে, তাহার নাম ধর্ম। পশুত্বকে দূর করিতে হইবে, মানবত্বকে দেবত্বে লইয়া যাইতে হইবে। জন্মান্তরবাদ মানুষকে এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে না। মানুষের আত্মা অন্য উচ্চতর লোকে গিয়া মহত্তর জীবন লাভ করিতে পারে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের স্থলে সেখানে তাহার আটটি ইন্দ্রিয় থাকিতে পারে। এই ভাবে উচ্চতর ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া অবশেষে সে পূর্ণতার পরাকাষ্ঠা—অমৃতত্ব লাভ করিবে। মহাজনদের লোকসমূহে তখন সে নির্বাণের গভীর আনন্দ উপলব্ধি করিতে থাকিবে।

হিন্দুসভ্যতা

যদিও স্ট্রিয়াটর শহরে ৯ই অক্টোবর তারিখে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতায় প্রচুর লোক সমাগম হইয়াছিল, 'স্ট্রিয়াটর ডেইলি ফ্রী প্রেস' (৯ই অক্টোবর) শুধু নিম্নের নীরস বিবরণটুকু পরিবেশন করিয়াছেন।

অপেরা হাউসে শনিবার রাত্রে এই খ্যাতিমান্ হিন্দুর বক্তৃতা খুব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তুলনামূলক ভাষাবিদ্যার সাহায্যে তিনি আর্যজাতি-সমূহ এবং নূতন গোলার্ধে তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে বহুপূর্বে স্বীকৃত সম্বন্ধ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ত্রি-চতুর্থ জনগণ যাহা দ্বারা অত্যন্ত হীনভাবে নিপীড়িত, সেই জাতিভেদ-প্রথার তিনি মৃদু সমর্থন করিলেন, আর গর্বের সহিত ইহাও বলিলেন যে, যে-ভারতবর্ষ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া পৃথিবীর ক্ষমতাদৃপ্ত জাতিসমূহের উত্থান এবং পতন দেখিয়াছে, সেই ভারতবর্ষই এখনও বাঁচিয়া আছে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার দেশবাসীর ন্যায় অতীতকে ভালবাসেন। তাঁহার জীবন নিজের জন্য নয়, ঈশ্বরের জন্য উৎসর্গীকৃত। তাঁহার স্বদেশে ভিক্ষাবৃত্তি এবং পদব্রজে ভ্রমণকে খুব উৎসাহিত করা হয়, তবে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সে-কথা বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। ভারতীয় গৃহে রান্না হইবার পর প্রথম খাইতে দেওয়া হয় কোন অতিথিকে। তারপর গৃহপালিত পশু, চাকর-বাকর এবং গৃহস্বামীকে খাওয়াইয়া বাড়ির মেয়েরা অন্নগ্রহণ করেন। দশবৎসর বয়সে ছেলেরা গুরুগৃহে যায়। গুরু দশ হইতে বিশ বৎসর পর্যন্ত তাহাদিগকে শিক্ষাদান করেন। তারপর তাহারা বাড়িতে ফিরিয়া পারিবারিক পেশা অবলম্বন করে, অথবা পরিব্রাজক সন্ন্যাসী হয়। সে ক্ষেত্রে তাহাদের জীবন অনবরত ভ্রমণ, ভগবৎ-সাধনা এবং ধর্মপ্রচারে কাটে। যে অশন-বসন লোকে স্বেচ্ছায় তাহাদিগকে দেয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, তাহারা টাকাকড়ি কখনও স্পর্শ করে না। বিবেকানন্দ এই শেষোক্ত শ্রেণীর। বৃদ্ধ বয়সে লোকে সংসার ত্যাগ করে এবং কিছুকাল শাস্ত্রপাঠ এবং তপস্যা করিয়া যদি আত্মশুদ্ধি অনুভব করে, তখন তাহারাও ধর্মপ্রচারে লাগিয়া যায়। বক্তা বলেন যে, মানসিক উন্নতির জন্য অবসর প্রয়োজন। এদেশের

আদিবাসীদের—যাহাদিগকে কলাম্বাস বর্বর অবস্থায় দেখিয়াছিলেন—তাহাদিগকে সুশিক্ষা না দিবার জন্য তিনি আমেরিকান জাতির সমালোচনা করেন। এই বিষয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তিনি তাঁহার অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তুলনায় অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অমুক্ত রাখিয়াছেন।

একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা

'উইসকনসিন স্টেট জার্নাল', ২১শে নভেম্বর, ১৮৯৩

সুপ্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ম্যাডিসন শহরের কংগ্রীগেশনাল চার্চ-এ গতরাত্রে যে বক্তৃতা দিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। উহা গভীর দার্শনিক চিন্তা এবং মনোজ্ঞ ধর্মভাবের ব্যঞ্জক। যদিও বক্তা একজন পৌত্তলিক, তবুও তাঁহার উপদেশাবলীর অনেকগুলি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা অনায়াসে অনুসরণ করিতে পারেন। তাঁহার ধর্মমত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতো উদার। সব ধর্মকেই তিনি মানেন। যেখানেই সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়, সেখান হইতেই তিনি উহা গ্রহণ করিতে উন্মুখ। তিনি ঘোষণা করিলেন, ভারতীয় ধর্মসমূহে গোঁড়ামি, কুসংস্কার এবং অলস ক্রিয়াকাণ্ডের কোনও স্থান নাই।

হিন্দুধর্ম

'মিনিঅ্যাপলিস স্টার', ২৫শে নভেম্বর, ১৮৯৩

গতকল্য সন্ধ্যায় ফার্স্ট ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ (মিনিঅ্যাপলিস শহরে) স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাচীন চিরন্তন সত্যসমূহের মূর্ত প্রকাশ বলিয়া উহা স্বকীয় সকল সূক্ষ্ম আকর্ষণ সহ শ্রোতৃবৃন্দকে বিশেষভাবে অভিনিবিষ্ট করিয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেক চিন্তাশীল নরনারী ছিলেন, কেন-না বক্তাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন 'পেরিপ্যাটেটিকস্' নামক দার্শনিক সমিতি। নানা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের ধর্ম-যাজক ও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ছাত্রেরাও সভায় উপস্থিত ছিলেন। বিবেকানন্দ একজন ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক। তিনি তাঁহার দেশীয় পোশাকে আসিয়াছিলেন—মাথায় পাগড়ি, কোমরে লাল কটিবন্ধ দিয়া বাঁধা গৈরিক আলখাল্লা এবং অধোদেশেও লাল পরিচ্ছদ।

তিনি তাঁহার ধর্মের শিক্ষাসমূহ অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত ধীর এবং স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করিতেছিলেন, ত্বরিত বাগ্‌বিলাস অপেক্ষা শান্ত বাচন-ভঙ্গী দ্বারাই যেন তিনি শ্রোতৃবৃন্দের মনে দৃঢ় প্রত্যয় লইয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার কথাগুলি খুব সাবধানে প্রযুক্ত। উহাদের অর্থও বেশ পরিষ্কার। হিন্দু-ধর্মের সরলতর সত্যগুলি তিনি তুলিয়া ধরিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে তিনি কোনও কটূক্তি না করিলেও এমনভাবে উহার প্রসঙ্গ করিতেছিলেন, যাহাতে ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই পুরোভাগে রাখা হইতেছিল। হিন্দুধর্মের সর্বাবগাহী চিন্তা এবং মুখ্য ভাব হইল মানবাত্মার স্বাভাবিক দেবত্ব। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, ধর্মের লক্ষ্য হইল মানুষের এই সহজাত পূর্ণতাকে বিকাশ করা। বর্তমান শুধু অতীত এবং ভবিষ্যতের মধ্যবর্তী সীমারেখা। মানুষের ভিতর ভাল এবং মন্দ দুই প্রবৃত্তিই রহিয়াছে। সৎ সংস্কার বলবান্ হইলে মানুষ ঊর্ধ্বতর গতি লাভ করে, অসৎ সংস্কারের প্রাধান্যে সে নিম্নগামী হয়। এই দুইটি শক্তি অনবরত তাহার মধ্যে ক্রিয়া করিতেছে। ধর্ম মানুষকে উন্নত করে, আর অধর্ম ঘটায় তাহার অধঃপতন।

কানন্দ আগামী কল্য সকালে ফার্স্ট ইউনিটেরিআন চার্চ-এ বক্তৃতা করিবেন।

'ডে ময়েন নিউজ', ২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৩

সুদূর ভারতবর্ষ হইতে আগত মনীষী পণ্ডিত স্বামী বিবেকানন্দ গত রাত্রে সেণ্ট্রাল চার্চ-এ বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চিকাগোর বিশ্বমেলা উপলক্ষে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ধর্ম-মহাসভায় তিনি তাঁহার দেশের ও ধর্মের প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড এইচ. ও. ব্রীডেন বক্তাকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দেন। বক্তা উঠিয়া সমবেত সকলকে মাথা নীচু করিয়া অভিবাদনের পর তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। বিষয় ছিল—হিন্দুধর্ম। তাঁহার বক্তৃতা একটি নির্দিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার নিজের ধর্ম এবং অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে তিনি যে-সব দার্শনিক ধারণা পোষণ করেন, তাহার কিছু কিছু পরিচয় ঐ বক্তৃতাতে পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার মতে শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টান হইতে গেলে সকল ধর্মের সহিত পরিচয় অত্যাবশ্যক। এক ধর্মে যাহা নাই, অপর ধর্ম হইতে তাহা লওয়া যায়। ইহাতে কোন ক্ষতি নাই। প্রকৃত খ্রীষ্টানের পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়। বিবেকানন্দ বলেন, 'তোমরা যখন আমাদের দেশে কোন মিশনরীকে পাঠাও, তিনি 'হিন্দু খ্রীষ্টানে' পরিণত হন, পক্ষান্তরে আমি তোমাদের দেশে আসিয়া 'খ্রীষ্টান হিন্দু' হইয়াছি। আমাকে এই দেশে অনেক সময়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে, আমি এখানে লোককে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা করিব কিনা। এই প্রশ্ন আমি অপমানজনক বলিয়া মনে করি। আমি ধর্মপরিবর্তনে বিশ্বাস করি না। আজ কোন ব্যক্তি পাপকার্যে রত আছে, তোমাদের ধারণা—কাল যদি সে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, তাহা হইলে ধীরে ধীরে সে সাধুত্ব লাভ করিবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে, এই পরিবর্তন কোথা হইতে আসে? ইহার ব্যাখ্যা কি? ঐ ব্যক্তির তো নূতন একটি আত্মা হয় নাই, কেন-না পূর্বের আত্মা মরিলে তবে তো নূতন আত্মার আবির্ভাবের কথা। বলিতে পারো, ভগবান্ তাহার ভিতর পরিবর্তন আনিয়াছেন। ভাল, কিন্তু ভগবান্ তো পূর্ণ, সর্বশক্তিমান্ এবং পবিত্রতার স্বরূপ। তাহা হইলে প্রসঙ্গোক্ত ব্যক্তির খ্রীষ্টান হইবার পর ভগবান্ পূর্বের সেই ভগবান্ই থাকেন, কেবল যে-সাধুতা তিনি ঐ ব্যক্তিকে দিয়াছিলেন, উহা ঘাটতি পড়িবে।

আমাদের দেশে দুটি শব্দ আছে, যাহার অর্থ এদেশে সম্পূর্ণ আলাদা। শব্দ-দুটি হইল 'ধর্ম' এবং 'সম্প্রদায়'। আমাদের মতে ধর্মগুলি ধর্মমতের মধ্যেই

অনুস্যূত। আমরা পরমত-অসহিষ্ণুতা ছাড়া আর সব কিছুই সহ্য করি। অপর শব্দটি—'সম্প্রদায়', তাহার অর্থ একটি সমমত-সমর্থক সখ্যবদ্ধ ব্যক্তির দল, যাঁহারা নিজদিগকে ধার্মিকতার আবরণে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়াইয়া বলিতে থাকেন, 'আমাদের মতই ঠিক, তোমরা ভুলপথে চলিতেছ।' ইঁহাদের প্রসঙ্গে আমার দুই ব্যাঙের গল্পটি মনে পড়িল।

কোন কুয়ায় একটি ব্যাঙের জন্ম হয়, বেচারা সারাজীবন ওখানেই কাটাইতে থাকে। একদিন সমুদ্রের এক ব্যাঙ ঐ কুয়ায় পড়িয়া যায়। দুই জনের গল্প শুরু হইল সমুদ্র লইয়া। কূপমণ্ডূক আগন্তুককে জিজ্ঞাসা করিল, সমুদ্র কত বড়? সাদাসিধা কোন উত্তর না পাইয়া সে তখন কুয়ার এক কোণ হইতে আর এক কোণে লাফ দিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, সাগর অত বড় কিনা। আগন্তুক বলিল, তা তো বটেই। তখন কুয়ার ব্যাঙ আরও একটু বেশী দূর লাফাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা, তবে এত বড় কি?' সাগরের ব্যাঙ যখন উত্তর দিল, 'হ্যাঁ', তখন কূপমণ্ডূক মনে মনে বলিল—'এই ব্যাঙটি নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। আমি ওকে আমার কুয়ায় স্থান দিব না।' সম্প্রদায়-গুলিরও এই একই পন্থা। তাহাদের নিজেদের মতে যাহারা বিশ্বাস করে না, তাহাদিগকে তাহারা দূর করিয়া দিতে এবং পদদলিত করিতে চায়।[১]

---

১ ধর্মান্তরীকরণ সম্বন্ধে স্বামীজীর যুক্তি যে রিপোর্টার জায়গায় জায়গায় ধরিতে পারেন নাই, তাহা সুস্পষ্ট। তথাপি যেটুকু তিনি লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তাহা হইতে স্বামীজীর ভাবধারার সহিত পরিচিত পাঠক স্বামীজীর এখানকার কথার মর্মার্থ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

হিন্দু সন্ন্যাসী

'অ্যাপীল-অ্যাভাল্যাঞ্চ', ১৬ই জানুআরি, ১৮৯৪

স্বামী বিবেকানন্দ নামে যে হিন্দু সন্ন্যাসী আজ রাত্রে এখানকার (মেমফিস্ শহরের) বক্তৃতাগৃহে ভাষণ দিবেন, তিনি এদেশে অদ্যাবধি ধর্মসভায় বা বক্তৃতা-মঞ্চে উপস্থিত শ্রেষ্ঠ বাগ্মীদের অন্যতম। তাঁহার অতুলনীয় বাগ্মিতা, অতীন্দ্রিয় বিষয়ে গভীর উপলব্ধি, তর্কপটুতা এবং উদার আন্তরিকতা বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনের বিশিষ্ট চিন্তানায়কদের প্রখর মনোযোগ এবং সহস্র সহস্র নরনারীর প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল।

তারপর হইতে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজ্যে তিনি বক্তৃতা সফর করিয়াছেন এবং লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছে।

বিবেকানন্দ কথোপকথনে অতিশয় অমায়িক ভদ্রলোক। ভাষায় তিনি যে-সকল শব্দ ব্যবহার করেন, তাহা ইংরেজী ভাষার রত্নবিশেষ। তাঁহার চালচলন অত্যন্ত সুসংস্কৃত পাশ্চাত্য শিষ্টাচার ও রীতিনীতির সমকক্ষ। মানুষ হিসাবে তাঁহার সাহচর্য বড়ই হৃদয়গ্রাহী এবং কথাবার্তায় পাশ্চাত্য জগতের যে-কোন শহরের বৈঠকখানায় তিনি বোধ করি অপরাজেয়। তিনি শুধু প্রাঞ্জলভাবে নয়, অনর্গলভাবেও ইংরেজী বলিয়া যান, আর তাঁহার অভিনব দীপ্তিমান্ ভাবরাশি আলঙ্কারিক ভাষায় চমকপ্রদ প্রবাহে যেন তাঁহার জিহ্বা হইতে নামিয়া আসে।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মণজনোচিত শিক্ষা-দীক্ষায় পালিত হন, কিন্তু পরে তিনি জাতি ও কুলমর্যাদা পরিত্যাগ করিয়া ধর্মযাজক বা প্রাচ্যদেশের আদর্শে যাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা হয়, তাহাই হন। তিনি বরাবরই ঈশ্বর সম্বন্ধে মহত্তম ধারণা পোষণ করিয়া আসিয়াছেন এবং সেই ধারণার অঙ্গীভূত রহস্যময় বিশ্বপ্রকৃতির চৈতন্যাত্মকতায় বিশ্বাসী। বিবেকানন্দ বহু বৎসর ভারতবর্ষে উচ্চতর বিদ্যার সাধনায় এবং প্রচারে কাটাইয়াছেন। ইহার ফলে তিনি এমন প্রগাঢ় জ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন যে, এই যুগে সারা পৃথিবীর একজন মহান্ চিন্তাশীল পণ্ডিত বলিয়া তিনি বিখ্যাত।

বিশ্ব-ধর্মসম্মেলনে তাঁহার আশ্চর্য প্রথম বক্তৃতাটি তৎক্ষণাৎ সমবেত বিশিষ্ট ধর্মনায়কদের মধ্যে তাঁহাকে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল। সম্মেলনের অধিবেশন-সমূহে তাঁহার ধর্মের সপক্ষে তিনি অনেকবার বলিয়াছেন। মানুষের ও তাহার স্রষ্টার প্রতি মানুষের উচ্চতর কর্তব্য-সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া তাঁহার মুখ হইতে এমন কতকগুলি কথা বাহির হইয়াছিল, যাহা ইংরেজী ভাষার অতি মূল্যবান্ মনোজ্ঞ দার্শনিক সম্পদ। চিন্তায় তিনি একজন শিল্পী, বিশ্বাসে অধ্যাত্মবাদী এবং বক্তৃতামঞ্চে সুনিপুণ নাট্যকার বিশেষ।

মেমফিস্ শহরে পৌছিবার পর হইতে তিনি মিঃ হু এল. ব্রিঙ্কলীর অতিথিরূপে রহিয়াছেন। ওখানে দিবারাত্র তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনে উৎসুক শহরের বহু ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তিনি টেনেসী ক্লাবেরও একজন বেসরকারী অতিথি। শনিবার সন্ধ্যায় মিসেস এস. আর. শেফার্ড কর্তৃক তাঁহার জন্য একটি অভ্যর্থনার আয়োজন হয়। রবিবারে কর্নেল আর. বি. স্নোডেন তাঁহার অ্যানিসডেল-এর গৃহে এই মাননীয় অতিথিকে ভোজনে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ওখানে বিবে কানন্দের সহিত সহকারী বিশপ টমাস এফ. গেলর, রেভারেণ্ড ডক্টর জর্জ প্যাটারসন এবং আরও অনেক ধর্মযাজকের সাক্ষাৎ হয়।

গতকল্য বিকালে র‍্যান্‌ডলফ বিল্ডিং-এ অবস্থিত নাইন্‌টীন্‌থ্ সেঞ্চুরী ক্লাবের কার্যালয়ে ঐ ক্লাবের কেতাদুরস্ত সভ্যদের নিকট তিনি একটি বক্তৃতা দেন। আজ রাত্রে শহরের বক্তৃতাগৃহে তাঁহার ভাষণের বিষয়বস্তু হইবে—‘হিন্দুধর্ম।’

পরমত-সহিষ্ণুতার জন্য অনুনয়

'মেমফিস্ কমার্শিয়াল', ১৭ই জানুআরি, ১৮৯৪

বেশ কিছু-সংখ্যক শ্রোতা গতরাত্রে প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দের হিন্দুধর্ম-বিষয়ক ভাষণ শুনিবার জন্য শহরের বক্তৃতাগৃহে সমবেত হইয়াছিলেন।

বিচারপতি আর. জে. মর্গ্যান বক্তাকে পরিচিত করিয়া দিতে গিয়া একটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথ্যপূর্ণ ভাষণে মহান্ আর্যজাতির ক্রমপ্রসারের বিবরণ দেন। তিনি বলেন, ইওরোপীয়গণ এবং হিন্দুরা উভয়েই আর্যজাতির শাখা, অতএব আমেরিকাবাসীর সহিত যিনি আজ তাঁহাদের কাছে বক্তৃতা দিবেন, তাঁহার জাতিগত আত্মীয়তা রহিয়াছে।

প্রাচ্যদেশের এই খ্যাতিমান্ পণ্ডিতকে বক্তৃতাকালে ঘন ঘন করতালি দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়। সকলেই আগাগোড়া বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনেন। বক্তার শারীরিক আকৃতি বড় সুন্দর, গায়ের রঙ ব্রঞ্জবর্ণ, দেহের অঙ্গসৌষ্ঠবও চমৎকার। তাঁহার পরিধানে ছিল কোমরে কালো কটিবন্ধ-বেষ্টিত পাটলবর্ণের আলখাল্লা, কালো পেণ্টালুন এবং মাথায় কমনীয়ভাবে জড়ানো ভারতীয় রেশমের পীতবর্ণ পাগড়ি। বক্তার বলিবার ধরন খুব ভালো এবং তাঁহার ব্যবহৃত ইংরেজী ভাষা শব্দনির্বাচন, ব্যাকরণের শুদ্ধতা এবং বাক্যগঠনের দিক দিয়া উৎকৃষ্ট। তাঁহার উচ্চারণের ত্রুটি শুধু কখন কখন যৌগিক শব্দের যে অংশে জোর দিবার কথা নয়, সেখানে জোর দেওয়া। তবে সম্ভবতঃ মনোযোগী শ্রোতারা সব শব্দই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। মৌলিক চিন্তায় ভরা, তথ্যপূর্ণ এবং উদার জ্ঞানে অনুস্যূত বক্তৃতাটি শুনিয়া তাঁহাদের এই প্রখর মনোযোগ নিশ্চিতই সার্থক হইয়াছিল। এই ভাষণটিকে যথার্থই বিশ্বজনীন পরধর্ম-সহিষ্ণুতার সপক্ষে একটি 'অনুনয়' বলা যাইতে পারে। এই বিষয়ে বক্তা ভারতীয় ধর্মসংক্রান্ত নানা মন্তব্য উদ্ধৃত করেন। তিনি বলেন, পরমত-সহিষ্ণুতা এবং প্রেমই হইল প্রধান প্রধান ধর্মের মুখ্য উদ্দীপনা। তাঁহার মতে ইহাই যে-কোন ধর্মবিশ্বাসের শেষ লক্ষ্য হওয়া উচিত।

তাঁহার ভাষণে হিন্দুধর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ অবতারণা ছিল না। ঐ ধর্মের কিংবদন্তী বা আচার-অনুষ্ঠানের বিশদ চিত্র উপস্থাপিত না করিয়া তিনি উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারার একটি বিশ্লেষণ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশ্য হিন্দুধর্মের কয়েকটি বিশেষ মতবাদ ও ক্রিয়াকর্মের তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন, তবে এইগুলির অতি স্পষ্ট সরল ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছিলেন। বক্তা হিন্দু-ধর্মের অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির একটি হৃদয়গ্রাহী বিবরণ দেন। জন্মান্তরবাদ—যাহা অনেক সময়ে অপব্যাখ্যাত হয়—এই অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি হইতেই উদ্ভূত। বক্তা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন, কিভাবে তাঁহার ধর্ম কালের বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া সর্বকালে বর্তমান মানবাত্মার সত্যকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারেন। সব মানুষই যেমন আত্মার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে বিশ্বাসী, ব্রাহ্মণ্যধর্ম তেমনি আত্মার অতীত অবস্থাও স্বীকার করেন। বিবেকানন্দ ইহাও স্পষ্টভাবে বলেন যে, খ্রীষ্টধর্মে যাহাকে 'আদিম পাপ' বলা হয়, হিন্দুধর্মে উহার কোন স্থান নাই। মানুষ যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে—এই বিশ্বাসের উপর হিন্দুধর্ম মানুষের সকল চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করে। বক্তার মতে উন্নতি এবং শুদ্ধি আশার উপর স্থাপিত হওয়া বিধেয়। মানুষের উন্নতির অর্থ তাহার স্বাভাবিক পূর্ণতায় ফিরিয়া যাওয়া। সাধুতা এবং প্রেমের অভ্যাস দ্বারাই এই পূর্ণতার উপলব্ধি হয়। ভারতবাসী যুগ যুগ ধরিয়া এই গুণগুলি কিভাবে অভ্যাস করিয়াছে—যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ কিভাবে নিপীড়িত জনগণের আশ্রয়ভূমি হইয়াছে, বক্তা তাহা নির্ণয় করেন। উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বলেন যে, রোম সম্রাট টাইটাস যখন জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া ইহুদীদের মন্দির ধ্বংস করেন, তখন হিন্দুরা ইহুদীদের সাদরে আশ্রয় দিয়াছিল।

বক্তা খুব প্রাঞ্জল বর্ণনা দ্বারা বুঝাইয়া দেন যে, হিন্দুরা ধর্মের বহিরঙ্গের উপর বেশী ঝোঁক দেন না। কখন কখন দেখা যায়, একই পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু প্রত্যেকেই ঈশ্বরের যে প্রধানতম গুণ—প্রেম, উহারই মাধ্যমে উপাসনা করিয়া থাকেন। বক্তা বলেন যে, সকল ধর্মেই ভাল জিনিস আছে; সাধুতার প্রতি মানুষের যে উদ্দীপনাবোধ, সব ধর্মই হইল তাহার অভিব্যক্তি, অতএব প্রত্যেক ধর্মই শ্রদ্ধার যোগ্য। এই বিষয়টির উদাহরণ-স্বরূপ তিনি বেদের (?)

একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। একটি ঝরনা হইতে জল আনিতে বিভিন্ন লোকে যেমন বিভিন্ন গঠনের পাত্র লইয়া যায়, ধর্মসমূহও সেইরূপ সত্যকে উপলব্ধির বিভিন্ন আধারস্বরূপ। পাত্রের আকার আলাদা হইলেও লোকে যেমন একই জল উহাতে ভরিয়া লয়, সেইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ধর্মের মাধ্যমে আমরা একই সত্য গ্রহণ করি। ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের সহিত পরিচিত। যে-কোন নামে তাঁহাকে ডাকা হউক, যে-কোন রীতিতে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করা হউক, তিনি তাহা বুঝিতে পারেন।

বক্তা বলেন, খ্রীষ্টানরা যে-ঈশ্বরের পূজা করেন, হিন্দুদেরও উপাস্য তিনিই। হিন্দুদের ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব ঈশ্বরের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কার্যের নির্ণায়ক মাত্র। ঈশ্বরের এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ঐক্যবদ্ধ না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ মূর্তির মধ্য দিয়া প্রকাশ করা অবশ্যই কিছু দুর্বলতা, তবে সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মনীতি এইরূপ স্থূলভাবে স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। এই একই কারণে হিন্দুরা ভগবানের দৈবী গুণসমূহ নানা দেবদেবীর জড় প্রতিমার মাধ্যমে প্রকাশ করিতে চায়।

হিন্দুদের অবতারবাদ-প্রসঙ্গে বক্তা কৃষ্ণের কাহিনী বলেন। পুরুষসংসর্গ ব্যতীত তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। যীশুখ্রীষ্টের চরিতকথার সহিত তাঁহার জীবনবৃত্তান্তের অনেক সাদৃশ্য আছে। বিবে কানন্দের মতে কৃষ্ণের শিক্ষা হইল, ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—এই তত্ত্ব। ঈশ্বরকে ভয় করা যদি ধর্মের আরম্ভ হয়, তাহা হইলে উহার পরিণতি হইল ঈশ্বরকে ভালবাসা।

তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হইল না, কিন্তু উহা মানুষে মানুষে ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য একটি চমৎকার আবেদন এবং একটি রমণীয় ধর্মবিশ্বাসের ওজস্বী সমর্থন। বিবে কানন্দের ভাষণের উপসংহার বিশেষভাবে হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল, যখন তিনি বলিলেন যে, খ্রীষ্টকে স্বীকার করিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত, তবে সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকেও প্রণিপাত করা চাই; আর যখন মানব-সভ্যতার বর্বরতার একটি পরিষ্কার ছবি আঁকিয়া তিনি বলিলেন, সভ্যতার এই-সকল গ্লানির জন্য যীশুখ্রীষ্টকে দায়ী করিতে তিনি রাজী নন।

ভারতীয় আচার-ব্যবহার

'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ', ২১শে জানুআরি, ১৮৯৪

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ গতকল্য বিকালে লা স্যালেট অ্যাকাডেমিতে (মেমফিস শহরে) একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন শ্রোতৃসংখ্যা খুব কম ছিল।

বক্তৃতার বিষয় ছিল 'ভারতীয় আচার-ব্যবহার'। বিবে কানন্দের ধর্মবিষয়ক চিন্তাধারা এই শহরের এবং আমেরিকার অন্যান্য নগরীর শ্রেষ্ঠ মনীষীদের চিত্তে সহজেই স্বীকৃতি লাভ করিতেছে।

তাঁহার মতবাদ খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের গোঁড়া বিশ্বাসের পক্ষে মারাত্মক। খ্রীষ্টান আমেরিকা এ-যাবৎ পৌত্তলিক ভারতবর্ষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে আলোকিত করিবার প্রভূত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এখন মনে হইতেছে যে, কানন্দের ধর্মের প্রাচ্য বিভব আমাদের পিতৃপিতামহের উপদিষ্ট প্রাচীন খ্রীষ্টধর্মের সৌন্দর্যকে ছাপাইয়া গিয়াছে এবং উহা আমেরিকার অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত মহলের অনেকের মনে একটি উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইবে।

বর্তমান কাল হইল 'খেয়ালের' যুগ। মনে হইতেছে যে, কানন্দ একটি 'বহুকালের অনুভূত চাহিদা' মিটাইতে পারিতেছেন। তিনি বোধ করি, তাঁহার দেশের একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং আশ্চর্য পরিমাণে ব্যক্তিগত আকর্ষণ-শক্তিরও অধিকারী। তাঁহার বাগ্মিতায় শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়া যায়। যদিও তাঁহার মতবাদ খুব উদার, তবুও গোঁড়া খ্রীষ্টধর্মে প্রশংসা করিবার মতো খুব সামান্যই তিনি দেখিতে পান। এ পর্যন্ত মেমফিস শহরে যত বক্তা বা ধর্মযাজক আসিয়াছেন, কানন্দ তাঁহাদের প্রত্যেকের অপেক্ষা বেশী সমাদর বিশেষভাবে লাভ করিয়াছেন।

এই হিন্দু সন্ন্যাসী এখানে যেরূপ সহৃদয় অভ্যর্থনা পাইতেছেন, ভারতে খ্রীষ্টান মিশনরীরা যদি সেইরূপ পাইতেন, তাহা হইলে অ-খ্রীষ্টান দেশসমূহে খ্রীষ্টবাণী-প্রচারের কাজ খুব সুগম হইত। গতকল্য বিকালে বিবে কানন্দের বক্তৃতায় ঐতিহাসিক দৃষ্টি-ভঙ্গী চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তিনি তাঁহার স্বদেশের

প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ইতিহাস এবং রীতিনীতির সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন জায়গা এবং দ্রষ্টব্য বিষয়সমূহের বর্ণনা খুব সুষ্ঠু ও সহজভাবে দিতে পারেন।

বক্তৃতার সময় মহিলা শ্রোতারা তাঁহাকে ঘন ঘন প্রশ্ন করিতেছিলেন। তিনিও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করিয়া সব প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন। কেবল জনৈক মহিলা যখন তাঁহাকে একটি অবান্তর ধর্মপ্রসঙ্গে টানিয়া আনিতে চাহিয়া একটি প্রশ্ন তুলিলেন, তখন কানন্দ আলোচ্য বিষয় ছাড়িয়া উহার উত্তর দিতে রাজী হন নাই। প্রশ্নকর্ত্রীকে বলিলেন, অন্য কোন সময়ে তিনি 'আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ' প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মত বিবৃত করিবেন।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে, তাঁহার পিতামহের বিবাহ হইয়াছিল তিন বৎসর বয়সে; আর তাঁহার পিতা যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁহার বয়স আঠারো বৎসর। বক্তা নিজে কখনও বিবাহ করেন নাই। সন্ন্যাসীর বিবাহ করিতে বাধা নাই, কিন্তু বিবাহ করিলে তাঁহার স্ত্রীকেও সন্ন্যাসিনী হইতে হয়। সন্ন্যাসিনী স্ত্রীর ক্ষমতা সুবিধা এবং সামাজিক সম্মান তাঁহার স্বামীরই মতো।[১]

একটি প্রশ্নের উত্তরে বক্তা বলেন, ভারতে কোন কারণেই বিবাহ-বন্ধন-ছেদের প্রচলন নাই, তবে বিবাহের ১৪ বৎসর পরেও সন্তান না হইলে স্ত্রীর অনুমতি লইয়া স্বামী আর একটি বিবাহ করিতে পারেন। স্ত্রী আপত্তি করিলে ইহা সম্ভব নয়। বক্তা ভারতের প্রাচীন মন্দির এবং সমাধিস্তম্ভ-সমূহের অতি চমৎকার বর্ণনা দেন। বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, প্রাচীন-কালের ভাস্কর এবং শিল্পীদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বর্তমানকালের কারিগরদের অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল।

স্বামী ভিভি কানন্দ আজ রাত্রে ওয়াই. এম. এইচ. এ. হলে এই শহরে তাঁহার শেষ বক্তৃতা করিবেন। তিনি চিকাগোর 'স্লেটন লাইসিআম ব্যুরো'র সহিত এই দেশে তিন বৎসরের জন্য বক্তৃতাদানের একটি চুক্তি করিয়াছেন। কাল তিনি চিকাগো রওনা হইবেন। ২৫শে রাত্রিতে ওখানে তাঁহার একটি বক্তৃতা দিবার কথা।

---

১ স্বামীজী যে সন্ন্যাসীর বিবাহ সম্বন্ধে উপর্যুক্ত মন্তব্য করিবেন, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। সংবাদপত্রের রিপোর্টার কি বুঝিতে কি বুঝিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন। ইহা সুবিদিত যে, সন্ন্যাসী স্ত্রী গ্রহণ করিলে হিন্দুসমাজে পতিত হন।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ১৫ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

গত সন্ধ্যায় বেশ কিছু সংখ্যক শ্রোতা ব্রাহ্মসমাজের প্রসিদ্ধ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দের দর্শন ও বক্তৃতা শ্রবণের সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইউনিটি ক্লাবের উদ্যোগে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। তিনি তাঁহার দেশীয় পোশাক পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার কমনীয় মুখমণ্ডল এবং বলিষ্ঠ আকৃতি তাঁহার চেহারায় একটি সম্ভ্রান্ত ভাবের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাগ্মিতায় তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রখর মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ঘন ঘন করতালি পড়িতেছিল। তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল—'ভারতের আচার-ব্যবহার'। উহা তিনি উৎকৃষ্ট ইংরেজীতে উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন, তাঁহাদের দেশের 'ইণ্ডিয়া' এবং দেশবাসীর 'হিন্দু' নাম ঠিক নয়। উহা বিদেশীদের উদ্ভাবিত। তাঁহাদের দেশের প্রকৃত নাম 'ভারত' এবং অধিবাসীরা 'ব্রাহ্মণ'। প্রাচীনকালে তাঁহাদের কথ্য ভাষা ছিল সংস্কৃত। প্রত্যেকটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত পরিষ্কার বোধগম্য অর্থ ছিল, কিন্তু এখন সে-সব চলিয়া গিয়াছে। জুপিটার-শব্দের সংস্কৃত অর্থ 'স্বর্গস্থ পিতা'। বর্তমানকালে উত্তর ভারতের সব ভাষাই মোটামুটি এক প্রকার; কিন্তু উত্তর ভারতের লোক দক্ষিণ ভারতে গেলে তথাকার লোকের সহিত কথাবার্তা বলিতে পারিবে না। ফাদার, মাদার, সিস্টার, ব্রাদার প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দগুলি শুনিতে অনেকটা একই রকম। বক্তা বলেন, এই কারণে এবং অন্যান্য তথ্যের প্রমাণ হইতেও তাঁহার মনে হয়, আমরা সকলেই একটি সাধারণ সূত্র—আর্যজাতি হইতে উদ্ভূত। এই আদিম আর্যজাতির প্রায় সব শাখাই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

প্রাচীন ভারতের সমাজে চারটি শ্রেণীবিভাগ ছিল—পুরোহিত, রাজা ও সৈনিক, বণিক ও শিল্পী এবং শ্রমিক ও ভৃত্য। প্রথম তিন শ্রেণীর বালকগণকে যথাক্রমে দশ, এগারো এবং ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে শিক্ষার জন্য গুরুকুলে অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে পাঠানো হইত এবং তাহাদিগকে ত্রিশ, পঁচিশ ও কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত সেখানে থাকিতে হইত।...প্রাচীনকালে বালক ও বালিকা উভয়েরই জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এখন বালকদেরই সুযোগ বেশী। অবশ্য দীর্ঘকালের এই ভুলটি শুধরাইবার চেষ্টা চলিতেছে। বৈদেশিক অধিকারের পূর্বে ভারতবর্ষের দর্শন এবং নীতি-নিয়মাদির অনেক অংশ

প্রাচীনকালে নারীদের দ্বারা প্রণীত। হিন্দুসমাজে নারীর স্বকীয় অধিকার আছে। এই অধিকার তাঁহারা বজায় রাখেন। তাঁহাদের পক্ষে আইনও রহিয়াছে।

গুরুকুল হইতে প্রত্যাবর্তনের পর ছাত্রেরা বিবাহ করিয়া সংসারী হইতে পারিত। সংসারের দায়িত্ব স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই এবং উভয়েরই নিজস্ব অধিকার ছিল। ক্ষত্রিয়দের ক্ষেত্রে কন্যা অনেক সময়ে নিজের পতি নিজেই মনোনয়ন করিত; কিন্তু অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই পিতামাতাই ঐ ব্যবস্থা করিতেন। বর্তমানকালে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য অনবরত চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দুদের বিবাহ-অনুষ্ঠানটি বড় সুন্দর। বর এবং কন্যা পরস্পর পরস্পরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া ভগবান্ এবং সমবেত সকলকে সাক্ষী মানিয়া শপথ করে যে, একে অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিবে। বিবাহ না করা পর্যন্ত কেহ পুরোহিত হইতে পারে না। প্রকাশ্য ধর্মানুষ্ঠানে যোগ দিবার সময় পুরুষের সহিত তাহার পত্নীও যায়। হিন্দুরা এই পাঁচটিকে কেন্দ্র করিয়া মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, যথা—দেবতা, পিতৃপুরুষ, দরিদ্র, ইতর প্রাণী এবং ঋষি বা শাস্ত্র। হিন্দু গৃহস্থের বাড়িতে যতক্ষণ সামান্য কিছুও থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত অতিথিকে ফিরিয়া যাইতে হয় না। অতিথির পরিতৃপ্তিপূর্বক ভোজন শেষ হইলে গৃহের শিশুরা খায়, তারপর তাহাদের পিতা এবং সর্বশেষে জননী। হিন্দুরা পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দরিদ্র জাতি; কিন্তু দুর্ভিক্ষের সময় ছাড়া কখনও কেহ ক্ষুধায় মারা যায় না। সভ্যতা এক বিরাট কীর্তি। তুলনাস্বরূপ বলা হয় যে, ইংলণ্ডে যদি প্রতি চারিশত ব্যক্তির মধ্যে একজন মদ্যপায়ী থাকে তো ভারতে ঐ অনুপাতে প্রতি দশ লক্ষে একজন। বক্তা মৃতব্যক্তির শবদাহ-অনুষ্ঠানের একটি বর্ণনা দেন। কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্র ছাড়া এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রচার করা হয় না। পনর দিন উপবাসের পর মৃতের আত্মীয়েরা পূর্বপুরুষদের নামে দরিদ্রদিগকে অর্থাদি দান করেন অথবা জনহিতকর কোন প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। নৈতিক আদর্শের দিক দিয়া হিন্দুরা অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা প্রভূত উন্নততর।

হিন্দু দর্শন

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ১৬ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গতকল্য সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ একটি বৃহৎ এবং মর্মগ্রাহী শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তাঁহার দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতার ঘোষিত বিষয় 'হিন্দু দর্শন' সম্বন্ধে শ্রোতাদের অনেক কিছু জানিবার আশা মাত্র আংশিকভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। বক্তার ভাষণে বৌদ্ধ দর্শনের উল্লেখ ছিল এবং যখন তিনি বলিলেন যে, বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম, আর একবিন্দু রক্তপাত না করিয়া উহা সর্বাপেক্ষা বেশীসংখ্যক লোককে নিজমতাবলম্বী করিয়াছে, তখন শ্রোতৃ-মণ্ডলী হর্ষধ্বনি করিয়া উঠেন। কিন্তু বক্তা বুদ্ধের ধর্ম বা দর্শন সম্বন্ধে বেশী কিছু বলেন নাই। তিনি খ্রীষ্টধর্মকে কয়েকটি মৃদু রসাল খোঁচা দেন এবং অ-খ্রীষ্টান দেশসমূহে এই ধর্মের প্রচলনে যে বিপত্তি ও কষ্টের উদ্ভব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার নিজ দেশবাসীর সহিত এই দেশের লোকের সামাজিক অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা কৌশলে এড়াইয়া যান। বক্তা বলেন যে, সাধারণভাবে হিন্দু দার্শনিকগণ নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যের ধারাবাহিক শিক্ষা দিয়াছেন। কোনটাই অনাদরণীয় নয়। পক্ষান্তরে কোন নূতন ব্যক্তি যদি খ্রীষ্টধর্মের কোন মতবাদে আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে তাহার পুরাতন বিশ্বাসের সবটাই ত্যাগ করিয়া নূতন ধর্মমতটি সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে বলা হয়। বক্তা বলেন, আমরা সকলেই একদিন একই ধর্মমত আশ্রয় করিব—ইহা একটি অলস স্বপ্ন।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ১৬ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গত সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ পুনরায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় ছিল—'হিন্দু দর্শন'। বক্তা কিছু সময় সাধারণভাবে দর্শন ও অধিবিদ্যার (metaphysics) আলোচনা করিয়া বলেন যে, এই বক্তৃতাটিতে তিনি বিশেষভাবে ধর্ম সম্বন্ধেই বলিবেন। একটি ধর্মসম্প্রদায় আত্মা মানেন, কিন্তু ঈশ্বর সম্পর্কে অজ্ঞেয়বাদী। বৌদ্ধ

ধর্মে নৈতিক আদর্শ খুব বড় ছিল, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করিবার দরুন (ভারতে) উহা বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারিল না। আর একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নাম জৈন। ইঁহারা আত্মা মানেন, তবে নীতিবাদ দ্বারা দেশ-শাসনে আস্থাবান্ নন। এই মতাবলম্বীদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইবে। ইঁহাদের পুরোহিত ও শ্রমণগণ মুখে একটি রুমাল বাঁধিয়া রাখেন, পাছে নিজেদের গরম নিঃশ্বাস মানুষ বা জীবজন্তুর গায়ে লাগিয়া অনিষ্ট ঘটায়।

সনাতন-পন্থীরা সকলেই ঈশ্বরের আদেশে বিশ্বাসী। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের শাস্ত্র বেদের প্রত্যেকটি শব্দ ভগবানের নিকট হইতে আসিয়াছে। অধিকাংশ ধর্মে কোন একটি শব্দের অর্থ লইয়া খুব টানাটানি করা হয়; কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রের সংস্কৃত ভাষায় শব্দের মূল ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি বরাবর বজায় থাকে।

প্রাচ্যদেশীয় এই বিশিষ্ট বক্তার মতে—আমরা যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা জানি, ওগুলি অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী আর একটি ষষ্ঠ জ্ঞানের দ্বার রহিয়াছে। উহা হইল প্রত্যাদেশলব্ধ সত্য। একজন ব্যক্তি পৃথিবীর সকল ধর্মের যাবতীয় বই পড়িয়াও মহা শয়তান থাকিয়া যাইতে পারে। প্রত্যাদেশ অর্থে আধ্যাত্মিক অনুভূতির পরবর্তী বর্ণনা।

সৃষ্টি সম্বন্ধে আরও একটি মতটি এই যে, সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। এমন একটি সময়ের কথা যদি ধরা যায়, যখন জগৎসংসার ছিল না, তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, ভগবান্ তখন কি করিতেছিলেন? হিন্দুদের দৃষ্টিতে সৃষ্টি শুধু আকৃতির অভিব্যক্তি মাত্র। ধরুন—একজন খুব ভাল স্বাস্থ্য লইয়া সদ্‌বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং বড় হইয়া ক্রমে একজন মহাপুরুষে পরিণত হইয়াছেন; অপর একজন হয়তো অঙ্গহীন বা বিকলাঙ্গ হইয়া পৃথিবীতে আসিল, ক্রমশঃ একটি মহাদুষ্ট ব্যক্তি হইয়া দাঁড়াইল এবং সমাজের শাস্তি ভোগ করিল। ন্যায়বান্ এবং মঙ্গলময় ভগবান্ একজনকে বহু সুযোগ দিয়া এবং আর একজনকে নানা অসুবিধার মধ্যে ফেলিয়া সৃষ্টি করেন কেন? মানুষের তো বাছিয়া লইবার স্বাধীনতা থাকে না। দুষ্কর্মকারী নিজের অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন। পাপ ও পুণ্যের পার্থক্য বক্তা ব্যাখ্যা করেন। সব কিছু ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এ-কথা মানিলে সকল বিজ্ঞানের অবসান ঘটিবে। মানুষ কত দূর পর্যন্ত নামিতে পারে? তাহার কি পশু-স্তরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভবপর?

কানন্দ বলিলেন, তিনি যে হিন্দু, ইহাতে তিনি সুখী। রোমানরা যখন জেরুজালেম ধ্বংস করে, তখন বহু সহস্র ইহুদী ভারতবর্ষে আসিয়া বসবাস করে। আরবগণ কর্তৃক স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া বহু সহস্র পারসীকও ভারতে আশ্রয় পায়, কেহই নিপীড়িত হয় নাই। হিন্দুরা বিশ্বাস করে—সকল ধর্মই সত্য। তবে তাহাদের ধর্ম অপর ধর্মসমূহ অপেক্ষা প্রাচীনতর। ইংরেজ মিশনরীদের প্রথম দলটিকে ইংরেজ সরকার যখন জাহাজ হইতে ভারতে নামিতে বাধা দেন, তখন একজন হিন্দুই তাঁহাদের হইয়া দরবার করিয়া তাঁহাদিগকে নামিতে সাহায্য করেন। যাহা সব কিছু মানিয়া লয়, তাহাই তো ধর্মবিশ্বাস। বক্তা অন্ধের হস্তি-দর্শনের সহিত ধর্মমতের তুলনা করেন। এক একজন অন্ধ হাতির দেহের এক একটি অংশ স্পর্শ দ্বারা অনুভব করিয়া হাতি কি রকম, তাহার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল। নিজের অভিজ্ঞতার দিক দিয়া প্রত্যেকের উক্তিই সত্য হইলেও হাতির সামগ্রিক বর্ণনা তো কোনটি হইতেই পাওয়া যায় নাই। হিন্দু দার্শনিকরা বলেন, 'সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।' সব মানুষ কোন এক সময়ে একই রীতিতে চিন্তা করিবে, ইহা যাঁহারা আশা করেন, তাঁহারা অলস স্বপ্ন দেখিতেছেন মাত্র। এরূপ অবস্থা উপস্থিত হইলে ধর্মের মৃত্যু ঘটিবে। প্রত্যেক ধর্মই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে, আর প্রত্যেকটি দল দাবি করে যে, উহাই সত্য এবং অপরেরা ভ্রান্ত। বৌদ্ধধর্মে অপর মতাবলম্বীদের উপর নিপীড়ন অবিদিত। বৌদ্ধধর্মই প্রথম নানা দেশে প্রচারক পাঠায় এবং বলিতে পারে যে, লক্ষ লক্ষ লোককে এক বিন্দু রক্তপাত না করিয়া স্বমতে আনিয়াছে। নানা দোষ এবং কুসংস্কার সত্ত্বেও হিন্দুরা কখনও অন্যের উপর অত্যাচার করে নাই। বক্তা জানিতে চান, নানা খ্রীষ্টানদেশের সর্বত্র যে-সব অসাম্য রহিয়াছে, খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা ঐগুলি অনুমোদন করেন কিভাবে?

অলৌকিক ঘটনা

ইভনিং নিউজ, ১৭ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

'আমি আমার ধর্মের প্রমাণস্বরূপ কোন অলৌকিক ঘটনা দেখাইব—নিউজ-পত্রিকার এই অনুরোধ আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়।'—এই কাগজের জনৈক প্রতিনিধি বিবেকানন্দকে ঐ-বিষয়ক সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি দেখাইলে তিনি উপরি-উক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, প্রথমতঃ আমি অলৌকিক ঘটনা লইয়া কাজ করি না, আর দ্বিতীয়তঃ আমি যে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত, উহা অলৌকিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অলৌকিক ঘটনা বলিয়া কিছু আমরা মানি না। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের এলাকার বাহিরে আশ্চর্য অনেক কিছু ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু ঐগুলি কোন না কোন নিয়মের অধীন। আমাদের ধর্মের সহিত ঐগুলির কোনও সম্পর্ক নাই। যে-সব আশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ ভারতবর্ষে করা হয় বলিয়া বৈদেশিক সংবাদপত্রে ছাপা হয়, ঐগুলির অধিকাংশই হইল হাতের চাল বা সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাব-জনিত চোখের ভ্রম। যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কখনও ঐ-সব করেন না। তাঁহারা কখনও পয়সার জন্য হাটে বাজারে এই-সব তুকতাক দেখাইয়া দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান না। যাঁহারা যথার্থ আধ্যাত্মিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু এবং শুধু বালসুলভ কৌতূহলাক্রান্ত নয়, তাঁহারা ঐ-সকল জ্ঞানী পুরুষের দেখা পান এবং তাঁহাদিগকে চিনিতে পারেন।

মানুষের দেবত্ব

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ১৮ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

হিন্দু দার্শনিক এবং পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দ গত রাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ 'মানুষের দেবত্ব' সম্বন্ধে বলিয়া তাঁহার বক্তৃতা বা ধর্মব্যাখ্যান-মালার উপসংহার করিয়াছেন। আবহাওয়া খারাপ থাকা সত্ত্বেও প্রাচ্যদেশীয় এই ভ্রাতার (এই নামেই তাঁহাকে অভিহিত করা তিনি পছন্দ করেন) বক্তৃতা-মঞ্চে আসিবার আধ ঘণ্টা পূর্বেই সমগ্র গির্জাটি দরজা পর্যন্ত শ্রোতৃমণ্ডলীর ভিড়ে

ভরিয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে সকল জীবিকা ও বৃত্তির লোকই ছিলেন—আইনজীবী, বিচারক, খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী, একজন ইহুদী ধর্মযাজক এবং মহিলাদের তো কথাই নাই। মহিলারা বার বার উপস্থিত হইয়া এবং প্রখর মনোযোগ সহকারে তাঁহার ভাষণ শুনিয়া এই শ্যামবর্ণ আগন্তুককে তাঁহাদের ভূরি ভূরি প্রশংসাবাদ অর্পণ করিবার সুস্পষ্ট প্রবণতা প্রমাণ করিয়াছেন। বক্তা ভদ্রলোকদিগের বসিবার ঘরে বসিয়া আলাপ-আলোচনায় যেমন সকলকে আকর্ষণ করিতে পারেন, সাধারণ বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়াও সেইরূপ পারেন।

গতরাত্রের বক্তৃতা পূর্বেকারগুলি হইতে কম বর্ণনামূলক ছিল। প্রায় দুই ঘণ্টা যাবৎ বিবেকানন্দ মানবীয় এবং ঐশ্বরিক ব্যাপার লইয়া তত্ত্ববিদ্যার একটি আস্তরণ বুনিয়া চলেন। তাঁহার কথাগুলি এত যুক্তিসঙ্গত যে, বিজ্ঞানকে তিনি সাধারণ বুদ্ধির মতো সরল করিয়া তুলেন। ন্যায়গর্ভ ভাষণটি যেন প্রাচ্য গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুবাসিত তাঁহার স্বদেশে হাতে-বোনা এবং অতি চমৎকার নানা রঙের একটি বস্ত্রের মতোই সুন্দর, উজ্জ্বল, চিত্তাকর্ষক এবং আনন্দদায়ী। শিল্পী যেমন তাঁহার চিত্রে নিপুণভাবে নানা রঙ ব্যবহার করেন, এই শ্যামবর্ণ ভদ্রলোকও তাঁহার ভাষণে সেইরূপ কাব্যময় উপমা প্রয়োগ করেন। যেখানে যেটি মানায় ঠিক সেখানে সেইটি তিনি বসাইয়া যান। উহার প্রতিক্রিয়া কিছু অদ্ভুত ঠেকিলেও উহার একটি আশ্চর্য আকর্ষণ আছে। চলচ্চিত্রের মতো পর পর দ্রুত তাঁহার যুক্তিপ্রতিষ্ঠ সিদ্ধান্তগুলি উপস্থিত হইতেছিল, আর এই কুশলী বক্তার শ্রমও মাঝে মাঝে শ্রোতৃবৃন্দের উৎসাহপূর্ণ করতালি দ্বারা সার্থকতা লাভ করিতেছিল।

বক্তৃতার পূর্বে ঘোষণা করা হয় যে, বক্তার নিকট অনেকগুলি প্রশ্ন আনা হইয়াছে। ইহাদের কতকগুলির উত্তর তিনি ব্যক্তিগতভাবে আলাদা দেওয়াই ভাল মনে করেন। তবে তিনটি প্রশ্ন তিনি বাছিয়া রাখিয়াছেন, ঐগুলির প্রত্যুত্তর বক্তৃতামঞ্চ হইতেই দিবেন। প্রশ্নগুলি এই :

(১) ভারতের লোকেরা কি তাহাদের শিশু-সন্তানদের কুমীরের মুখে নিক্ষেপ করে ?

(২) জগন্নাথের রথের চাকার নীচে পড়িয়া কি তাহারা মৃত্যুবরণ করে ?

(৩) মৃত স্বামীর সহিত কি তাহারা জীবিত বিধবাকেও জোর করিয়া দাহ করে ?

বিদেশে একজন আমেরিকানকে নিউ ইয়র্ক শহরের রাস্তায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা দৌড়াদৌড়ি করে কিনা—এই বিষয়ে, অথবা আমেরিকা সম্বন্ধে ইউরোপে এখনও পর্যন্ত প্রচলিত এই ধরনের আজগবী খবর সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করা হয়, তাহা হইলে তিনি যেভাবে ঐ-সব প্রশ্নের উত্তর দিবেন, বক্তা বিবেকানন্দ প্রথম প্রশ্নটির জবাব সেই ভাবেই দিলেন। অর্থাৎ প্রশ্নটি এতই আজগবী যে, উহার কোনও গুরুত্বপূর্ণ উত্তর নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন সরল কিন্তু অজ্ঞ লোক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, হিন্দুরা শুধু স্ত্রী-শিশুই কেন কুমীরদের মুখে দেয়?—ইহার উত্তরে বিবেকানন্দ ব্যঙ্গ করিয়া বলেন, উহার কারণ বোধ করি এই যে, স্ত্রী-শিশুদের মাংস বেশী নরম, আর ঐ আজব দেশের নদীতে যে-সব হিংস্র জলজন্তু থাকে, তাহারা ঐরূপ মাংস সহজে হজম করিতে পারে। জগন্নাথ-সংক্রান্ত প্রশ্নটি সম্বন্ধে বক্তা ঐ তীর্থস্থানের দীর্ঘকাল প্রচলিত রথযাত্রা-ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দেন এবং বলেন যে, খুব সম্ভবতঃ কখনও কোন কোন অত্যুৎসাহী ভক্ত রথসংলগ্ন দড়িটি ধরিতে এবং টানিতে গিয়া পা পিছলাইয়া চাকার নীচে পড়িয়া মারা গিয়া থাকিবে। এইরূপ কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে পরে নানা বিকৃত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে এবং ঐ-সব শুনিয়া অন্য দেশের সহৃদয় লোক আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন।

হিন্দুরা জীবিত বিধবাদের অগ্নিসাৎ করে—বিবেকানন্দ ইহা অস্বীকার করেন। তবে ইহা সত্য যে, কখন কখন কোন বিধবা নিজে স্বেচ্ছায় অগ্নিতে আত্মাহুতি দিয়াছেন। এরূপ যখন ঘটিয়াছে, তখন পুরোহিত এবং সাধুসন্তেরা তাঁহাদিগকে ঐ কার্য হইতে বিরত হইতে পীড়াপীড়ি করিয়াছেন; কেন-না ইঁহারা সকলেই আত্মহত্যার বিরোধী।

সকলের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও যদি পতিব্রতা বিধবা স্বামীর সহিত সহমৃতা হইবার জন্য জিদ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে একটি 'অগ্নিপরীক্ষা' দিতে হইত। তিনি অগ্নিশিখায় প্রথমে হাত ঢুকাইয়া দিতেন। যদি হাত পুড়িয়া যাইত, তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর সহিত সহমরণের ইচ্ছায় আর বাধা দেওয়া হইত না। কিন্তু ভারতই তো একমাত্র দেশ নয়, যেখানে প্রেমিকা নারী প্রেমাস্পদের মৃত্যুর পর স্বেচ্ছায় তাঁহার সহিত অমৃতলোকে অনুগমন করিয়াছেন। এই ধরনের মৃত্যুবরণ প্রত্যেক দেশেই হইয়াছে। যে-কোন

দেশে ইহা এক প্রকার অস্বাভাবিক ধর্মোন্মত্ততা। অন্যত্র যেরূপ, ভারতেও উহা ঐরূপই অস্বাভাবিক। বক্তা পুনরায় বলেন, 'না, ভারতবাসী নারীদের পুড়াইয়া মারে না। পাশ্চাত্যদেশের মতো তাহারা কখনও ডাইনীদেরও দগ্ধ করে নাই।'

অতঃপর বক্তৃতার প্রকৃত বিষয়ে আসিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে মানব-জীবনের শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করেন। শরীর বাহিরের খোসা মাত্র; মনও একটি ক্রিয়াশীল বস্তুবিশেষ, ইহার কাজ খুব ত্বরিত এবং রহস্যময়; একমাত্র আত্মাই সুস্পষ্ট ব্যক্তি-সত্তা। আত্মার অনন্তস্বরূপের জ্ঞান হইলে মুক্তিলাভ হয়। আমরা যাহাকে 'পরিত্রাণ' বলি, হিন্দুরা উহাকে বলেন 'মুক্তি'। বেশ বলবান্ যুক্তিসহায়ে বক্তা প্রমাণ করেন যে, প্রত্যেক আত্মাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। আত্মা যদি কোন কিছুর অধীন হইত, তাহা হইলে উহা কখনও অমরত্ব লাভ করিতে পারিত না। কোন ব্যক্তি কিভাবে আত্মার স্বাধীনতা ও অমরত্বের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে পারে, তাহার উদাহরণস্বরূপ বক্তা তাঁহার দেশের একটি উপকথা বর্ণনা করেন।

আসন্নপ্রসবা এক সিংহী একটি মেষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার সময় বাচ্চা প্রসব করিয়া ফেলে এবং পরে মারা যায়। সিংহশাবকটিকে তখন এক মেষী স্তন্য পান করাইয়া বাঁচায়। শাবকটি মেষের দলে বাড়িতে থাকে। নিজেকে সে মেষ বলিয়া মনে করিত এবং আচরণও ঠিক মেষের ন্যায়ই করিত। একদিন আর একটি সিংহ আসিয়া তাহাকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে একটি জলাশয়ের নিকট লইয়া যায়। জলে সে নিজের প্রতিবিম্ব অপর সিংহের মতো দেখিতে পাইয়া বুঝিল—সে মেষ নয়, সিংহ। তখন সে সিংহের ন্যায় গর্জন করিয়া উঠিল। আমাদের অনেকেরই দশা ঐ ভ্রান্ত সিংহ-মেষের ন্যায়।

নিজদিগকে 'পাপী' মনে করিয়া আমরা কোণে লুকাইয়া থাকি এবং যত প্রকারে সম্ভব হীন আচরণ করিয়া চলি। নিজেদের আত্মার পূর্ণতা ও দেবত্ব আমরা দেখিতে পাই না। নরনারীর যে 'আমি', উহাই আত্মা। আত্মা যদি প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, তাহা হইলে অনন্ত পূর্ণ স্বরূপ হইতে ব্যষ্টিগত বিচ্ছিন্নতা আসিল কিরূপে?—হ্রদের জলে সূর্যের যেমন আলাদা আলাদা

অসংখ্য প্রতিবিম্ব পড়ে, ঠিক সেই ভাবে। সূর্য এক, কিন্তু প্রতিবিম্ব-সূর্য বহু। মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক, কিন্তু নানা দেহে প্রতিবিম্ব-আত্মা বহু। বিশ্ব-স্বরূপ পরমাত্মার অব্যাহত স্বাধীনতাকে উপলব্ধি করা যায়। আত্মার কোনও লিঙ্গ নাই। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ দেহেই। এই প্রসঙ্গে বক্তা সুইডনবর্গের দর্শন ও ধর্মের মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশ করেন। হিন্দু বিশ্বাসসমূহের সহিত এই আধুনিক সাধু মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক ভাবধারার সম্বন্ধ খুবই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হইতেছিল সুইডনবর্গ যেন প্রাচীন এক হিন্দু ঋষির ইওরোপীয় উত্তরাধিকারী—যিনি এক সনাতন সত্যকে বর্তমানকালের পোশাক পরাইয়া উপস্থাপিত করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ও ঔপন্যাসিক (ব্যালজাক ?) তাঁহার 'পূর্ণ আত্মা'র উদ্দীপনাময় প্রসঙ্গের মধ্যে এই ধরনের চিন্তাধারাকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন মনে করিয়াছেন। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই পরিপূর্ণতা বিদ্যমান। তাহার শারীরিক সত্তার অন্ধকার গুহাগুলির ভিতর উহা যেন শুইয়া আছে। যদি বলো, ভগবান্ তাঁহার পূর্ণতার কিছু অংশ মানুষকে দেন বলিয়াই মানুষ সৎ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, পরম দেবতা ভগবানের পূর্ণতা হইতে পৃথিবীর মানুষকে প্রদত্ত ততটা অংশ বাদ গেল। বিজ্ঞানের অব্যর্থ নিয়ম হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যষ্টি আত্মার মধ্যে পূর্ণতা নিহিত, আর এই পূর্ণতাকে লাভ করার নামই মুক্তি—ব্যক্তিগত অনন্ততার উপলব্ধি। প্রকৃতি, ঈশ্বর, ধর্ম—তিনই তখন এক।

সব ধর্মই ভাল। এক গ্লাস জলের মধ্যে যে বাতাসের বুদ্বুদটি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, উহা চেষ্টা করে বাহিরের অনন্ত বায়ুর সহিত যুক্ত হইতে। বাতাসের বুদ্বুদটি যদি তেল, ভিনিগার বা এইরূপ অন্যান্য বিভিন্ন ঘনত্ববিশিষ্ট তরল পদার্থে আটক পড়ে, তাহা হইলে উহার মুক্তির চেষ্টা তরল পদার্থটির ঘনত্ব অনুযায়ী কম বেশী ব্যাহত হয়। জীবাত্মাও সেইরূপ বিভিন্ন দেহের মধ্য দিয়া উহার স্বকীয় অনন্ততা লাভের জন্য প্রয়াস করিয়া চলিয়াছে। আচার-ব্যবহার, পারিপার্শ্বিক ও বংশগত বৈশিষ্ট্য এবং জলবায়ুর প্রভাব—এই-সব দিক বিচার করিয়া কোন এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে একটি নির্দিষ্ট ধর্ম হয়তো সর্বাপেক্ষা উপযোগী। অনুরূপ কারণে আর একটি ধর্ম অপর এক মানবগোষ্ঠীর পক্ষে প্রশস্ত। বক্তার সিদ্ধান্তগুলির চুম্বক বোধ করি এই যে, যাহা কিছু আছে, সবই উত্তম। কোন একটি জাতির ধর্মকে হঠাৎ পরিবর্তন

করিতে যাওয়া যেন—আল্পস্ পর্বত হইতে প্রবহমানা একটি নদীকে দেখিয়া কেন উহা তাহার বর্তমান পথটি লইয়াছে, সেই বিষয়ে সমালোচনা করা। আর এক ব্যক্তি হয়তো অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, হিমালয় হইতে নিঃসৃতা একটি খরস্রোতা নদী হাজার হাজার বৎসর যে-পথে বহিয়া চলিয়াছে, ঐ পথ উহার পক্ষে স্বল্পতম এবং সুষ্ঠুতম পথ নয়।

খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ঈশ্বরকে আমাদের পৃথিবীর ঊর্ধ্বে কোথাও উপবিষ্ট একজন ব্যক্তি বলিয়া কল্পনা করেন। কাজেই যে-স্বর্গে সোনার রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে নীচে মর্ত্যলোকের দিকে তাকাইয়া স্বর্গ-মর্ত্যের পার্থক্য বুঝা যায় না, এমন স্বর্গে তিনি স্বস্তিবোধ করিতে পারেন না। যাহাকে খ্রীষ্টানরা আচরণের 'স্বর্ণোজ্জ্বল নীতি'[১] বলিয়া থাকেন, উহার পরিবর্তে হিন্দুরা এই নীতিতে বিশ্বাস করেন যে, যাহা কিছু 'অহং'শূন্য, তাহাই ভাল; এবং 'আমিত্ব'-মাত্রই খারাপ, আর এই বিশ্বাস দ্বারা যথাকালে মানুষ তাহার আত্মার অনন্ত স্বরূপ ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। বিবে কানন্দ বলেন, তথাকথিত 'সোনার নীতি'টি কী ভয়ানক অমার্জিত! সর্বদাই 'আমি, আমি'।

অন্যের নিকট হইতে তুমি নিজে যেরূপ আচরণ চাও, তুমিও তাহার প্রতি সেইরূপ আচরণ কর! ইহা এক ভীষণ বর্বরোচিত ক্রূর নীতি, কিন্তু বক্তা খ্রীষ্টধর্মের এই মতবাদের নিন্দা করিতে চান না, কেন-না যাহারা ইহাতে সন্তুষ্ট, তাহারা ইহার সহিত নিজদিগকে বেশ মানাইয়া লইয়াছে, বুঝিতে হইবে। যে বিপুল জলধারাটি বহিয়া চলিয়াছে, উহাকে বহিতে দেওয়াই কর্তব্য। যিনি উহার গতিকে পরিবর্তিত করিতে চাহিবেন, তিনি নির্বোধ। প্রকৃতিই প্রয়োজনমত সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিবেন। বিবে কানন্দ বেশ জোর দিয়াই বলেন যে, প্রেততত্ত্ববাদী বা অদৃষ্টবাদী—ইহারা সকলেই ভাল এবং খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিগণকে ধর্মান্তরিত করিবার তাঁহার কোন ইচ্ছা নাই। যাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন, তাঁহারা বেশ ভালই করিতেছেন। তিনি যে হিন্দু, ইহাও উত্তম। তাঁহার দেশে বিভিন্ন স্তরের মেধাবিশিষ্ট লোকের জন্য

---

১ 'অন্যদের নিকট হইতে তোমরা তোমাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর, তাহাদের প্রতিও তোমরা সেইরূপই আচরণ করিবে।' যীশুর এই উপদেশকে 'গোল্ডেন রুল' (Golden Rule) বলা হইয়া থাকে।—বাইবেল, নিউ টেস্টামেন্ট, ম্যাথু, ৭।১২

বিভিন্ন পর্যায়ের ধর্মমত প্রচলিত আছে। সবটা মিলিয়া একটি ধারাবাহিক আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম আমিত্বকে বড় করে না। ইহার আকাঙ্ক্ষাসমূহ কখনও মানুষের অহমিকাকে জড়াইয়া নয়, ইহা কখনও পুরস্কারের আশা বা শাস্তির ভয় তুলিয়া ধরে না। হিন্দুধর্ম বলে, ব্যক্তি-মানব তাহার 'অহং'কে বর্জন করিয়া অনন্তত্ব লাভ করিতে পারে।

মানুষকে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য প্রলোভিত করিবার রীতি—ভগবান্ স্বয়ং পৃথিবীর একটি মানবগোষ্ঠীর নিকট প্রকট হইয়া ইহা প্রবর্তন করিয়াছেন বলা হইয়া থাকে—বস্তুতঃ অতি নিষ্ঠুর এবং ভয়াবহরূপে দুর্নীতিজনক। ধর্মান্ধগণ খ্রীষ্টীয় মতবাদ যদি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে উহা তাহাদের নৈতিক স্বভাবের উপর একটি লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে আত্মার অনন্ততা উপলব্ধির সময় পিছাইয়া যায়।

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ১৮ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, ভারতে ধর্ম বা সামাজিক নিয়মের বশে বিধবাদের কখনও জোর করিয়া জীবন্ত দাহ করা হয় নাই। এই ঘটনাগুলির সব ক্ষেত্রেই তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। পূর্বে ভারতের একজন সম্রাট্ সতীদাহ-প্রথা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ পরে উহা আবার প্রচলিত হয়। অবশেষে ইংরেজ সরকার উহা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। সকল ধর্মেই একশ্রেণীর লোক আছে, যাহারা ধর্মোন্মাদ। ইহা খ্রীষ্টধর্মে যেমন, হিন্দুধর্মেও তেমনি। ভারতে এমন সব ধর্মোন্মাদ দেখা যায়, যাহারা তপশ্চরণের নামে দিনের পর দিন সর্বক্ষণ মাথার উপরে হাত তুলিয়া রাখে। দীর্ঘকাল ঐরূপ করিবার ফলে হাতটি ক্রমে অসাড় হইয়া যায় এবং আজীবন ঐ অবস্থায় থাকে। কেহ কেহ ব্রত গ্রহণ করে—একভাবে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার। ক্রমে ইহাদের শরীরের নীচের দিক সম্পূর্ণ অবশ হইয়া যায় এবং উহারা আর হাঁটিতে পারে না।

সব ধর্মই সত্য। মানুষ নৈতিকতা অনুশীলন করে, কোনও দৈবাদেশের জন্য নয়, উহা ভাল বলিয়াই করে। হিন্দুরা ধর্মান্তরিতকরণে বিশ্বাস করে না। বক্তা বলেন, উহা 'বিপথে গমন'। অধিকাংশ ধর্মের পিছনে কত

ঐতিহ্য, শিক্ষাদীক্ষা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা রহিয়াছে। অতএব কোন এক ধর্ম-প্রচারকের পক্ষে অন্যধর্মাবলম্বী কাহারও ধর্মবিশ্বাসসমূহকে ভুল বলিয়া ঘোষণা করা কী নির্বুদ্ধিতা! ইহা যেন কোন এশিয়াবাসীর আমেরিকায় আসিয়া মিসিসিপি নদীর গতিপথ দেখিবার পর ঐ নদীকে ডাকিয়া বলা,—'তুমি সম্পূর্ণ ভুল পথে প্রবাহিত হইতেছ। তোমাকে উৎপত্তি-স্থানে ফিরিয়া নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিতে হইবে।' আবার আমেরিকাবাসী কেহ যদি আল্পস্ পর্বতে গিয়া জার্মান সাগরে পড়িতেছে এমন কোন নদীকে বলে যে, তাহার গতিপথ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এবং ইহার একমাত্র প্রতীকার হইল নূতন নির্দেশ অনুসারে প্রবাহিত হওয়া—তাহা হইলে উহাও একই প্রকার নির্বুদ্ধিতা হইবে। বক্তা বলেন যে, খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'সোনার নিয়ম' বলেন, উহা মাতা বসুন্ধরার মতোই পুরাতন। নৈতিকতার যাবতীয় বিধানেরই উৎপত্তি এই নিয়মটির মধ্যেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। মানুষ তো স্বার্থপরতার একটি পুঁটলি বিশেষ।

বক্তা বলেন যে, পাপীরা নরকাগ্নিতে অনন্তকাল শাস্তি ভোগ করিবে—এই মতবাদ সম্পূর্ণ অর্থহীন। দুঃখ রহিয়াছে, ইহা যখন জানা কথা, তখন পূর্ণ সুখ কি করিয়া সম্ভব? বক্তা কোন কোন তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তির প্রার্থনা করিবার রীতিকে বিদ্রূপ করেন। তিনি বলেন যে, হিন্দু চোখ বুজিয়া অন্তরাত্মার উপাসনা করে, কিন্তু কোন কোন খ্রীষ্টানকে প্রার্থনার সময় তিনি কোন একটি দিকে তাকাইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, যেন স্বর্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট ভগবান্‌কে তাঁহারা দেখিতে পাইতেছেন! ধর্মের ব্যাপারে দুটি চরম হইল—ধর্মান্ধ এবং নাস্তিক। যে নাস্তিক, তাহার কিছু ভাল দিক আছে, কিন্তু ধর্মান্ধের বাঁচিয়া থাকা শুধু তাহার ক্ষুদ্র 'আমি'টার জন্যই। জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি বক্তাকে যীশুর হৃদয়ের একটি ছবি পাঠাইয়াছেন। এই জন্য তাঁহাকে তিনি ধন্যবাদ দিতেছেন, তবে তাঁহার মতে ইহা গোঁড়ামির অভিব্যক্তি। ধর্মান্ধকে কোনও ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। তাহারা একটি অভিনব বস্তুবিশেষ।

ভগবৎপ্রেম

ডেট্রয়েট ট্রিবিউন, ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

গত রাত্রে বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য প্রথম ইউনিটেরিয়ান চার্চে খুব ভিড় হইয়াছিল। শ্রোতৃমণ্ডলী আসিয়াছিলেন জেফারসন এভিনিউ এবং উডওয়ার্ড এভিনিউ-এর উত্তরাংশ হইতে। তাঁহাদের অধিকাংশই মহিলা। ইঁহারা বক্তৃতাটিতে খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, মনে হইল। ব্রাহ্মণ বক্তার অনেকগুলি মন্তব্য সোৎসাহে হর্ষধ্বনি দ্বারা এই মহিলারা সমর্থন করিতেছিলেন।

বক্তা যে-প্রেমের বিষয় আলোচনা করিলেন, উহা যৌন-আকর্ষণের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবাবেগ নয়। ভারতে ভগবদ্ভক্ত ঈশ্বরের জন্য যে নিষ্কলুষ পবিত্র অনুরাগ বোধ করেন, উহা সেই ভালবাসা। বিবেকানন্দ তাঁহার ভাষণের প্রারম্ভে আলোচ্য বিষয়টি এই বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন: 'ভারতীয় তাহার ভগবানের জন্য যে প্রীতি অনুভব করে।' কিন্তু বলিবার সময় তিনি এই ঘোষিত বিষয়ের সামার মধ্যে থাকেন নাই। বরং বক্তৃতার বেশী ভাগ ছিল খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনা। ভারতীয়ের ধর্ম এবং ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধে আলোচনা ছিল উহার গৌণ অংশ। বক্তৃতার অনেক বিষয় ভারতেতিহাসের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের কতকগুলি প্রাসঙ্গিক কাহিনীর সাহায্যে বিশদীকৃত হয়। এই কাহিনীগুলির পাত্র ভারতবর্ষের বিখ্যাত মোগল সম্রাট্‌গণ, হিন্দুরাজগণ নয়।

বক্তা ধর্মাচার্যগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করেন—জ্ঞানমার্গের পথিক ও ভক্তিপথের অনুগামী। প্রথম শ্রেণীর জীবনের লক্ষ্য হইল প্রত্যক্ষ অনুভূতি, দ্বিতীয়ের ভগবৎপ্রেম। বক্তা বলেন, প্রেম হইল আত্মত্যাগ। প্রেম কিছু গ্রহণ করে না, সর্বদাই দিয়া যায়। হিন্দু ভক্ত ভগবানের কাছে কোন কিছু চায় না, মুক্তি বা পারলৌকিক সুখের জন্য কখনও প্রার্থনা করে না। সে তাহার সকল চেতনা অনুরাগের গাঢ় উল্লাসে প্রেমাস্পদ ভগবানের প্রতি নিযুক্ত করে। ঐ সুন্দর অবস্থা লাভ করা সম্ভবপর তখনই, যখন মানুষ ভগবানের জন্য গভীর অভাব বোধ করিতে থাকে। তখন ভগবান্ তাঁহার পরিপূর্ণ সত্তায় ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হন।

ঈশ্বরকে আমরা তিনভাবে ধারণা করিতে পারি। একটি হইল—তাঁহাকে এক বিরাট ক্ষমতাবান্ পুরুষ বলিয়া মনে করা এবং মাটিতে পড়িয়া তাঁহার মহিমার আরাধনা করা। দ্বিতীয়: তাঁহাকে পিতৃদৃষ্টিতে ভক্তি করা। ভারতে পিতাই সব সময়ে সন্তানদের শাসন করেন। সেইজন্য পিতার উপর ভক্তিশ্রদ্ধায় খানিকটা ভয়ও মিশিয়া থাকে। আরও একটি ভাব হইল ভগবান্‌কে 'মা' বলিয়া চিন্তা করা। ভারতে জননী সর্বদাই যথার্থ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই ঈশ্বরের প্রতি মাতৃভাব ভারতে খুব স্বাভাবিক।

কানন্দ বলেন যে, যথার্থ ভক্ত ভগবদনুরাগে এত বিভোর থাকেন যে, অপর ধর্মাবলম্বীদের নিকট গিয়া তাহারা ভুল পথে ঈশ্বর সাধনা করিতেছে, ইহা বলিবার এবং তাহাদিগকে স্বমতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিবার সময় তাঁহার নাই।

ডেট্রয়েট জার্নাল, ২১শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

'একটি শখ মাত্র।'—

আধুনিক কালের ধর্ম সম্বন্ধে ইহাই বিবে কানন্দের অভিমত! ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী বিবে কানন্দ, যিনি এই ডেট্রয়েট শহরে কতকগুলি ধারাবাহিক বক্তৃতা দিতেছেন, যদি আরও এক সপ্তাহ এখানে থাকিতে রাজী হন, তাহা হইলে শহরের বৃহত্তম হলঘরটিতেও তাঁহার আগ্রহশীল শ্রোতৃমণ্ডলীর স্থান কুলাইবে না। তিনি দস্তরমত একটি আকর্ষণ হইয়া পড়িয়াছেন। গতকল্য সন্ধ্যায় ইউনিটেরিয়ান চার্চের প্রত্যেকটি আসন ভরিয়া যায়; বহু লোককে বাধ্য হইয়া বক্তৃতার সারা সময় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইয়াছিল।

বক্তার আলোচ্য বিষয় ছিল 'ভগবৎপ্রেম'। প্রেমের সংজ্ঞা তিনি দিলেন—'যাহা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, প্রেমাস্পদ বস্তুর আরাধনা ও ভজনা ব্যতীত যাহার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই।' বক্তা বলেন, প্রেম এমন একটি গুণ, যাহা বিনীতভাবে পূজা করিয়া যায় এবং প্রতিদানে কিছুই চায় না। ভগবৎপ্রেম জাগতিক ভালবাসা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। সাধারণতঃ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ছাড়া ভগবান্‌কে আমরা চাই না। বক্তা নানা গল্প ও উদাহরণ দ্বারা দেখান, আমাদের ভগবদর্চনার পিছনে স্বার্থবুদ্ধি কিভাবে

নিহিত থাকে। বক্তা বলেন, খ্রীষ্টীয় বাইবেলের সর্বাপেক্ষা চমৎকার অংশ হইল 'সলোমনের গীতি'; তবে তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন যে, এই অংশকে বাইবেল হইতে বাদ দিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। বক্তা শেষের দিকে যেন এক প্রকার চূড়ান্ত যুক্তিস্বরূপ বলিলেন, 'ইহা হইতে কতটা লাভ আদায় করিতে পারি'—এই নীতির উপরই আমাদের ঈশ্বর-প্রেম স্থাপিত দেখা যাইতেছে। ভগবান্‌কে ভালবাসিবার সহিত খ্রীষ্টানদের এত স্বার্থবুদ্ধি জড়িত থাকে যে, তাহারা সর্বদাই তাঁহার নিকট কিছু না কিছু চাহিয়া থাকে। নানাপ্রকারের ভোগ-সামগ্রীও তাহার অন্তর্ভুক্ত। অতএব বর্তমানকালের ধর্ম একটা শখ ও ফ্যাশন মাত্র, আর মানুষ ভেড়ার পালের মতো গির্জায় ভিড় করে।

ভারতীয় নারী

ডেট্রয়েট ফ্রী প্রেস, ২৫শে মার্চ, ১৮৯৪

কানন্দ গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ 'ভারতীয় নারী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। তিনি প্রাচীন ভারতের নারীগণের প্রসঙ্গে বলেন যে, শাস্ত্রগ্রন্থসমূহে তাঁহাদিগকে গভীর শ্রদ্ধা দেখানো হইয়াছে। অনেক নারী ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিকতা তখন ছিল খুবই প্রশংসনীয়। প্রাচ্যের নারীগণকে প্রতীচ্যের আদর্শে বিচার করা ঠিক নয়। পাশ্চাত্যে নারী হইলেন পত্নী, প্রাচ্যে তিনি জননী। হিন্দুরা মাতৃভাবের পূজারী। সন্ন্যাসীদের পর্যন্ত গর্ভধারিণী জননীর সম্মুখে ভূমিতে কপাল ঠেকাইয়া সম্মান দেখাইতে হয়। ভারতে পবিত্রতার স্থান খুব উঁচুতে। কানন্দ এখানে যে-সব ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। সকলে উহা খুব পছন্দ করিয়াছেন।

ডেট্রয়েট ইভনিং নিউজ, ২৫শে মার্চ, ১৮৯৪

গতরাত্রে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ স্বামী বিবে কানন্দের বক্তৃতার বিষয় ছিল—'প্রাচীন, মধ্য ও বর্তমান যুগে ভারতের নারী'। তিনি বলেন, ভারতবর্ষে নারীকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ বলিয়া মনে করা হয়। নারীর সমগ্র জীবনে এই একটি চিন্তা তাঁহাকে তৎপর রাখে যে, তিনি মাতা; আদর্শ মাতা হইতে গেলে তাঁহাকে খুব পবিত্র থাকিতে হইবে। ভারতে কোন জননী কখনও তাঁহার সন্তানকে ত্যাগ করেন নাই। বক্তা বলেন, ইহার বিপরীত প্রমাণ করিবার জন্য তিনি সকলকে আহ্বান করিতেছেন। ভারতের মেয়েরা যদি আমেরিকান তরুণীদের মতো শরীরের অর্ধেক ভাগ যুবকদের কুদৃষ্টির সামনে খুলিয়া রাখিতে বাধ্য হইত, তাহা হইলে তাহারা মরিয়া যাইত। বক্তা ইচ্ছা করেন যে, ভারতকে তাহার নিজস্ব আদর্শে বিচার করা উচিত, এই দেশের আদর্শে নয়।

ট্রিবিউন, ১লা এপ্রিল, ১৮৯৪

স্বামী কানন্দের ডেট্রয়েটে অবস্থান-কালে নানা কথোপকথনে তিনি ভারতীয় নারীগণ সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর দেন। তিনি যে-সব তথ্য উপস্থাপিত করেন, তাহাতে শ্রোতাদের কৌতূহল উদ্দীপিত হয় এবং ঐ বিষয়ে সর্বসাধারণের জন্য একটি বক্তৃতা দিবার অনুরোধ আসে। কিন্তু তিনি বক্তৃতার সময় কোন স্মারকলিপি না রাখায় ভারতীয় নারী সম্বন্ধে পূর্বে ব্যক্তিগত কথোপকথনের সময় যে-সব বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা ঐ বক্তৃতায় বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে তাঁহার বন্ধুবর্গ কিছুটা নিরাশ হন, কিন্তু তাঁহার মহিলা শ্রোতাদের মধ্যে জনৈকা তাঁহার অপরাহ্ণের কথোপকথনের কিছু প্রসঙ্গ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। উহা এখন সর্বপ্রথম সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হইতেছে :

আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে আর্যগণ আসিয়া বসবাস করেন। এখনও পর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের বংশধর খাঁটি ব্রাহ্মণ-জাতি বিদ্যমান। পাশ্চাত্য লোকের পক্ষে স্বপ্নেও এই উন্নত মানবগোষ্ঠীর ধারণা করা অসম্ভব। চিন্তায় কাজে এবং আচরণে ইহারা অতিশয় শুচি।

ইহারা এত সাধুপ্রকৃতির যে, একথলি সোনা যদি প্রকাশ্যে পড়িয়া থাকে তো উহা কেহ লইবে না। কুড়ি বৎসর পরেও ঐ থলিটি একই জায়গায় পাওয়া যাইবে। এই ব্রাহ্মণদের শারীরিক গঠনও অতি চমৎকার। কানন্দের নিজের ভাষায়: 'ক্ষেতে কর্মনিরতা ইহাদের একটি কন্যাকে দেখিলে মন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়, আশ্চর্য হইয়া ভাবিতে হয়—ভগবান্ এমন অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতিমা কি করিয়া গড়িলেন!' এই ব্রাহ্মণদের অবয়ব-সংস্থান সুসম্বদ্ধ, চোখ ও চুল কৃষ্ণবর্ণ এবং গায়ের রঙ—আঙুল ছুঁচবিদ্ধ করিলে উহা হইতে একটি রক্তবিন্দু যদি এক গ্লাস দুধে পড়ে, তাহা হইলে যে রঙ সৃষ্ট হয়, সেই রঙের। অবিমিশ্র বিশুদ্ধ হিন্দু ব্রাহ্মণদের ইহাই বর্ণনা।

হিন্দু নারীর উত্তরাধিকারের আইন-কানুন সম্বন্ধে বক্তা বলেন, বিবাহের সময় স্ত্রী যে যৌতুক পান, উহা সম্পূর্ণ তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি; উহাতে স্বামীর কখনও মালিকানা থাকে না। স্বামীর সম্মতি বিনা আইনতঃ তিনি উহা বিক্রয় বা দান করিতে পারেন। সেইরূপ অন্য সূত্রে, তথা স্বামীর নিকট হইতেও তিনি যে-সকল অর্থাদি পান, উহা তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি, তাঁহার ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন।

স্ত্রীলোকেরা বাহিরে নির্ভয়ে বেড়াইয়া থাকেন। চারি পাশের লোকদের উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলিয়াই ইহা সম্ভব হয়। হিমালয়ে পর্দাপ্রথা নাই। ওখানে এমন অঞ্চল আছে যেখানে মিশনরীরা কখনও পৌঁছিতে পারেন না। এই-সব গ্রাম খুবই দুর্গম। অনেক চড়াই করিয়া এবং পরিশ্রমে ঐ-সকল জায়গায় পৌঁছানো যায়। এখানকার অধিবাসীরা কখনও মুসলমান-প্রভাবে আসে নাই। খ্রীষ্টধর্মও ইহাদের নিকট অজানা।

ভারতের প্রথম অধিবাসীরা

ভারতের অরণ্যে এখনও কিছু কিছু বনবাসী অসভ্য লোক দেখা যায়। তাহারা অত্যন্ত বর্বর, এমন কি নরমাংসভোজী। ইহারাই দেশের আদিম অধিবাসী এবং কখনও আর্য বা হিন্দু হয় নাই। আর্যগণ ভারতে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ করিলে এবং দেশের ভূভাগে ছড়াইয়া পড়িলে তাঁহাদের মধ্যে ক্রমশঃ নানাপ্রকার বিকৃতি প্রবেশ করে। সূর্যতাপও ছিল প্রচণ্ড। খর রৌদ্রে অনেকের গায়ের রঙ ক্রমশঃ কালো হইয়া যায়। হিমালয়পর্বত-বাসী শ্বেতকায় লোকের উজ্জল বর্ণ সমতলভূমির হিন্দুদের তাম্রবর্ণে পরিবর্তিত হওয়া মাত্র পাঁচ পুরুষের ব্যাপার। কানন্দের একটি ভাই আছেন, তিনি খুব ফরসা, আবার দ্বিতীয় আর একটি ভাই-এর রঙ কানন্দের চেয়ে ময়লা। তাঁহার পিতামাতা গৌরবর্ণ। মুসলমানদের অত্যাচার হইতে নারীদের রক্ষা করার জন্যই নিষ্ঠুর পর্দাপ্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। গৃহে আবদ্ধ থাকিবার দরুন হিন্দু রমণীদের গায়ের রঙ পুরুষদের অপেক্ষা পরিষ্কার। কানন্দের বয়স একত্রিশ বৎসর।

আমেরিকান পুরুষদের প্রতি কটাক্ষ

কানন্দ চোখের কোণে ঈষৎ কৌতুক মিশাইয়া বলেন যে, আমেরিকান পুরুষদের দেখিয়া তিনি আমোদ অনুভব করেন। তাঁহারা প্রচার করিয়া বেড়ান যে, স্ত্রীজাতি তাঁহাদের পূজার পাত্র, কিন্তু তাঁহার মতে আমেরিকানরা পূজা করেন রূপ ও যৌবনকে। তাঁহাদিগকে কখনো তো বলিরেখা বা পক্ক কেশের সহিত প্রেমে পড়িতে দেখা যায় না! বক্তা বলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার দৃঢ় ধারণা এই যে, এক সময়ে মার্কিন পুরুষদের পুরুষানুক্রমে পাওয়া একটি প্রথা ছিল—বৃদ্ধা নারীদের পোড়াইয়া মারা। বর্তমান ইতিহাস ইহার নাম দিয়াছে—ডাইনী-দহন। পুরুষরাই ডাইনীদের অভিযুক্ত করিত, আর সাধারণতঃ অভিযুক্তার জরাই ছিল তাহার প্রাণদণ্ডের কারণ। অতএব দেখা যাইতেছে, জীবন্ত নারীকে দগ্ধ করা শুধু যে একটি হিন্দুরীতি, তাহা নয়। বক্তার মতে খ্রীষ্টীয় গির্জার তরফ হইতে এক সময়ে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকদের অগ্নিদগ্ধ করা হইত, ইহা স্মরণ রাখিলে হিন্দু বিধবাদের সহমরণ-প্রথার কথা শুনিয়া পাশ্চাত্য সমালোচকদের আতঙ্ক অনেক কম হইবে।

উভয় দাহের তুলনা

হিন্দু বিধবা যখন মৃত পতির সহিত স্বেচ্ছায় অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতেন, তখন ভূরিভোজন এবং সঙ্গীতাদিসহ একটি উৎসবের পরিবেশ সৃষ্ট হইত। মহিলা নিজে তাঁহার সর্বাপেক্ষা দামী বস্ত্র পরিতেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, স্বামীর সহিত সহমরণে তাঁহার নিজের এবং পরিবারবর্গের স্বর্গলোকে গতি হইবে। আত্মবলিদাত্রীরূপে তাঁহাকে সকলে পূজা করিত এবং তাঁহার নাম পরিবারের বিবরণীতে চিরদিন গৌরবান্বিত হইয়া থাকিত।

সহমরণ-প্রথা আমাদের নিকট যত নৃশংসই মনে হউক, খ্রীষ্টীয় সমাজে ডাইনী-দহনের তুলনায় ইহার একটা উজ্জ্বল দিক রহিয়াছে। যে স্ত্রীলোককে ডাইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইত, গোড়া হইতেই তাহাকে পাপী সাব্যস্ত করা হইত। তারপর একটি বদ্ধ কারাকক্ষে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া পাপ স্বীকারের জন্য চলিত নিষ্ঠুর নির্যাতন এবং ঘৃণিত বিচার-প্রহসন। অবশেষে শাস্তিদাতাদের হর্ষধ্বনির মধ্যে বেচারীকে টানিয়া বধ্যস্থানে লইয়া যাওয়া হইত। বলপূর্বক অগ্নিদাহের যন্ত্রণার মধ্যে তাহার সান্ত্বনা থাকিত শুধু দর্শকবৃন্দের আশ্বাস যে, মৃত্যুর পর অনন্ত নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার আত্মার ভাগ্যে ভবিষ্যতে যে ভীষণতর কষ্ট লেখা আছে, বর্তমান কষ্ট শুধু তাহার একটি সামান্য নিদর্শন।

জননীগণ আরাধ্যা

কানন্দ বলেন যে, হিন্দুরা মাতৃ-ভাবটির পূজা করিতে শিক্ষা পায়। মায়ের স্থান পত্নীর ঊর্ধ্বে। মা হইলেন আরাধনার পাত্রী। হিন্দুদের মনে ঈশ্বরের পিতৃভাব অপেক্ষা মাতৃভাবটিই বেশী স্থান পায়।

কোন জাতির স্ত্রীলোককেই অপরাধের জন্য কঠিন শারীরিক শাস্তি দেওয়ার বিধান নাই। হত্যা-অপরাধ করিলেও নারী প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পায়। বরং অপরাধিনীকে গাধার পিঠে লেজের দিকে মুখ করিয়া বসাইয়া রাস্তায় ঘুরানো হয়। একজন ঢোল পিটাইয়া তাহার অপরাধ উচ্চৈঃস্বরে জানাইয়া যায়; পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহার এই অবমাননাকেই যথেষ্ট শাস্তি এবং ভবিষ্যতে অপরাধের পুনরাবৃত্তির প্রতিষেধক বলিয়া মনে করা হয়। অপরাধিনী প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিলে

নানা ধর্মপ্রতিষ্ঠানে গিয়া উহা অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ পায় এবং এইভাবে সে পুনরায় শুচি হইতে পারে। অথবা সে স্বেচ্ছায় সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশপূর্বক যথার্থ নিষ্পাপ জীবন লাভ করিতে পারে।

মিঃ কানন্দকে প্রশ্ন করা হয় যে, এইভাবে অপরাধিনী নারী সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলে এবং সমাজ-শাসন এড়াইয়া গেলে পবিত্র ঋষিদের প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে ভণ্ডামির স্থান দেওয়া হয় কিনা। কানন্দ উহা স্বীকার করিলেন, তবে ব্যাখ্যা করিয়া ইহাও বুঝাইয়া দিলেন যে, জনসাধারণ ও সন্ন্যাসীর মধ্যে অপর কেহ অন্তর্বর্তী নাই। সন্ন্যাসী সকল জাতির গণ্ডী ভাঙিয়া দিয়াছেন। একজন ব্রাহ্মণ নিম্নবর্ণের কোন হিন্দুকে হয়তো স্পর্শ করিবেন না, কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করে, তাহা হইলে অত্যন্ত অভিজাত ব্রাহ্মণও তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িতে সঙ্কুচিত হইবেন না।

গৃহস্থেরা সন্ন্যাসীর ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করে, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার সাধুতা সম্বন্ধে তাহাদের বিশ্বাস আছে। সন্ন্যাসীর ভণ্ডামি ধরা পড়িলে তাহাকে সকলে মিথ্যাচারী বলিয়া মনে করে। তাহার জীবন তখন অধম ভিক্ষুকের জীবন মাত্র। কেহ তাহাকে আর শ্রদ্ধা করে না।

অন্যান্য চিন্তাধারা

নারী রাজা অপেক্ষাও অধিক সম্মান ও সুবিধা ভোগ করেন। যখন গ্রীক পণ্ডিতরা হিন্দুজাতির সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, তখন সকল গৃহের দ্বারই তাঁহাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু মুসলমানরা যখন তাহাদের তরবারি এবং ইংরেজগণ তাহাদের গুলি-গোলা লইয়া দেখা দিল, তখন সব দরজাই বন্ধ করা হইল। এই ধরনের অতিথিকে কেহ স্বাগত জানায় নাই। কানন্দ যেমন মিষ্ট করিয়া বলেন, 'যখন বাঘ আসে, তখন আমরা আমাদের দরজা বন্ধ রাখি, যতক্ষণ না বাঘ চলিয়া যায়।'

কানন্দ বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা তাঁহাকে বহুতর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য উদ্দীপনা দিয়াছে, তবে আমাদের তথা জগতের নিয়তি আজিকার আইন-প্রণেতার উপর অপেক্ষা করিতেছে না, উহা অপেক্ষা করিতেছে নারীজাতির উপর। কানন্দের উক্তি: 'তোমাদের দেশের মুক্তি দেশের নারীগণের উপরই নির্ভর করে।'

ধর্মে দোকানদারি

মিনিয়াপলিস্ শহরে ১৮৯৩ খৃঃ, ২৬শে নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতার 'মিনিয়াপলিস্ জার্নাল' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণ

চিকাগো ধর্ম-মহাসভার খ্যাতিমান্ ব্রাহ্মণ পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্যদেশীয় ধর্ম-ব্যাখ্যান হইতে কিছু শিখিতে উদ্গ্রীব শ্রোতৃমণ্ডলী গতকল্য সকালে ইউনিটেরিয়ান চার্চ-এ ভিড় করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে এই শহরে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন 'পেরিপ্যাটেটিক্ ক্লাব'। গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ঐ প্রতিষ্ঠানে তাঁহার বক্তৃতা হয়। গতকল্যকার বক্তৃতার জন্য তাঁহাকে এই সপ্তাহ পর্যন্ত এখানে থাকিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। * * *

প্রারম্ভিক প্রার্থনার পর ধর্মযাজক ডক্টর এইচ. এম. সিমন্‌স্—'বিশ্বাস, আশা এবং দান' সম্বন্ধে সেণ্ট পলের উক্তি পাঠ করেন। সেণ্ট পল যে বলিয়াছেন, 'ইহাদের ভিতর দানই হইল সর্বোত্তম'—ইহার সমর্থনে ডক্টর সিমন্‌স্ ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রের একটি শিক্ষা, মোসলেম ধর্মমতের একটি বচন এবং হিন্দু সাহিত্য হইতে কয়েকটি কবিতা পাঠ করেন। এই উক্তিগুলির সহিত সেণ্ট পলের কথার সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

দ্বিতীয় প্রার্থনা-সঙ্গীতের পর স্বামী বিবেকান্দিকে শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট পরিচিত করিয়া দেওয়া হয়। তিনি বক্তৃতামঞ্চের ধারে আসিয়া দাঁড়ান এবং গোড়াতেই একটি হিন্দু উপাখ্যান বলিয়া সকলের চিত্ত আকৃষ্ট করেন। উৎকৃষ্ট ইংরেজীতে তিনি বলেন:

তোমাদিগকে আমি পাঁচটি অন্ধের একটি গল্প বলিব। ভারতের কোন গ্রামে একটি শোভাযাত্রা চলিতেছে। উহা দেখিবার জন্য অনেক লোকের ভিড় হইয়াছে। বহু আড়ম্বরে সুসজ্জিত একটি হাতি ছিল সকলের বিশেষ আকর্ষণ। সকলেই খুব খুশী। পাঁচজন অন্ধও দর্শকের সারির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা তো চোখে দেখিতে পায় না, তাই ঠিক করিল হাতিকে স্পর্শ করিয়া বুঝিয়া লইবে জানোয়ারটি কেমন। ঐ সুযোগ তাহাদিগকে দেওয়া হইল। শোভাযাত্রা চলিয়া গেলে সকলের সহিত তাহারা বাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। তখন হাতির সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হইল।

একজন বলিল, 'হাতি হইতেছে ঠিক দেওয়ালের মতো।' দ্বিতীয় বলিল, 'না, তা তো নয়, উহা হইল দড়ির মতো।' তৃতীয় অন্ধ কহিল, 'দূর, তোমার ভুল হইয়াছে, আমি যে নিজে হাত দিয়া দেখিয়াছি, উহা ঠিক সাপের মতো।' আলোচনায় উত্তেজনা বাড়িয়া চলিল, তখন চতুর্থ অন্ধ বলিল যে, হাতি হইল ঠিক যেন একটি বালিশ। ক্রুদ্ধ বাদপ্রতিবাদে অবশেষে পঞ্চম অন্ধ মারামারি শুরু করিল। তখন একজন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত। সে জিজ্ঞাসা করিল, 'বন্ধুগণ, ব্যাপার কি?' ঝগড়ার কারণ বলা হইলে আগন্তুক কহিল, 'মশায়রা, আপনাদের সকলের কথাই ঠিক। মুস্কিল এই যে, আপনারা হাতির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় স্পর্শ করিয়াছেন। হাতির পাশ হইল দেওয়ালের মতো। লেজকে তো দড়ি মনে হইবেই। উহার শুঁড় সাপের মতো বলা চলে, আর যিনি পায়ের পাতা ছুঁইয়া দেখিয়াছেন, তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে, হাতি বালিশের মতো। এখন আপনারা ঝগড়া থামান। বিভিন্ন দিক দিয়া হাতি সম্বন্ধে আপনারা সকলেই সত্য কথা বলিয়াছেন।'

বক্তা বলেন: ধর্মেও এই ধরনের মতদ্বৈধ দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্যের লোক মনে করে, তাহারাই একমাত্র ঈশ্বরের খাঁটি ধর্মের অধিকারী; আবার প্রাচ্যদেশের লোকেরও নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে অনুরূপ গোঁড়ামি বিদ্যমান। উভয়েরই ধারণা ভুল। বস্তুতঃ ঈশ্বর প্রত্যেক ধর্মেই রহিয়াছেন।

প্রতীচীর চিন্তাধারা সম্বন্ধে বক্তা অনেক স্পষ্ট সমালোচনা করেন। তাঁহার মতে খ্রীষ্টানদের মধ্যে 'দোকানদারী' ধর্মের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাঁহাদের প্রার্থনা: হে ঈশ্বর, আমাকে ইহা দাও, উহা দাও; হে প্রভু, তুমি আমার জন্য ইহা কর, উহা কর। হিন্দু ইহা বুঝিতে পারে না। তাহার বিবেচনায় ঈশ্বরের কাছে কিছু চাওয়া ভুল। কিছু না চাহিয়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির বরং উচিত দেওয়া। ঈশ্বরের নিকট কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাকে এবং মানুষকে যথাসাধ্য দান করা—ইহাতেই হিন্দুর অধিকতর বিশ্বাস। বক্তা বলেন, তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে, পাশ্চাত্যে অনেকেই যখন সময় ভাল চলিতেছে, তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে বেশ সচেতন, কিন্তু দুর্দিন আসিলে তাঁহাকে আর মনে থাকে না। পক্ষান্তরে হিন্দু ঈশ্বরকে দেখেন ভালবাসার পাত্ররূপে। হিন্দুধর্মে ভগবানের পিতৃভাবের ন্যায় মাতৃত্বের স্বীকৃতি আছে, কারণ ভালবাসার সুষ্ঠুতর পরিণতি ঘটে মাতাপুত্রের সম্বন্ধের মাধ্যমে। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টান সারা সপ্তাহ

টাকা রোজগারের জন্য খাটিয়া চলে, ইহাতে সফল হইলে সে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বলে, 'হে প্রভু, তুমি যে এই টাকা দিয়াছ, সেজন্য তোমাকে ধন্যবাদ।' তারপর যাহা কিছু সে রোজগার করিয়াছে, সবটাই নিজের পকেটে ফেলে। হিন্দু কি করে? সে টাকা উপার্জন করিলে দরিদ্র এবং দুর্দশাগ্রস্তদের সাহায্য করিয়া ঈশ্বরের সেবা করে।

বক্তা এইভাবে প্রাচী এবং প্রতীচীর ভাবধারার তুলনামূলক আলোচনা করেন। ঈশ্বরের প্রসঙ্গে বিবেকানন্দীর উক্তির নিষ্কর্ষ: তোমরা পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা মনে কর ঈশ্বরকে কবলিত করিয়াছ। ইহার অর্থ কি? ভগবান্‌কে যদি তোমরা পাইয়াই থাকিবে, তাহা হইলে তোমাদের মধ্যে এত অপরাধ-প্রবণতা কেন? দশজনের মধ্যে নয়জন এত কপট কেন? ভগবান্ যেখানে, সেখানে কপটাচার থাকিতে পারে না। ভগবানের উপাসনার জন্য তোমাদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ রহিয়াছে, সপ্তাহে একদিন ওখানে কিছু সময় তোমরা কাটাইয়াও আসো, কিন্তু কয়জন তোমরা বাস্তবিকই ভগবান্‌কে পূজা করিতে যাও? পাশ্চাত্যে গির্জায় যাওয়া একটা ফ্যাশন-বিশেষ এবং তোমাদের অনেকেরই গির্জায় যাওয়ার পিছনে অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যবাসী তোমাদের ভগবানের উপর বিশেষ অধিকারের কোনও দাবি থাকিতে পারে কি?

এই সময়ে বক্তাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ দ্বারা অভিনন্দিত করা হয়। বক্তা বলিতে থাকেন: আমরা হিন্দুধর্মাবলম্বীরা প্রেমের জন্য ভগবান্‌কে ডাকায় বিশ্বাস করি। তিনি আমাদিগকে কি দিলেন সেজন্য নয়, তিনি প্রেমস্বরূপ বলিয়াই তাঁহাকে ভালবাসি। কোন জাতি বা সমাজ বা ধর্ম যতক্ষণ প্রেমের জন্য ভগবান্‌কে আরাধনা করিতে ব্যগ্র না হইতেছে, ততক্ষণ উহারা ঈশ্বরকে পাইবে না। প্রতীচ্যে তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বড় বড় আবিষ্ক্রিয়ায় খুব করিতকর্মা, প্রাচ্যে আমরা ক্রিয়াপটু ধর্মে। তোমাদের দক্ষতা বাণিজ্যে, আমাদের ধর্মে। তোমরা যদি ভারতে গিয়া ক্ষেতে মজুরদের সহিত আলাপ কর, দেখিবে রাজনীতিতে তাহাদের কোন মতামত নাই। ঐ সম্বন্ধে তাহারা একেবারেই অজ্ঞ। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে কথা কও, দেখিবে উহাদের মধ্যে যে দীনতম, সেও একেশ্বরবাদ দ্বৈতবাদ প্রভৃতি ধর্মের সব মতের বিষয় জানে। যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, 'তোমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থা কি রকম?' সে বলিবে,

'অতশত বুঝি না, আমি খাজনা দিই এই পর্যন্ত, আর কিছু জানি না।' আমি তোমাদের শ্রমিক এবং কৃষকদের সহিত কথা কহিয়া দেখিয়াছি, তাহারা রাজনীতিতে বেশ দুরন্ত। তাহারা হয় ডেমোক্র্যাট্, নয় রিপাবলিকান এবং রৌপ্যমান বা স্বর্ণমান কোন্‌টি তাহারা পছন্দ করে, তাহাও বলিতে পারে। কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধে যদি জিজ্ঞাসা কর, তাহারা ভারতীয় কৃষকের মতোই বলিবে—'জানি না'। একটি নির্দিষ্ট গির্জায় তাহারা যায়, কিন্তু ঐ গির্জার মতবাদ কি, তাহা তাহাদের মাথায় ঢুকে না। গির্জায় ঘেরা আসনের জন্য তাহারা ভাড়া দেয়—এই পর্যন্তই তাহারা জানে।

ভারতবর্ষে যে নানা প্রকারের কুসংস্কার আছে, বক্তা তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু তিনি পাল্টা প্রশ্ন তুলেন, 'কোন্ জাতি কুসংস্কার হইতে মুক্ত?' উপসংহারে বক্তা বলেন: প্রত্যেক জাতি ভগবান্‌কে তাহাদের একচেটিয়া সম্পত্তি বলিয়া মনে করে। বস্তুতঃ প্রত্যেক জাতিরই ঈশ্বরের উপর দাবি আছে। সৎপ্রবৃত্তি মাত্রই ঈশ্বরের প্রকাশ। কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে মানুষকে শিখিতে হইবে 'ভগবান্‌কে চাওয়া।' এই চাওয়াকে বক্তা জলমগ্ন ব্যক্তি যে প্রাণপণ চেষ্টায় বাতাস চায়, তাহার সহিত তুলনা করেন। বাতাস তাহার চাই-ই, কারণ বাতাস ছাড়া সে বাঁচিতে পারে না। পাশ্চাত্যবাসী যখন এইভাবে ভগবান্‌কে চাহিতে পারিবে, তখনই তাহারা ভারতে স্বাগত হইবে, কেন-না প্রচারকেরা তখন আসিবেন যথার্থ ভগবদ্ভাব লইয়া, ভারত ভগবান্‌কে জানে না—এই ধারণা লইয়া নয়। তাঁহারা আসিবেন যথার্থ প্রেমের ভাব বহন করিয়া, কতকগুলি মতবাদের বোঝা লইয়া নয়।

মানুষের নিয়তি

মেমফিস শহরে ১৮৯৪ খৃঃ ১৭ই জানুআরি প্রদত্ত ভাষণের চুম্বক ;
১৮ই জানুআরির 'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

শ্রোতৃসমাগম মোটের উপর ভালই হইয়াছিল। শহরের সেরা সাহিত্য-রসিক ও সঙ্গীতামোদীরা, তথা আইন এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বক্তা কোন কোন আমেরিকান বাগ্মী হইতে একটি বিষয়ে স্বতন্ত্র। গণিতের অধ্যাপক যেমন ছাত্রদের কাছে বীজগণিতের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় ধাপে ধাপে বুঝাইয়া দেন, ইনিও তেমনি তাঁহার বিষয়বস্তু সুবিবেচনার সহিত ধীরে ধীরে উপস্থাপিত করেন। কানন্দ[১] নিজের ক্ষমতা এবং যাবতীয় প্রতিকূল যুক্তির বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয়কে সফলভাবে সমর্থন করিবার সামর্থ্যের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখিয়া কথা বলেন। এমন কোন ভাবধারা তিনি আনেন না বা এমন কোন কিছু ঘোষণা করেন না, যাহাকে শেষ পর্যন্ত তিনি ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে লইয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহার বক্তৃতার অনেক স্থলে ইঙ্গারসোলের[২] দর্শনের সহিত কিছু সাদৃশ্য আছে। তিনি মৃত্যুর পরে নরকে শাস্তিভোগে বিশ্বাস করেন না। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ঈশ্বরকে মানেন, সেইরূপ ঈশ্বরেও তাঁহার আস্থা নাই। মানুষের মনকে তিনি অমর বলেন না, কারণ উহা পরতন্ত্র। সকল-প্রকার আবেষ্টন হইতে যাহা মুক্ত নয়, তাহা কখনও অমর হইতে পারে না।

কানন্দ বলেন: ভগবান্ একজন রাজা নন, যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন এক কোণে বসিয়া মর্ত্যবাসী মানুষের কর্ম অনুযায়ী দণ্ড বা পুরস্কার বিধান করিতেছেন। এমন এক সময় আসিবে, যখন মানুষ সত্যের উপলব্ধি করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিবে এবং বলিবে—আমি ঈশ্বর, আমি তাঁর প্রাণের প্রাণ। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, নিজেদের মৃত্যুহীন সত্তাই যখন ভগবান্, তখন তিনি অতি দূরে, এই শিক্ষা দিবার সার্থকতা কি ?

---

১ ঐ সময়ে সাংবাদিকরা সাধারণতঃ স্বামীজীকে ভাইভ কানন্দ (Vive Kananda) বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তাহারা মনে করিতেন, প্রথমাংশটি তাঁহার নাম, দ্বিতীয়টি তাঁহার উপাধি।

২ রবার্ট গ্রীন ইঙ্গারসোল (১৮৩৩-৯৯) আমেরিকার প্রসিদ্ধ আইনজীবী, অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic), বক্তা এবং লেখক।

তোমাদের ধর্মে যে আদিম পাপের কথা আছে, উহা শুনিয়া বিভ্রান্ত হইও না, কেন-না তোমাদের ধর্ম আদিম নিষ্পাপ অবস্থার কথাও বলে। আদমের যখন অধঃপতন ঘটিল, তখন উহা তো তাঁহার পূর্বেকার নির্মল স্বভাব হইতেই। (শ্রোতৃবৃন্দের হর্ষধ্বনি) পবিত্রতাই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ, আর সকল ধর্মাচরণের লক্ষ্য হইল উহা ফিরিয়া পাওয়া। প্রত্যেক মানুষ শুদ্ধস্বরূপ, প্রত্যেক মানুষ সৎ। আপত্তি উঠিতে পারে, কোন কোন মানুষ পশুতুল্য কেন? উত্তরে বলি, যাহাকে তুমি পশুতুল্য বলিতেছ, সে ধুলামাটিমাখা হীরকখণ্ডের মতো। ধুলা ঝাড়িয়া ফেল, যে হীরা সেই হীরা দেখিতে পাইবে; কখনও ধূলিলিপ্ত হয় নাই, এমন স্বচ্ছ। আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রত্যেক আত্মা একটি বৃহৎ হীরকখণ্ড।

আমাদের মানুষ-ভ্রাতাকে পাপী বলার চেয়ে নীচতা আর নাই। একবার একটি সিংহী একটি ভেড়ার পালে পড়িয়া একটি মেষকে নিহত করে। সিংহীটি ছিল আসন্নপ্রসবা। লাফ দিবার ফলে তাহার শাবকটি ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু লম্ফন-জনিত ক্লান্তিতে সিংহী মারা যায়। সিংহশিশুকে দেখিয়া একটি মেষমাতা উহাকে স্তন্য পান করাইতে থাকে। সিংহশাবক মেষের দলে ঘাস খাইয়া বাড়িতে লাগিল। একদিন একটি বৃদ্ধ সিংহ ঐ সিংহ-মেষকে দেখিতে পাইয়া ভেড়ার দল হইতে উহাকে সরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সিংহ-মেষ ছুটিয়া পলাইয়া গেল। বৃদ্ধ সিংহ অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং পরে উহাকে ধরিয়া ফেলিল। তখন সে উহাকে একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের ধারে লইয়া গিয়া বলিল, 'তুমি ভেড়া নও, সিংহ—এই জলের মধ্যে নিজের আকৃতি দেখ।' সিংহ-মেষও জলে প্রতিবিম্বিত নিজের চেহারা দেখিয়া বলিয়া উঠিল, 'আমি সিংহ, ভেড়া নই।' আসুন, আমরা নিজেদের মেষ না ভাবিয়া সিংহ ভাবি। আসুন আমরা মেষের মতো 'ব্যা ব্যা' করা এবং ঘাস খাওয়া পরিত্যাগ করি।

আমেরিকায় আমার চার মাস কাটিল। ম্যাসাচুসেট্‌স্ রাজ্যে আমি একটি চরিত্র-সংশোধক জেল দেখিতে গিয়াছিলাম। জেলের অধ্যক্ষকে জানিতে দেওয়া হয় না—কোন্ কয়েদীর কি অপরাধ। কয়েদীদের প্রত্যেকের উপর যেন সহৃদয়তার একটি আচ্ছাদনী ফেলিয়া দেওয়া হয়। আর একটি শহরের কথা জানি, যেখানে বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিদের দ্বারা

সম্পাদিত তিনটি সংবাদপত্রে প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে যে, অপরাধীদের কঠিন সাজা হওয়া প্রয়োজন। আবার ওখানকার অন্য একটি কাগজের মতে দণ্ড অপেক্ষা ক্ষমাই সুসঙ্গত। একটি কাগজের সম্পাদক পরিসংখ্যান দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, যে-সব কয়েদীকে কঠোর সাজা দেওয়া হয়, তাহাদিগের শতকরা মাত্র পঞ্চাশ জন সৎপথে ফিরিয়া আসে; পক্ষান্তরে যাহারা মৃদুভাবে দণ্ডিত, তাহাদের ভিতর শতকরা নব্বই জন কারামুক্তির পর সদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করে।

ধর্মের উৎপত্তি মানুষের প্রকৃতি-গত দুর্বলতার ফলে নয়। কোন এক অত্যাচারীকে আমরা ভয় করি বলিয়াই যে ধর্মের জন্ম, তাহাও নয়। ধর্ম হইল প্রেম—যে-প্রেম বিকশিত হইয়া, বিস্তারিত হইয়া, পুষ্টিলাভ করিয়া চলে। একটি ঘড়ির কথা ধর। ছোট একটি আধারের মধ্যে কল্-কব্জা রহিয়াছে, আর রহিয়াছে একটি স্প্রিং। দম দেওয়া হইলে স্প্রিংটি উহার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে চায়। মানুষ হইল ঘড়ির স্প্রিং-এর মতো। সব ঘড়ির যে একই রকমের স্প্রিং থাকিবে তাহা নয়, সেইরূপ সকল মানুষের ধর্মমত এক হইবার প্রয়োজন নাই। আর আমরা ঝগড়াই বা করিব কেন? আমাদের সকলের চিন্তাধারা যদি একই প্রকারের হইত, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যু ঘটিত। বাহিরের গতির নাম কর্ম, ভিতরের গতি হইল মানুষের চিন্তা। ঢিলটি মাটিতে পড়িল; আমরা বলি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি উহার কারণ। ঘোড়া গাড়ি টানিয়া লইয়া যাইতেছে, কিন্তু ঘোড়াকে চালাইতেছেন ঈশ্বর। ইহাই গতির নিয়ম। ঘূর্ণিপাক জলস্রোতের প্রবলতা নির্ণয় করে। স্রোত যদি বন্ধ হয়, তাহা হইলে নদীও মরিয়া যায়। গতিই জীবন। আমাদের একত্ব এবং বৈচিত্র্য দুই-ই চাই। গোলাপকে অন্য এক নামে ডাকিলেও উহার মিষ্ট গন্ধ আগেকার মতোই থাকিবে। অতএব তোমার ধর্ম যাহাই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

একটি গ্রামে ছয়জন অন্ধ বাস করিত। তাহারা হাতি দেখিতে গিয়াছে। চোখে তো দেখিতে পায় না, হাত দিয়া অনুভব করিল হাতি কি রকম। একজন হাতির লেজে হাত দিয়া দেখিল, একজন হাতির পার্শ্বদেশে। একজন শুঁড়ে এবং চতুর্থ জন কানে। তখন তাহারা হাতির

বর্ণনা শুরু করিল। প্রথম অন্ধ বলিল, হাতি হইল দড়ির মতো। দ্বিতীয় জন বলিল, না, হাতি হইতেছে বিরাট দেওয়ালের মতো। তৃতীয় অন্ধের মতে হাতি একটি অজগর সাপের মতো; আর চতুর্থ জন—যে হাতির কানে হাত দিয়াছিল—বলিল, হাতি একটি কুলার মতো। মতভেদের জন্ম অবশেষে তাহারা ঝগড়া এবং ঘুষাঘুষি আরম্ভ করিল। এমন সময়ে ঘটনাস্থলে একব্যক্তি আসিয়া পড়িল এবং তাহাদিগকে কলহের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অন্ধেরা বলিল যে, তাহারা হাতিটিকে দেখিয়াছে, কিন্তু হাতি সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই মত আলাদা এবং প্রত্যেকেই অপরকে মিথ্যাবাদী বলিতেছে। তখন আগন্তুক তাহাদিগকে বলিল, 'তোমাদের কাহারও কথা পুরা সত্য নয়, তোমরা অন্ধ। হাতি বাস্তবিক কি রকম, তাহা তোমরা কেহই জান না।'

আমাদের ধর্মের ব্যাপারেও এইরূপ ঘটিতেছে। আমাদের ধর্মের জ্ঞান অন্ধের হস্তিদর্শনের তুল্য। (শ্রোতৃমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি)

ভারতে জনৈক সন্ন্যাসী বলিয়াছিলেন, মরুভূমির বালি পিষিয়া কেহ তেল বাহির করিতে পারে অথবা কুমীরের কামড় না খাইয়া তাহার দাঁত কেহ উপড়াইয়া আনিতে পারে—এ কথা বরং বিশ্বাস করিব, কিন্তু ধর্মান্ধ ব্যক্তির গোঁড়ামির পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না। ধর্মে ধর্মে এত মতান্তর কেন, যদি জিজ্ঞাসা কর তো তাহার উত্তর এই—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনী হাজার মাইল পর্বতগাত্র বাহিয়া অবশেষে বিশাল সমুদ্রে গিয়া পড়ে। সেইরূপ নানা ধর্মও তাহাদের অনুগামিগণকে শেষ পর্যন্ত ভগবানের কাছেই লইয়া যায়। ১৯০০ বৎসর ধরিয়া তোমরা ইহুদীগণকে দলিত করিবার চেষ্টা করিতেছ। চেষ্টা সফল হইয়াছে কি? প্রতিধ্বনি উত্তর দেয় অজ্ঞানতা এবং ধর্মান্ধতা কখনও সত্যকে বিনষ্ট করিতে পারে না।

বক্তা এই ধরনের যুক্তি-পুরঃসর প্রায় দুই ঘণ্টা বলিয়া চলেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলেন, 'আসুন, আমরা কাহারও ধ্বংসের চেষ্টা না করিয়া একে অপরকে সাহায্য করি।'

পুনর্জন্ম

মেমফিস শহরে ১৮৯৪ খৃঃ, ১৯শে জানুআরি প্রদত্ত; ২০শে জানুআরির 'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

পীত-আলখাল্লা ও পাগড়ি-পরিহিত সন্ন্যাসী স্বামী ভিভে কানন্দ পুনরায় গতরাত্রে 'লা স্যালেট অ্যাকাডেমি'তে বেশ বড় এবং সমঝদার একটি সভায় বক্তৃতা দিয়াছেন। আলোচ্য বিষয় ছিল 'আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ'। বলিতে গেলে এই বিষয়টির আলোচনায় ভিভে কানন্দের বোধ করি স্বপক্ষ-সমর্থনে যত সুবিধা হইয়াছিল, এমন আর অন্য কোন ক্ষেত্রে হয় নাই। প্রাচ্য জাতিসমূহের ব্যাপকভাবে স্বীকৃত বিশ্বাসগুলির মধ্যে পুনর্জন্মবাদ অন্যতম। স্বদেশে কিংবা বিদেশে এই বিশ্বাসের পক্ষ-সমর্থন করিতে তাহারা সর্বদাই প্রস্তুত, কানন্দ যেমন তাঁহার বক্তৃতায় বলিলেন :

আপনারা অনেকেই জানেন না যে পুনর্জন্মবাদ প্রাচীন ধর্মসমূহের একটি অতি পুরাতন বিশ্বাস। ফ্যারিসী, ইহুদী এবং খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের প্রথম প্রবর্তকগণের মধ্যে ইহা সুপরিচিত ছিল। আরবদিগের ইহা একটি প্রচলিত বিশ্বাস ছিল। হিন্দু এবং বৌদ্ধদের মধ্যে ইহা এখনও টিকিয়া আছে। বিজ্ঞানের অভ্যুদয়কাল পর্যন্ত এই ধারা চলিয়া আসিয়াছিল। বিজ্ঞান তো বিভিন্ন জড়-শক্তিকে বুঝিবার প্রয়াস মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের আপনারা মনে করেন, পুনর্জন্মবাদ নৈতিক আদর্শকে ব্যাহত করে। পুনর্জন্মবাদের বিচার-ধারা এবং যৌক্তিক ও তাত্ত্বিক দিকগুলির পুরাপুরি আলোচনার জন্য আমাদিগকে গোড়া হইতে সবটা বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে। আমরা এই বিশ্বজগতের একজন ন্যায়বান্ ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু সংসারের দিকে তাকাইয়া দেখিলে ন্যায়ের পরিবর্তে অন্যায়ই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মানুষ সর্বোৎকৃষ্ট পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিল। তাহার সারা জীবনে অনুকূল অবস্থাগুলি যেন প্রস্তুত হইয়া তাহার হাতের মধ্যে আসিয়া পড়ে, সব কিছুই তাহার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতির সহায়ক হয়। পক্ষান্তরে আর একজন হয়তো এমন পরিবেষ্টনীতে পৃথিবীতে আসে যে, জীবনের প্রতি ধাপে তাহাকে অপর সকলের প্রতিপক্ষতা করিতে হয়। নৈতিক

অধঃপাতে গিয়া, সমাজচ্যুত হইয়া সে পৃথিবী হইতে বিদায় লয়। মানুষের ভিতর সুখ-শান্তির বিধানে এত তারতম্য কেন?

জন্মান্তরবাদ আমাদের প্রচলিত বিশ্বাসসমূহের এই গরমিলগুলির সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে। এই মতবাদ আমাদিগকে দুর্নীতিপরায়ণ না করিয়া ন্যায়ের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করে। পূর্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তোমরা হয়তো বলিবে, উহা ভগবানের ইচ্ছা। কিন্তু ইহা আদৌ সদুত্তর নয়। ইহা অবৈজ্ঞানিক। প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ থাকে। একমাত্র ঈশ্বরকেই সকল কার্য-কারণের বিধাতা বলিলে তিনি এক ভীষণ দুর্নীতিশীল ব্যক্তি হইয়া দাঁড়ান। কিন্তু জড়বাদও পূর্বোক্ত মতবাদেরই মতো অযৌক্তিক। আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার এলাকায় সর্বত্রই কার্য-কারণ-ভাব ওতপ্রোত। অতএব এই দিক দিয়া আত্মার জন্মান্তরবাদ প্রয়োজনীয়। আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। ইহা কি আমাদের প্রথম জন্ম? সৃষ্টি মানে কি শূন্য হইতে কোন কিছুর উৎপত্তি? ভাল করিয়া বিশ্লেষণ করিলে ইহা অসম্ভব মনে হয়। অতএব বলা উচিত, সৃষ্টি নয়—বিকাশ।

অবিদ্যমান কারণ হইতে কোন কার্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। আমি যদি আগুনে আঙুল দিই, সঙ্গে সঙ্গে উহার ফল ফলিবে—আঙুল পুড়িয়া যাইবে। আমি জানি আগুনের সহিত আঙুলের সংস্পর্শ-ক্রিয়াই হইল দাহের কারণ। এইরূপে বিশ্বপ্রকৃতি ছিল না—এমন কোন সময় থাকা অসম্ভব, কেন-না প্রকৃতির কারণ সর্বদাই বর্তমান। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার কর যে, এমন এক সময় ছিল, যখন কোন প্রকার অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে প্রশ্ন ওঠে—এই-সব বিপুল জড়-সমষ্টি কোথায় ছিল? সম্পূর্ণ নূতন কিছু সৃষ্টি করিতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রচণ্ড অতিরিক্ত শক্তির প্রয়োজন হইবে। ইহা অসম্ভব। পুরাতন বস্তু নূতন করিয়া গড়া চলে, কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নূতন কিছু আমদানী করা চলে না।

ইহা ঠিক যে, পুনর্জন্মবাদ গণিত দিয়া প্রমাণ করা চলে না। ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে অনুমান ও মতবাদের বলবত্তা প্রত্যক্ষের মতো নাই সত্য, তবে আমার বক্তব্য এই যে, জীবনের ঘটনাসমূহকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য মানুষের বুদ্ধি অপেক্ষা প্রশস্ততর অন্য কোন মতবাদ আর উপস্থাপিত করিতে পারে নাই।

মিনিয়াপলিস শহর হইতে ট্রেনে আসিবার সময় আমার একটি বিশেষ ঘটনার কথা মনে পড়িতেছে। গাড়িতে জনৈক গো-পালক ছিল। লোকটি একটু রুক্ষপ্রকৃতি এবং ধর্মবিশ্বাসে গোঁড়া প্রেসবিটেরিয়ান। সে আমার কাছে আগাইয়া আসিয়া জানিতে চাহিল, আমি কোথাকার লোক। আমি বলিলাম, ভারতবর্ষের। তখন সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার ধর্ম কি?' আমি বলিলাম, হিন্দু। সে বলিল, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। আমি তাহাকে পুনর্জন্মবাদের কথা বলিলাম। শুনিয়া সে বলিল: সে বরাবরই এই মতবাদে বিশ্বাসী, কেন-না একদিন সে যখন কাঠ কাটিতেছিল, তখন তাহার ছোট বোনটি তাহার (গো-পালকের) পোশাক পরিয়া তাহাকে বলে যে, সে আগে পুরুষ-মানুষ ছিল। এই জন্যই সে আত্মার শরীরান্তর, প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে। এই মতবাদের মূল সূত্রটি এই: মানুষ যদি ভাল কাজ করে, তাহা হইলে তাহার উচ্চতর জন্ম হইবে। আর মন্দ কাজ করিলে নিকৃষ্ট গতি হয়।

এই মতবাদের আর একটি চমৎকার দিক আছে—ইহা শুভ প্রবৃত্তির প্ররোচক। একটি কাজ যখন করা হইয়া যায়, তখন তো আর উহাকে ফিরানো যায় না। এই মত বলে, আহা, যদি ঐ কাজটি আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতে! যাহা হউক, আগুনে আর হাত দিও না। প্রত্যেক মুহূর্তে নূতন সুযোগ আসিতেছে। উহাকে কাজে লাগাও।

বিবেকানন্দ এইভাবে কিছু কাল বলিয়া চলেন। শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দিয়া প্রশংসাধ্বনি করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ পুনরায় আজ বিকাল ৪টায় লা স্যালেট অ্যাকাডেমীতে 'ভারতীয় আচার-ব্যবহার' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবেন।

তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব

মেমফিস শহরে ১৮৯৪ খৃঃ ২১শে জানুআরি প্রদত্ত ; 'অ্যাপীল অ্যাভালাঞ্চ' পত্রিকায় প্রকাশিত।

স্বামী ভিভি কানন্দ গত রাত্রে 'ইয়ং মেন্স্ হিব্রু অ্যাসোসিয়েশন হল'-এ 'তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিয়াছেন। এখানে তিনি যতগুলি ভাষণ দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট। এই পণ্ডিত ভদ্রমহোদয়ের প্রতি এই শহরের অধিবাসিবৃন্দের শ্রদ্ধা এই বক্তৃতাটি দ্বারা নিঃসন্দেহে অনেক বাড়িয়াছে। এ পর্যন্ত ভিভি কানন্দ কোন না কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উপকারের জন্য বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ-সকল প্রতিষ্ঠান যে তাঁহার নিকট আর্থিক ,সহায়তা পাইয়াছে, তাহাও ঠিক। গত রাত্রের বক্তৃতার দর্শনী কিন্তু তাঁহার নিজের কাজের জন্য। এই বক্তৃতাটির পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থা করেন ভিভি কানন্দের বিশিষ্ট বন্ধু ও ভক্ত মিঃ হিউ এল. ব্রিঙ্কলী। এই প্রাচ্যদেশীয় মনীষীর শেষ বক্তৃতা শুনিতে গত রাত্রিতে প্রায় দুইশত শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল।

বক্তা তাঁহার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে প্রথমে এই প্রশ্নটি তুলেন : ধর্মের নানা মতবাদ সত্ত্বেও ধর্মে ধর্মে কি বাস্তবিকই খুব পার্থক্য আছে? বক্তার মতে : না, বর্তমান যুগে বিশেষ পার্থক্য আর নাই। তিনি সকল ধর্মের ক্রমবিকাশ আদিম কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া দেখান যে, আদিম মানুষ অবশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে নানা প্রকারের ধারণা পোষণ করিত, কিন্তু মানুষের নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর-ধারণার এই-সকল বিভিন্নতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে এবং অবশেষে উহা একেবারেই মিলাইয়া যায়। বর্তমানে শুধু একটি মত সর্বত্র প্রবল—ঈশ্বরের নির্বিশেষ অস্তিত্ব।

বক্তা বলেন : এমন কোন বর্বর জাতি নাই, যাহারা কোন না কোন দেবতায় বিশ্বাস না করে। উহাদের মধ্যে প্রেমের ভাব খুব বলবান্ নয়, বরং উহারা জীবন যাপন করে ভয়ের পটভূমিতে। তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন কল্পনায় একটি ঘোর বিদ্বেষপরায়ণ 'দেবতা' খাড়া হয়। এই 'দেবতা'র ভয়ে তাহারা

সর্বদাই কম্পমান। তাহার নিজের যাহা ভাল লাগে, ঐ দেবতারও তাহা ভাল লাগিবে, সে ধরিয়া লয়। সে নিজে যাহা পাইয়া সুখী হয়, সে ভাবে—উহা দেবতারও ক্রোধ শান্ত করিবে। স্বজাতীয়ের বিরুদ্ধতা করিয়াও সে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চেষ্টা করে।

বক্তা ঐতিহাসিক তথ্য দ্বারা প্রমাণ করেন: অসভ্য মানুষ পিতৃপুরুষের পূজা হইতে হাতিদের পূজায় পৌঁছায় এবং পরে বজ্র এবং ঝড়ের দেবতা প্রভৃতি নানা দেবতার উপাসনায়। এই অবস্থায় মানুষের ধর্ম ছিল বহুদেববাদ। বিবেকানন্দ বলেন: 'সূর্যোদয়ের সৌন্দর্য, সূর্যাস্তের চমৎকারিতা, নক্ষত্রখচিত আকাশের রহস্যময় দৃশ্য এবং বজ্র ও বিদ্যুতের অদ্ভুত অলৌকিকতা আদিম মানুষের মনে এমন একটি গভীর আবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহা সে ব্যাখ্যা করিতে পারে নাই। ফলে চোখের সম্মুখে উপস্থিত প্রকৃতির এই-সব বিশাল ঘটনার নিয়ামক একজন উচ্চতর এবং মহাশক্তিমান্ কেহ আছেন—এই ধারণাই তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছিল।'

ইহার পর আসিল আর একটি পর্যায়—একেশ্বরবাদের কাল। বিভিন্ন দেবতারা অদৃশ্য হইয়া একটি মাত্র সত্তায় মিশিয়া গেলেন—দেবতার দেবতা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরে। ইহার পর বক্তা আর্যজাতিকে এই পর্যায় পর্যন্ত অনুসরণ করিলেন। এই পর্যায়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কথা হইল—'আমরা ঈশ্বরের সত্তায় বাঁচিয়া আছি, তাঁহারই মধ্যে চলিতেছি, ফিরিতেছি। তিনিই গতিস্বরূপ।' ইহার পর আর একটি কাল আসিল দর্শনশাস্ত্রে, যাহাকে সর্বেশ্বরবাদের কাল বলা হয়। আর্যজাতি বহুদেবতাবাদ, একেশ্বরবাদ এবং বিশ্বজগৎই ঈশ্বর—সর্বেশ্বরবাদের এই মতও প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 'আমার অন্তরাত্মাই একমাত্র সত্য। আমার প্রকৃতি হইল সত্তাস্বরূপ, যত কিছু বিস্তৃতি, তাহা আমাতেই।'

বিবেকানন্দ অতঃপর বৌদ্ধধর্মের প্রসঙ্গে আসেন। তিনি বলেন যে, বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নাই, অস্বীকারও করে নাই। উপদেশ প্রার্থনা করিলে বুদ্ধ শুধু বলিতেন, 'দুঃখ তো দেখিতে পাইতেছ; বরং উহা হ্রাস করিবার চেষ্টা কর।' বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর কাছে দুঃখ সর্বদাই বিদ্যমান।

বক্তা বলেন, মুসলমানরা হিব্রুদের 'প্রাচীন সমাচার' এবং খ্রীষ্টানদের 'নূতন সমাচার' বিশ্বাস করেন। তাঁহারা খ্রীষ্টানদের পছন্দ করেন না, কেন-না তাঁহাদের

মতে খ্রীষ্টানরা প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধিতা করে এবং মানুষ-পূজা শিক্ষা দেয়। মহম্মদ তাঁহার মতানুবর্তীদের তাঁহার নিজের একখানি ছবিও রাখিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

বক্তা বলেন: এখন এই প্রশ্ন উঠে যে, এই-সকল বিভিন্ন ধর্মের সবগুলিই কি সত্য, না কতকগুলি খাঁটি, আর বাকীগুলি ভুয়া? সব ধর্মই একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছে—একটি চরম অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব। ধর্মের লক্ষ্য হইল একত্ব। আমরা যে চারি পাশে ঘটনারাশির বৈচিত্র্য দেখি, উহারা একত্বেরই অনন্ত অভিব্যক্তি। ধর্মসমূহকে যদি তলাইয়া বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, মানুষের অভিযান—মিথ্যা হইতে সত্যে নয়, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে।

ধরুন জনৈক ব্যক্তি একটি মাত্র মাপের জামা লইয়া অনেকগুলি লোকের কাছে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। কেহ কেহ বলিল, ঐ জামা তাহাদের গায়ে লাগিবে না। তখন লোকটি উত্তর করিল, তাহা হইলে তোমরা বিদায় হও, তোমাদের জামা পরিয়া কাজ নাই। কোন পাদরীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, যে-সব (খ্রীষ্টান) সম্প্রদায় তাঁহার মতবাদ ও বিশ্বাসগুলি মানে না, তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে? তিনি উত্তর দিবেন, 'ওঃ, উহারা খ্রীষ্টানই নয়।' কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভাল উপদেশও সম্ভব। আমাদের নিজেদের প্রকৃতি, পরস্পরের প্রতি প্রেম এবং বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ—এইগুলি আমাদিগকে প্রশস্ততর শিক্ষা দেয়। নদীর বুকে যে জলস্রোতের আবর্ত, ঐগুলি যেমন নদীর প্রাণের পরিচায়ক, ঐগুলি না থাকিলে নদী যেমন মরিয়া যায়, সেইরূপ ধর্মকে বেড়িয়া নানা বিশ্বাস ও মত ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তিরই ইঙ্গিত। এই মত-বৈচিত্র্য যদি ঘুচিয়া যায়, তাহা হইলে ধর্মচিন্তারও মরণ ঘটিবে। গতি আবশ্যক। চিন্তা হইল মনের গতি, এই গতি থামিয়া যাওয়া মৃত্যুর সূচনা।

একটি বুদ্বুদকে যদি এক গ্লাস জলের তলদেশে আটকাইয়া রাখো, উহা তৎক্ষণাৎ উপরের অনন্ত বায়ুমণ্ডলে যোগ দিবার জন্য আন্দোলন শুরু করিবে। জীবাত্মা সম্বন্ধে এই একই কথা। উহা ভৌতিক দেহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে এবং নিজের শুদ্ধ স্বভাব ফিরিয়া পাইতে অনবরত চেষ্টা করিতেছে। উহার আকাঙ্ক্ষা হইল স্বকীয় বাধাহীন অনন্ত বিস্তার পুনরায় লাভ করা। আত্মার এই প্রচেষ্টা সর্বত্রই সমান। খ্রীষ্টান বলো, বৌদ্ধ ও মুসলমান বলো, অথবা

সংশয়বাদী কিংবা ধর্মযাজকই বলো, প্রত্যেকের মধ্যে জীবাত্মা এই মুক্তির প্রয়াসে তৎপর। মনে কর, একটি নদী হাজার মাইল আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ কত কষ্টে অতিক্রম করিয়া অবশেষে সমুদ্রে পড়িয়াছে, আর একজন মানুষ ঐ সঙ্গমস্থলে দাঁড়াইয়া নদীকে আদেশ করিতেছে: হে নদী, তোমার উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া যাও এবং নূতন একটি সিদা রাস্তা ধরিয়া সাগরে এস। এই মানুষটি কি নির্বোধ নয়? ইহুদী তুমি, তুমি হইলে জাইয়ন (Zion) শৈল হইতে নিঃসৃত একটি নদী। কিন্তু আমি, আমি নামিয়া আসিতেছি উত্তুঙ্গ হিমালয়-শৃঙ্গ হইতে। আমি তোমাকে বলিতে পারি না—যাও, তুমি ফিরিয়া যাও, তুমি ভুল পথ ধরিয়াছ। আমার পথে পুনরায় বহিয়া এস। এইরূপ উক্তি বোকামি ছাড়া বিষম ভুলও। নিজের বিশ্বাস আঁকাড়াইয়া থাকো। সত্য কখনও বিলুপ্ত হয় না। পুঁথিপত্র নষ্ট হইতে পারে, জাতিসমূহও সংঘর্ষে নিশ্চিহ্ন হইতে পারে, কিন্তু সত্য বাঁচিয়া থাকে। পরে কোন মানুষ আসিয়া উহাকে আবিষ্কার করে এবং উহা সমাজে পুনঃ প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, ভগবান্ কী চমৎকার রীতিতে তাঁহার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান অনবরত মানুষের কাছে অভিব্যক্ত করিতেছেন!

'এশিয়ার আলোক'—বুদ্ধদেবের ধর্ম

ডেট্রয়েট শহরে ১৮৯৪ খৃঃ ১৯শে মার্চ প্রদত্ত; 'ডেট্রয়েট ট্রিবিউন' পত্রিকায় প্রকাশিত।

গতরাত্রে অডিটোরিয়ামে বিবেকানন্দ ১৫০ জন শ্রোতার নিকট 'এশিয়ার আলোক—বুদ্ধদেবের ধর্ম' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মাননীয় ডন এম. ডিকিনসন সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বক্তার পরিচয়-প্রসঙ্গে বলেন—কে বলিতে পারে যে, এই ধর্মমতটি ঈশ্বরাদিষ্ট, আর অন্যটি নিকৃষ্ট? অতীন্দ্রিয়তার বিভাগ-রেখা কে টানিতে পারে?

বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্মগুলির বিশদ পর্যালোচনা করেন। তিনি যজ্ঞবেদিতে বহুল প্রাণিবধের কথা বলিয়া বুদ্ধের জন্ম এবং জীবন-কাহিনী বর্ণনা করেন। সৃষ্টির কারণ এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বুদ্ধের মনে যে দুরূহ সমস্যাগুলি উঠিয়াছিল, ঐগুলির সমাধানের জন্য তিনি যে তীব্র সাধনা করিয়া—

ছিলেন এবং পরিশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, এ-সকল বিষয় বক্তা উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, বুদ্ধ অপর সকল মানুষের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁহার সম্বন্ধে কি মিত্র, কি শত্রু—কেহ কখনও বলিতে পারে না যে, তিনি সকলের হিতের জন্য ছাড়া একটিও নিঃশ্বাস লইয়াছেন বা এক টুকরা রুটি খাইয়াছেন।

কানন্দ বলেন, আত্মার জন্মান্তরগ্রহণ বুদ্ধ কখনও প্রচার করেন নাই। তবে তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমুদ্রে যেমন একটি ঢেউ উঠিয়া মিলাইয়া যাইবার সময় পরবর্তী ঢেউটিতে তাহার শক্তি সংক্রামিত করিয়া যায়, সেইরূপ একটি আত্মা তাহার ভবিষ্যৎ আত্মায় নিজের শক্তি রাখিয়া যায়। বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনও প্রচার করেন নাই ; আবার ঈশ্বর যে নাই, তাহাও বলেন নাই।

তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমরা সৎ হইব কেন?' বুদ্ধ উত্তর দিলেন, 'কারণ তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে সদ্‌ভাব পাইয়াছ। তোমাদেরও উচিত পরবর্তীদের জন্য কিছু সদ্‌ভাব রাখিয়া যাওয়া।' সংসারে সমষ্টীকৃত সাধুতার সম্প্রসারের জন্যই আমাদের প্রত্যেকের সাধু আচরণ বিধেয়।

বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কাহারও নিন্দা করেন নাই, নিজের জন্য কিছু দাবি করেন নাই। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদিগকে মুক্তিলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। মৃত্যুশয্যায় তিনি বলিয়াছিলেন, 'আমি বা অপর কেহই তোমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না। কাহারও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।'

মানুষে মানুষে এবং মানুষে ও ইতরপ্রাণীতে অসাম্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, সকল প্রাণীই সমান। তিনিই প্রথম মদ্যপান বন্ধ করার নীতি উপস্থাপিত করেন। তাঁহার শিক্ষা : সৎ হও, সৎ কাজ কর। যদি ঈশ্বর থাকেন, সাধুতার দ্বারা তাঁহাকে লাভ কর। যদি ঈশ্বর নাও থাকেন, তবুও সাধুতাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষের যাবতীয় দুঃখের জন্য সে নিজেই দায়ী। তাহার সমুদয় সদাচরণের জন্য প্রশংসাও তাহারই প্রাপ্য।

বুদ্ধই প্রথম ধর্মপ্রচারকদলের উদ্ভাবক। ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদিগের পরিত্রাতারূপে তাঁহার আবির্ভাব। উহারা তাঁহার দার্শনিক মত বুঝিতে

পারিত না, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শুনিয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিত।

উপসংহারে কানন্দ বলেন যে, বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টধর্মের ভিত্তি। ক্যাথলিক সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্ম হইতেই উদ্ভূত।

মানুষের দেবত্ব

'এডা রেকর্ড', ২৮শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৪

গত শুক্রবার (২২শে ফেব্রুআরি) অপেরা হাউস-এ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের 'মানুষের দেবত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে ঘর-ভরতি শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল। বক্তা বলেন, সকল ধর্মের মূল ভিত্তি হইল মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মাতে বিশ্বাস—যে আত্মা জড়পদার্থ ও মন দুয়েরই অতিরিক্ত কিছু। জড়বস্তুর অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে। মনও পরিবর্তনশীল, বলিয়া অনিত্য। মৃত্যু তো একটি পরিবর্তন মাত্র।

আত্মা মনকে যন্ত্রস্বরূপ করিয়া শরীরকে চালিত করে। মানবাত্মা যাহাতে শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়, এই চেষ্টা করা কর্তব্য। মানুষের স্বরূপ হইল নির্মল ও পবিত্র, কিন্তু অজ্ঞান আসিয়া মেঘের মতো উহাকে যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ভারতীয় ধর্মের দৃষ্টিতে প্রত্যেক আত্মাই তাহার প্রকৃত শুদ্ধ স্বরূপ ফিরিয়া পাইতে চেষ্টা করিতেছে, ভারতবাসী আত্মার স্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী। আমাদের ধর্মই একমাত্র সত্য, ইহা আমাদের প্রচার করা নিষিদ্ধ।

বক্তা বলেন, 'আমি হইলাম চৈতন্যস্বরূপ, জড় নই। প্রতীচ্যের ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ মৃত্যুর পরও আবার স্থূল শরীরে বাস করিবার আশা পোষণ করে। আমাদের ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, এইরূপ কোন অবস্থা থাকিতে পারে না। আমরা 'পরিত্রাণে'র বদলে আত্মার মুক্তির কথা বলি।'

মূল বক্তৃতাটিতে মাত্র ৩০ মিনিট লাগিয়াছিল, তবে বক্তৃতার ব্যবস্থাপক সমিতির অধ্যক্ষ ঘোষণা করেন, বক্তৃতার শেষে কেহ প্রশ্ন করিলে বক্তা উহার উত্তর দিতে প্রস্তুত আছেন। এই সুযোগ অনেকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে যেমন ছিলেন ধর্মযাজক, অধ্যাপক, ডাক্তার ও দার্শনিক, তেমনি ছিলেন সাধারণ নাগরিক, ছাত্র, সৎলোক আবার

তুষ্ট লোক। অনেকে লিখিয়া তাঁহাদের প্রশ্ন উপস্থাপিত করেন। অনেকে আবার তাঁহাদের আসন হইতে উঠিয়া বক্তাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেন। বক্তা সকলকেই সৌজন্যের সহিত উত্তর দেন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশ্নকর্তাকে খুব হাসাইয়া তুলেন। এক ঘণ্টা এইরূপ চলিবার পর বক্তা আলোচনা-সমাপ্তির অনুরোধ জানান। তখনও বহু লিখিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাকী। বক্তা অনেকগুলির জবাব কৌশলে এড়াইয়া যান। যাহা হউক তাঁহার আলোচনা হইতে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস ও শিক্ষাসমূহ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত আরও কয়েকটি কথা আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম:

হিন্দুরা মানুষের পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাহাদের ভগবান্ কৃষ্ণ উত্তর ভারতে পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে এক শুদ্ধভাবা নারীর[১] গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। কৃষ্ণের কাহিনী বাইবেলে কথিত খ্রীষ্টের জীবনেতিহাসের অনুরূপ, তবে কৃষ্ণ নিহত হন একটি আকস্মিক দুর্ঘটনায়। হিন্দুরা মানবাত্মার প্রগতি এবং দেহান্তর-প্রাপ্তি স্বীকার করেন। আমাদের আত্মা পূর্বে পাখি, মাছ বা অপর কোন ইতরপ্রাণীর দেহে আশ্রিত ছিল, মরণের পরে আবার অন্য কোন প্রাণী হইয়া জন্মাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করেন, এই পৃথিবীতে আসিবার আগে এই-সব আত্মা কোথায় ছিল। বক্তা বলেন, অন্যান্য লোকে। আত্মা সকল অস্তিত্বের অপরিবর্তনীয় আধার। এমন কোনও কাল নাই, যখন ঈশ্বর ছিলেন না এবং সেইজন্য এমন কোনও কাল নাই যখন সৃষ্টি ছিল না। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা ব্যক্তি-ভগবান্ স্বীকার করেন না। বক্তা বলেন, তিনি বৌদ্ধ নন। খ্রীষ্টকে যেভাবে পূজা করা হয়, মহম্মদকে সেইভাবে করা হয় না। মহম্মদ খ্রীষ্টকে মানিতেন, তবে খ্রীষ্ট যে ঈশ্বর—ইহা অস্বীকার করিতেন। পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব ক্রমবিকাশের ফলে ঘটিয়াছে, বিশেষ নির্বাচন (নূতন সৃষ্টি) দ্বারা নয়। ঈশ্বর হইলেন স্রষ্টা, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহার সৃষ্টি। হিন্দুধর্মে 'প্রার্থনা'র রীতি নাই—এক শিশুদের জন্য ছাড়া এবং তাহাও শুধু মনের উন্নতির উদ্দেশ্যে। পাপের সাজা অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি ঘটিয়া থাকে। আমরা যে-সব কাজ করি, তাহা আত্মার নয়, অতএব কাজের ভিতর মলিনতা ঢুকিতে পারে। আত্মা পূর্ণস্বরূপ, শুদ্ধস্বরূপ। উহার কোন বিশ্রাম-

---

[১] ইংরেজী রিপোর্টে 'Virgin' শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্থানের প্রয়োজন হয় না। জড়পদার্থের কোনও ধর্ম আত্মাতে নাই। মানুষ যখন নিজেকে চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া জানিতে পারে, তখনই সে পূর্ণাবস্থা লাভ করে। ধর্ম হইল আত্মস্বরূপের অভিব্যক্তি। যে যত আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত, সে তত সাধু। ভগবানের শুদ্ধসত্তার অনুভবের নামই উপাসনা। হিন্দুধর্ম বহিঃপ্রচারে বিশ্বাস করে না। উহার শিক্ষা এই যে—মানুষ যেন ভগবান্‌কে ভালবাসার জন্যই ভালবাসে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদয় আচরণের সময় নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়। পাশ্চাত্যের লোক অতিরিক্ত কর্মপ্রবণ। বিশ্রামও সভ্যতার একটি অঙ্গ। হিন্দুরা নিজেদের দুর্বলতা-গুলি ঈশ্বরের উপর চাপায় না। সকল ধর্মের পারস্পরিক মিলনের একটি প্রবণতা এখন দেখা যাইতেছে।

হিন্দু সন্ন্যাসী

'বে সিটি টাইম্‌স্', ২১শে মার্চ, ১৮৯৪

গতকল্য সন্ধ্যায় অপেরা হাউস-এ স্বামী বিবেকানন্দ যে চিত্তাকর্ষক ভাষণটি দিয়াছেন, ঐরূপ বক্তৃতা শুনিবার সুযোগ এই শহরের (বে সিটি) লোক কদাচিৎ পাইয়া থাকে। বক্তা ভদ্রলোক, ভারতবর্ষের অধিবাসী। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ডক্টর সি. টি. নিউকার্ক যখন শ্রোতৃবৃন্দের নিকট বক্তার পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন, তখন অপেরা হাউসের নীচের তলায় প্রায় অর্ধেকটা ভরিয়া গিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে বক্তা এই দেশের লোককে সর্বশক্তিমান্ ডলারের ভজনা করিবার জন্য সমালোচনা করেন। ভারতে জাতিভেদ আছে সত্য, কিন্তু খুনী লোক কখনও সমাজের শীর্ষস্থানে যাইতে পারে না। কিন্তু এদেশে যদি সে দশলক্ষ ডলারের মালিক হয়, তাহা হইলে সে অপর যে-কোন ব্যক্তিরও সমান। ভারতে একবার যদি কেহ গুরুতর অপরাধ করিয়া বসে, তাহা হইলে বরাবর সে হীন থাকিয়া যায়। হিন্দুধর্মের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হইল—অন্যান্য ধর্ম ও বিশ্বাসসমূহের প্রতি সহিষ্ণুতা। অন্যান্য প্রাচ্য দেশের ধর্ম অপেক্ষা ভারতবর্ষের ধর্মের উপরই মিশনরীদের আক্রোশ বেশী, কেন-না হিন্দুরা তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে বাধা দেয় না। এখানে হিন্দুরা

তাহাদের ধর্মের যাহা একটি প্রধান শিক্ষা—সহিষ্ণুতা, উহাই প্রতিপালন করিতেছে, বলিতে পারা যায়। কানন্দ একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং মার্জিতরুচি ভদ্রলোক। আমরা শুনিয়াছি ডেট্রয়েট-এ কানন্দকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল : হিন্দুরা নদীতে তাহাদের শিশুসন্তান নিক্ষেপ করে কি না? কানন্দ উত্তর দেন : না, তাহারা ঐরূপ করে না, পাশ্চাত্যদেশের মতো ডাইনী সন্দেহ করিয়া স্ত্রীলোকদেরও তাহারা দাহ করে না। বক্তা আজ রাত্রে স্যাগিন শহরে বক্তৃতা করিবেন।

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বামী বিবে কানন্দ

'বে সিটি ডেলী ট্রিবিউন', ২১শে মার্চ, ১৮৯৪

বে সিটিতে গতকল্য একজন খ্যাতনামা অতিথি আসিয়াছেন। ইনি হইলেন সেই বহু-আলোচিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবে কানন্দ। তিনি ডেট্রয়েট হইতে এখানে দ্বিপ্রহরে পৌছিয়া তখনই ফ্রেজার হাউসে চলিয়া যান। ডেট্রয়েটে তিনি সেনেটর পামারের অতিথি ছিলেন। আমাদের পত্রিকার জনৈক প্রতিনিধি কালই ফ্রেজার হাউস-এ কানন্দের সহিত দেখা করেন। তাঁহার চেহারা সহজেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রায় ছয় ফুট উঁচু, ওজন বোধকরি ১৮০ পাউণ্ড, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনে আশ্চর্য-রকম সামঞ্জস্য। তাঁহার গায়ের রং উজ্জ্বল অলিভবর্ণ, কেশ এবং চোখ সুন্দর কালো। মুখ পরিষ্কার কামানো। সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বর খুব মিষ্ট এবং সুনিয়মিত। তিনি চমৎকার ইংরেজী বলেন, বস্তুতঃ অধিকাংশ আমেরিকানদের চেয়ে ভাল বলেন। তাঁহার ভদ্রতাও বেশ উল্লেখযোগ্য।

কানন্দ তাঁহার স্বদেশের কথা—তথা তাঁহার নিজের আমেরিকার অভিজ্ঞতা কৌতুকের সহিত বর্ণনা করেন। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর হইয়া আমেরিকায় আসিয়াছেন, ফিরিবেন অ্যাটলান্টিকের পথে। বক্তা বলিলেন, 'আমেরিকা একটি বিরাট দেশ, তবে আমি এখানে বরাবর থাকিতে চাই না। আমেরিকানরা অত্যধিক অর্থচিন্তা করে, অন্য সব কিছুর আগে ইহার স্থান। তোমাদের এখনও অনেক কিছু শিখিতে হইবে। তোমাদের জাতি

যখন আমাদের জাতির ন্যায় প্রাচীন হইবে, তখন তোমাদের বিজ্ঞতা বাড়িবে। চিকাগো আমার খুব ভাল লাগে। ডেট্রয়েট জায়গাটিও সুন্দর।'

আমেরিকায় কতদিন থাকিবেন, জিজ্ঞাসা করিলে কানন্দ বলেন, 'তাহা আমি জানি না। তোমাদের দেশের অধিকাংশই আমি দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছি। ইহার পর আমি পূর্বাঞ্চলে যাইব এবং বস্টন ও নিউ ইয়র্কে কিছু-কাল থাকিব। বস্টনে আমি গিয়াছি, তবে থাকা হয় নাই। আমেরিকা দেখা হইলে ইওরোপে যাইব। ইওরোপ দেখিবার আমার খুব ইচ্ছা। ওখানে কখনও যাই নাই।'

নিজের সম্বন্ধে এই প্রাচ্য সন্ন্যাসী বলেন, তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর। তিনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ওখানকারই একটি কলেজে শিক্ষা-লাভ করেন। সন্ন্যাসী বলিয়া দেশের সর্বত্রই তাঁহাকে ভ্রমণ করিতে হয়। সব সময়েই তিনি সমগ্র জাতির অতিথি।

ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ২৮॥ কোটি, তন্মধ্যে ৬॥ কোটি হইল মুসলমান, বাকী অধিকাংশ হিন্দু। ভারতে ৬ লক্ষ খ্রীষ্টান আছে, তাহার ভিতর অন্ততঃ ২॥ লক্ষ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। আমাদের দেশের লোক সচরাচর খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করে না। নিজেদের ধর্মেই তাহারা পরিতৃপ্ত। তবে কেহ কেহ আর্থিক সুবিধার জন্য খ্রীষ্টান হয়। মোটকথা ধর্ম সম্বন্ধে মানুষের খুব স্বাধীনতা আছে। আমরা বলি, যাহার যে-ধর্মে অভিরুচি, সে তাহাই গ্রহণ করুক। আমরা চতুর জাতি। রক্তপাতে আমাদের আস্থা নাই। আমাদের দেশে দুষ্ট লোক আছে বই কি, বরং তাহারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, যেমন তোমাদের দেশে। জনসাধারণ দেবদূত হইয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যুক্তিযুক্ত নয়। বিবে কানন্দ আজ রাত্রে স্যাগিনে বক্তৃতা করিবেন।

গতরাত্রের বক্তৃতা

গত সন্ধ্যায় বক্তৃতা আরম্ভের সময় অপেরা হাউসের নীচের তলা প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল। ঠিক ৮।১৫ মিনিটে বিবে কানন্দ তাঁহার সুন্দর প্রাচ্য পরিচ্ছদে বক্তৃতা-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ডক্টর সি. টি. নিউকার্ক কিছু বলিয়া বক্তার পরিচয় দিলেন।

আলোচনার প্রথমাংশ ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্ম সম্বন্ধে ও জন্মান্তর-বাদের ব্যাখ্যামূলক। দ্বিতীয় বিষয়টির প্রসঙ্গে বক্তা বলেন, বিজ্ঞান-জগতে শক্তি-সাতত্য-বাদের যাহা বনিয়াদ, জন্মান্তরবাদেরও তাহাই। শক্তি-সাতত্যবাদ প্রথম উপস্থাপিত করেন ভারতবর্ষেরই একজন দার্শনিক। ইঁহারা আগন্তুক সৃষ্টিতে বিশ্বাস করিতেন না। 'সৃষ্টি' বলিতে শূন্য হইতে কোন কিছু উৎপন্ন করা বুঝায়। ইহা যুক্তির দিক দিয়া অসম্ভব। কালের যেমন আদি নাই, সৃষ্টিরও সেইরূপ কোন আদি নাই। ঈশ্বর ও সৃষ্টি যেন আদ্যন্তহীন দুইটি সমান্তরাল রেখা। এই দার্শনিক মত অনুসারে 'সৃষ্টিপ্রপঞ্চ ছিল, আছে এবং থাকিবে।' হিন্দু দর্শনের মতে আমরা যাহাকে 'শাস্তি' বলি—উহা কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া মাত্র। আমরা যদি আগুনে হাত দিই, হাত পুড়িয়া যায়। উহা একটি ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া। জীবনের ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্তমান অবস্থা দ্বারা নিরূপিত হয়। হিন্দুরা ঈশ্বরকে শাস্তিদাতা বলিয়া মনে করে না। বক্তা বলেন, 'তোমরা এইদেশে—যে রাগ করে না, তাহার প্রশংসা কর এবং যে রাগ করে, তাহার নিন্দা করিয়া থাকো। তবুও দেশ জুড়িয়া হাজার হাজার লোক ভগবান্‌কে অভিযুক্ত করিতেছ—তিনি কুপিত হইয়াছেন বলিয়া। রোমনগরী যখন অগ্নিদগ্ধ হইতেছিল, তখন সম্রাট্ নীরো তাঁহার বেহালা বাজাইতেছিলেন বলিয়া সকলেই তাঁহাকে নিন্দা করিয়া আসিতেছে। ঈশ্বরের অনুরূপ আচরণের জন্য তোমাদের মধ্যে হাজার হাজার ব্যক্তি তাঁহাকেও দোষ দিতেছ।'

হিন্দুধর্মে খ্রীষ্টধর্মের মতো 'অবতারের মাধ্যমে পরিত্রাণ'—এইরূপ মত নাই। হিন্দুদের দৃষ্টিতে খ্রীষ্ট শুধু মুক্তির উপায়-প্রদর্শক। প্রত্যেক নর-নারীর মধ্যে দিব্যসত্তা রহিয়াছে, তবে উহা যেন একটি পর্দা দিয়া ঢাকা আছে। ধর্মের চেষ্টা হইল—ঐ আবরণকে দূর করা। এই আবরণ-অপসারণকে খ্রীষ্টানরা

বলেন 'পরিত্রাণ', হিন্দুরা বলেন 'মুক্তি'। ঈশ্বর বিশ্বসংসারের স্রষ্টা, পাতা এবং সংহর্তা।

বক্তা অতঃপর তাঁহার দেশের ধর্মসমূহের সমর্থনে কিছু আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের সমগ্র রীতিনীতি যে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে লওয়া হইয়াছে, ইহা সুপ্রমাণিত। পাশ্চাত্যের লোকদের এখন ভারতের নিকট একটি জিনিস শেখা উচিত—পরমত-সহিষ্ণুতা।

অন্যান্য যে-সকল বিষয় তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করেন, তাহা হইল—খ্রীষ্টান মিশনরী, প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের প্রচার-উৎসাহ তথা অসহিষ্ণুতা, এই দেশে ডলার-পূজা এবং ধর্মযাজক-সম্প্রদায়। বক্তা বলেন, শেষোক্ত ব্যক্তিরা ডলারের জন্যই তাঁহাদের কাজে ব্রতী আছেন। যদি তাঁহাদিগকে বেতনের জন্য ভগবানের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কতদিন গির্জার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন, তাহা বলা যায় না। তারপর বক্তা ভারতের জাতিপ্রথা, আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের সংস্কৃতি, মানব-মনের সাধারণ জ্ঞান এবং আরও কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার পর তাঁহার বক্তৃতার উপসংহার করেন।

ধর্মের সমন্বয়

'স্যাগিন ইভনিং নিউজ', ২২শে মার্চ, ১৮৯৪

গতকল্য সন্ধ্যায় সঙ্গীত অ্যাকাডেমিতে বহু-কথিত হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ 'ধর্মের সমন্বয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। শ্রোতার সংখ্যা বেশী না হইলেও প্রত্যেকেই প্রখর মনোযোগ সহকারে তাঁহার আলোচনা শুনিয়াছেন। বক্তা প্রাচ্য পোশাক পরিয়া আসিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হন। মাননীয় রোল্যাণ্ড কোনর অমায়িকভাবে বক্তার পরিচয় করাইয়া দেন। ভাষণের প্রথমাংশ বক্তা নিয়োগ করেন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম এবং জন্মান্তরবাদের ব্যাখ্যানে। ভারতের প্রথম বিজেতা আর্যগণ—খ্রীষ্টানরা যেমন নূতন দেশজয়ের পর করিয়া থাকে, সেইরূপ দেশের তৎকালীন অধিবাসীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছিলেন অমার্জিত সংস্কারের লোকগণকে সুসংস্কৃত করিতে।

ভারতবর্ষেও যাহারা স্নান করে না বা মৃত জন্তু ভক্ষণ করে, হিন্দুরা তাহাদের উপর বিরক্ত। উত্তরভারতের অধিবাসী আর্যেরা দক্ষিণাঞ্চলের অনার্যগণের উপর নিজেদের আচার ব্যবহার জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, তবে অনার্যেরা আর্যদের অনেক রীতিনীতি ধীরে ধীরে নিজেরাই গ্রহণ করে। ভারতের দক্ষিণতম প্রদেশে বহু শতাব্দী হইতে কিছু কিছু খ্রীষ্টান আছে। স্পেনিয়ার্ডরা সিংহলে খ্রীষ্টধর্ম লইয়া যায়। তাহারা মনে করিত যে, অখ্রীষ্টানদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মন্দিরসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক আদিষ্ট।

বিভিন্ন ধর্ম যদি না থাকিত, তাহা হইলে একটি ধর্মও বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না। খ্রীষ্টানদের নিজস্ব ধর্ম চাই। হিন্দুদেরও প্রয়োজন স্বকীয় ধর্মবিশ্বাস বজায় রাখা। যে-সব ধর্মের মূলে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহারা এখনও টিকিয়া আছে। খ্রীষ্টানরা ইহুদীগণকে খ্রীষ্টধর্মে আনিতে পারে না কেন? পারসীকদেরও খ্রীষ্টান করিতে পারে না কি কারণে? মুসলমানরাও খ্রীষ্টান হয় না কেন? চীন এবং জাপানে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব নাই কেন? বৌদ্ধধর্ম—যাহাকে প্রথম প্রচারশীল ধর্ম বলিতে পারা যায়—কখনও তরবারির সাহায্যে অপরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে নাই, তবুও ইহা খ্রীষ্টধর্ম অপেক্ষা দ্বিগুণ লোককে স্বমতে আনিয়াছে। মুসলমানরা সর্বাপেক্ষা বেশী বল প্রয়োগ করিলেও তিনটি বড় প্রচারশীল ধর্মের মধ্যে তাহাদের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা কম। মুসলমানদের বিজয়ের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী জাতিরা রক্তপাত করিয়া ভূমি দখল করিতেছে, এই খবর আমরা প্রত্যহই পড়ি। কোন্ প্রচারক ইহার প্রতিবাদ করিতেছেন? অত্যন্ত রক্ত-পিপাসু জাতিরা যে ধর্ম লইয়া এত জয়গান করে, তাহা তো খ্রীষ্টের ধর্ম নয়। ইহুদী ও আরবগণ খ্রীষ্টধর্মের জনক, কিন্তু ইহারা খ্রীষ্টানদের দ্বারা কতই না নির্যাতিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টধর্মের প্রচারকগণকে বেশ যাচাই করিয়া দেখা হইয়াছে, খ্রীষ্টের আদর্শ হইতে তাঁহারা অনেক দূরে।

বক্তা বলেন, তিনি রূঢ় হইতে চান না, তবে অপরের চোখে খ্রীষ্টানদের কিরূপ দেখায়, তাহাই তিনি উল্লেখ করিতেছেন; যে-সব মিশনরী নরকের জ্বলন্ত গহ্বরের কথা প্রচার করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সন্ত্রাসের সহিত দেখিয়া থাকে। মুসলমানরা ভারতে তরবারি-ঝনৎকারে আক্রমণের উপর আক্রমণ-

প্রবাহ চালাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু আজ তাহারা কোথায়? সব ধর্মই চূড়ান্ত দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পায়, তাহা হইল একটি চৈতন্যসত্তা। কোন ধর্মই ইহার পর আর কিছু শিক্ষা দিতে পারে না। প্রত্যেক ধর্মেই একটি মুখ্য সত্য আছে, আর কতকগুলি গৌণ ভাব উহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে। যেন একটি মণি—একটি পেটিকার মধ্যে রাখা আছে। মুখ্য সত্যটি হইল মণি, গৌণ ভাবগুলি পেটিকাস্বরূপ। ইহুদীর শাস্ত্রকে মানিলাম বা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থকে—ইহা গৌণ ব্যাপার।

পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে ধর্মের মূল সত্যের আধারটিও বদলায়, কিন্তু মূল সত্যটি অপরিবর্তিত রহিয়া যায়। প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের যাঁহারা শিক্ষিত ব্যক্তি, তাঁহারা ধর্মের মূল সত্যকে ধরিয়া থাকেন। শুক্তির বাহিরের খোলাটি দেখিতে সুন্দর নয়, তবে ঐ খোলার ভিতর তো মুক্তা রহিয়াছে। পৃথিবীর সমুদয় জনসংখ্যার একটি অল্প অংশ মাত্র খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিবার আগেই ঐ ধর্ম বহু মতবাদে বিভক্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপই প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবীর নানা ধর্ম লইয়া যে একটি মহান্ ঐকতান বাদ্য চলিতেছে, উহার মধ্যে শুধু একটি যন্ত্রকেই স্বীকার করিতে চাও কেন? সমগ্র বাদ্যটিকেই চলিতে দাও। বক্তা বিশেষ জোর দিয়া বলেন, পবিত্র হও, কুসংস্কার ছাড়িয়া দিয়া প্রকৃতির আশ্চর্য সমন্বয় দেখিবার চেষ্টা কর। কুসংস্কারই ধর্মকে ছাপাইয়া গোল বাধায়। সব ধর্মই ভাল, কেন-না মূল সত্য সর্বত্রই এক। প্রত্যেক মানুষ তাহার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ ব্যবহার করুক, কিন্তু ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, সকল পৃথক্ ব্যক্তিকে লইয়া একটি সুসমঞ্জস সমষ্টি গঠিত হয়। এই আশ্চর্য সামঞ্জস্যের অবস্থা ইতঃপূর্বেই রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ধর্মমত সম্পূর্ণ ধর্ম-সৌধটির গঠনে কিছু না কিছু যোগ করিয়াছে।

বক্তা তাঁহার ভাষণে বরাবর তাঁহার স্বদেশের ধর্মসমূহকে সমর্থন করিয়া যান। তিনি বলেন, রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের যাবতীয় রীতিনীতি যে বৌদ্ধদের গ্রন্থ হইতে গৃহীত, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। নৈতিকতার উচ্চমান এবং পবিত্র জীবনের যে আদর্শ বুদ্ধের উপদেশ হইতে পাওয়া যায়, বক্তা কিছুক্ষণ তাহার বর্ণনা করেন; তবে তিনি বলেন যে, ব্যক্তি-ঈশ্বরে বিশ্বাস-সম্পর্কে বৌদ্ধ-ধর্মে অজ্ঞেয়বাদই প্রবল। বুদ্ধের শিক্ষার প্রধান কথা হইল—'সৎ হও, নীতি-পরায়ণ হও, পূর্ণতা লাভ কর।'

সুদূর ভারতবর্ষ হইতে

'স্যাগিন কুরিআর হেরাল্ড', ২২শে মার্চ, ১৮৯৪

হিন্দুপ্রচারক কানন্দের স্যাগিনে আগমন ও অ্যাকাডেমিতে মনোজ্ঞ বাক্যালাপ।

গত সন্ধ্যায় হোটেল ভিন্‌সেণ্ট-এর লবিতে জনৈক বলিষ্ঠ সুঠাম ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। গায়ের শ্যামবর্ণের সহিত তাঁহার মুক্তা-ধবল দাঁত খুব উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। চওড়া এবং উঁচু কপালের নীচে তাঁহার চোখ দুটি তীক্ষ্ন বুদ্ধির পরিচয় দিতেছিল। এই ভদ্রলোকই হইলেন হিন্দুধর্মের প্রচারক স্বামী বিবে কানন্দ। মিঃ কানন্দ শুদ্ধ এবং ব্যাকরণ-সম্মত ইংরেজীতে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। তাঁহার উচ্চারণের ঈষৎ বিদেশী ঢঙটি বেশ চিত্তরঞ্জক। ডেট্রয়টের সংবাদপত্রসমূহ যাঁহারা পড়েন, তাঁহারা অবগত আছেন যে, মিঃ কানন্দ ঐ শহরে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং কেহ কেহ খ্রীষ্টানদের প্রতি তাঁহার কটাক্ষের জন্য তাঁহার উপর রুষ্টও হইয়াছিলেন। মিঃ কানন্দের কাল অ্যাকাডেমিতে বক্তৃতা দিতে যাইবার পূর্বে কুরিআর হেরাল্ড-এর প্রতিনিধি তাঁহার সহিত কয়েক মিনিট কথোপকথনের সুযোগ পান। মিঃ কানন্দ বলেন, আজকাল খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সত্য ও ন্যায়ের পথ হইতে কিরূপ বিচ্যুতি ঘটিতেছে, তাহা দেখিয়া তিনি অবাক হইয়াছেন; তবে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিতরই ভালমন্দ দুই-ই আছে। মিঃ কানন্দের একটি উক্তি নিশ্চয়ই আমেরিকান আদর্শের বিরোধী। তিনি আমাদের দেশের প্রতিষ্ঠান-সমূহ পর্যবেক্ষণ করিতেছেন কিনা, জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, 'না, আমি একজন প্রচারক মাত্র।' ইহা কৌতূহলের অভাব ও সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক এবং ধর্মতত্ত্বাভিজ্ঞ এই বৌদ্ধ প্রচারকের সহিত যেন খাপ খায় না।

হোটেল হইতে অ্যাকাডেমি খুব কাছেই। ৮টার সময় রোলাণ্ড কোনর তাঁহাকে নাতিবৃহৎ শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়া দেন। বক্তা একটি লম্বা আলখাল্লা পরিয়া গিয়াছিলেন, উহার কটিবন্ধটি লাল রঙের। তাঁহার মাথায় পাগড়ি ছিল, একটি অপ্রশস্ত শাল জড়াইয়া জড়াইয়া বোধ করি উহা গঠিত।

ভাষণের প্রারম্ভেই বক্তা বলিয়া লইলেন যে, তিনি মিশনরীরূপে এখানে আসেন নাই, বৌদ্ধেরা (হিন্দুরা) অপর ধর্ম-বিশ্বাসের লোককে স্বমতে আনিবার চেষ্টা করেন না। তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইল—'ধর্মসমূহের সমন্বয়'। মিঃ কানন্দ বলেন, প্রাচীনকালে এমন বহু ধর্ম ছিল—যাহাদের আজ আর কোন অস্তিত্ব নাই, ভারতবাসীর দুই-তৃতীয়াংশ হইল বৌদ্ধ (হিন্দু), অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ অন্যান্য নানা ধর্মের অনুগামী। বৌদ্ধমতে মৃত্যুর পর মানুষের নরকে শাস্তিভোগের কোনও স্থান নাই। এখানে খ্রীষ্টানদের মত হইতে উহার পার্থক্য। খ্রীষ্টানরা ইহলোকে মানুষকে পাঁচ মিনিটের জন্য ক্ষমা করিতে পারে, কিন্তু পরলোকে তাহার জন্য অনন্ত নরকের ব্যবস্থা করে। মানুষের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা বুদ্ধই প্রথম দেন। বর্তমানকালে বৌদ্ধধর্মের ইহা একটি প্রধান নীতি। খ্রীষ্টানরা ইহা প্রচার করেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ অভ্যাস করেন না।

উদাহরণস্বরূপ তিনি এই দেশের দক্ষিণাঞ্চলে নিগ্রোগণের অবস্থার বিষয় উল্লেখ করেন। তাহাদিগকে শ্বেতকায়গণের সহিত এক হোটেলে থাকিতে বা এক যানে চড়িতে দেওয়া হয় না। কোন ভদ্রলোক তাহাদিগের সহিত কথা বলে না। বক্তা বলেন, তিনি দক্ষিণে গিয়াছেন এবং নিজের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণ হইতে ইহা বলিতেছেন।

আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত একটি সন্ধ্যা

'নরথাম্প্‌টন ডেলি হেরাল্ড', ১৬ই এপ্রিল, ১৮৯৪

স্বামী বিবেকানন্দ নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সমুদ্রের অপর পারে আমাদের যে-সব প্রতিবেশী আছেন—এমন কি যাঁহারা সুদূরতম অঞ্চলের বাসিন্দা, তাঁহারাও আমাদের নিকট সম্পর্কের আত্মীয়, শুধু বর্ণ ভাষা আচার-ব্যবহার ও ধর্মে সামান্য যা একটু পার্থক্য। এই বাগ্মী হিন্দু সন্ন্যাসী গত শনিবার সন্ধ্যায় সিটি হল-এ তাঁহার বক্তৃতার উপক্রমণিকাস্বরূপ ভারতীয় এবং পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক চিত্র তুলিয়া ধরেন। উহাতে ইহাই প্রতিপাদিত হয় যে, অনেকে যথেষ্ট না জানিলেও বা অস্বীকার করিলেও জাতিসমূহের পারস্পরিক মিল ও সম্পর্ক একটি সুস্পষ্ট সত্য ঘটনা।

ইহার পর বক্তা মনোজ্ঞ ও প্রাঞ্জল কথোপকথনচ্ছলে হিন্দু জনগণের কতিপয় আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহাদের এই আলোচ্য বিষয়টিতে একটি স্বাভাবিক বা অনুশীলিত অনুরাগ আছে, তাঁহারা বক্তা ও তাঁহার চিন্তাধারার প্রতি নানা কারণে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বক্তা অপরদের নৈরাশ্যই উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, কেন-না তাঁহার আলোচনার গণ্ডী আরও বিস্তৃত হওয়া উচিত ছিল। আমেরিকার বক্তৃতা-মঞ্চের পক্ষে বক্তৃতাটি অত্যন্ত দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদিগের 'আচার-ব্যবহার' সম্বন্ধে সামান্যই বলা হইয়াছিল। এই প্রাচীনতম জাতির এমন একজন সুযোগ্য প্রতিনিধির মুখ হইতে ঐ জাতির ব্যক্তিগত, নাগরিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং ধর্মসংক্রান্ত আরও অনেক কিছু তথ্য শুনিতে পাইলে সকলেই খুশী হইতেন। মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাঁহারা জিজ্ঞাসু, তাঁহাদিগের নিকট এই বিষয়টি খুবই চিত্তাকর্ষক, যদিও এই দিকে তাঁহাদের জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ।

হিন্দু-জীবনের প্রসঙ্গ বক্তা আরম্ভ করেন হিন্দু-বালকের জন্ম হইতে। তারপর বিদ্যারম্ভ ও বিবাহ। হিন্দুর পারিবারিক জীবনের উল্লেখ সামান্য মাত্র করা হয়, যদিও লোকে আরও বেশী শুনিবার আশা করিয়াছিল। বক্তা ঘন ঘন সমাজ, নীতি ও ধর্মের দিক দিয়া ভারতীয় জাতির চিন্তা ও কার্যধারার সহিত ইংরেজীভাষী জাতিসমূহের ভাব ও আচরণের তুলনামূলক মন্তব্যে ব্যাপৃত হইতেছিলেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রায় সব ক্ষেত্রেই ভারতের অনুকূলে উপস্থাপিত হইতেছিল, তবে তাঁহার প্রকাশ-ভঙ্গী অতি বিনীত, সহৃদয় ও ভদ্র। শ্রোতৃ-মণ্ডলীর মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন, যাঁহারা হিন্দুজাতির সকল শ্রেণীর সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচিত। বক্তার আলোচিত অনেকগুলি বিষয়ে তাঁহাকে দু-একটি পাল্টা প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ বলিতে পারা যায় যে, বক্তা যখন চমৎকার বাগ্মিতার সহিত 'নারী জাতিকে দিব্য মাতৃত্বের দৃষ্টিতে দেখা' হিন্দুদের এই ভাবটি বর্ণনা করিতেছিলেন—বলিতেছিলেন, ভারতে নারী চিরদিন শ্রদ্ধার পাত্রী এবং এমনকি কখন কখন যে গভীর বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তিনি পূজিতা হন, তাহা স্ত্রীজাতির প্রতি অতিশয় সম্মানসম্পন্ন আমেরিকান পুত্র, স্বামী ও পিতারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না—তখন বক্তাকে কেহ জিজ্ঞাসা

করিতে পারিতেন যে, এই সুন্দর উচ্চ আদর্শটি কার্যতঃ হিন্দুদের গৃহে স্ত্রী, জননী, কন্যা এবং ভগিনীদের প্রতি কতদূর প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

বক্তা শ্বেতকায় ইওরোপীয় ও আমেরিকান জাতিদের বিত্তলোভ, বিলাসব্যসন, স্বার্থপরতা এবং কাঞ্চন-কৌলীন্যের সমালোচনা করিয়া উহাদের বিষময় নৈতিক ও সামাজিক পরিণামের কথা বলেন। তাঁহার এই সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায্য এবং তিনি উহা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধীর, মৃদু, শান্ত, অনুত্তেজিত ও মধুর কণ্ঠে বক্তা তাঁহার চিন্তাগুলিকে যে বাক্যের আকার দিতেছিলেন, উহাদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড ভাষার শক্তি ও আগুন এবং উহা সোজাসুজি তাঁহার অভিপ্রেত বিষয় ব্যক্ত করিতেছিল। ইহুদীদের প্রতি যীশুখ্রীষ্টের উগ্র কটূক্তির কথা মনে হইতেছিল। কিন্তু অভিজাতকুলোদ্ভব, চরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ঐ হিন্দু মহোদয় যখন মাঝে মাঝে কতকটা যেন তাঁহার নিজের অজ্ঞাতসারেই মূল বক্তব্য হইতে সরিয়া গিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বজাতির ধর্ম যাহা স্পষ্টভাবে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থান্বেষী, প্রধানতঃ নিজেকে বাঁচাইতে ব্যস্ত, নেতিমূলক, নিশ্চেষ্ট ও কর্মবিমুখ—খ্রীষ্টধর্ম নামে পরিচিত প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল, আত্মত্যাগী, সর্বদা পরহিতব্রতী, পৃথিবীর সর্বত্র প্রসারশীল, কর্মতৎপর ধর্ম হইতে পৃথিবীতে উপযোগিতার দিক দিয়া উৎকৃষ্ট, তখন মনে হয়, তাঁহার এই প্রচেষ্টা একটি বড় রকমের চাল। খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী অবিবেচক গোঁড়ারা যতই শোচনীয় ও লজ্জাকর ভুল করিয়া থাকুক না কেন, ইহা তো সত্য যে পৃথিবীতে যত নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং লোকহিতকর কাজ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নয়-দশমাংশ এই ধর্মের নামেই সম্পন্ন হইয়াছে।

কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দকে দেখা ও তাঁহার কথা শুনিবার সুযোগ—কোন বুদ্ধিমান্ ও পক্ষপাতশূন্য আমেরিকানেরই ত্যাগ করা উচিত নয়। যে জাতি উহার আয়ুষ্কাল আমাদের ন্যায় শতাব্দীতে মাপ না করিয়া হাজার হাজার বৎসর দিয়া গণনা করে, সেই জাতির মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার সহিত পরিচয় প্রত্যেকেরই পক্ষে প্রচুর লাভজনক। রবিবার অপরাহ্নে এই বিশিষ্ট হিন্দু স্মিথ-কলেজের ছাত্রদের নিকট 'ঈশ্বরের পিতৃভাব এবং মানবের ভ্রাতৃত্ব' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে এই ভাষণ গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। বক্তার

সমগ্র চিন্তাধারায় উদারতম বদান্যতা এবং যথার্থ ধর্মপ্রাণতা যে পরিস্ফুট, ইহা প্রত্যেকেই বলিতেছিলেন।

'স্মিথ কলেজ মাসিক', মে, ১৮৯৪

১৫ই এপ্রিল রবিবার হিন্দু-সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ—যাঁহার ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যান চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনে প্রভূত প্রশংসাসূচক মন্তব্যের সৃষ্টি করিয়াছিল—কলেজের সান্ধ্য উপাসনায় বক্তৃতা দেন। আমরা মানুষের সৌভ্রাত্র এবং ঈশ্বরের পিতৃভাব সম্বন্ধে কত কথাই বলিয়া থাকি, কিন্তু এই শব্দগুলির প্রকৃত তাৎপর্য অল্প লোকেই হৃদয়ঙ্গম করে। মানবাত্মা যখন বিশ্বপিতার এত সন্নিকটে আসে যে, দ্বেষ হিংসা এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষুদ্র দাবিসমূহ তিরোহিত হয় (কেন-না মানুষের স্বরূপ—এগুলির অনেক ঊর্ধ্বে), তখনই যথার্থ বিশ্বভ্রাতৃত্ব সম্ভবপর। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত—আমরা যেন হিন্দুদের গল্পে বর্ণিত 'কূপমণ্ডূক' না হইয়া পড়ি। একটি ব্যাঙ বহু বৎসর ধরিয়া একটি কূপের মধ্যে বাস করিতেছিল। অবশেষে কূপের বাহিরে যে খোলা জায়গা আছে, তাহা সে ভুলিয়া গেল এবং উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে লাগিল।

ভারত ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে

'নিউ ইয়র্ক ডেলী ট্রিবিউন', ২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৪

গত সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ালডর্ফ হোটেলে মিসেস আর্থার স্মিথের 'কথোপকথন-চক্রে'র নিকট 'ভারতবর্ষ ও হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। গায়িকা মিস সারা হামবার্ট ও মিস অ্যানি উইলসন অনেকগুলি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বক্তা একটি কমলালেবু রঙের কোট এবং হলদে-পাগড়ি পরিয়াছিলেন। ইহা হইল ভগবান্ এবং মানব-সেবার জন্য সর্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর বেশ।

বক্তা পুনর্জন্মবাদের আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, যাঁহাদের পাণ্ডিত্য অপেক্ষা কলহপ্রিয়তাই বেশী, এমন অনেক ধর্মযাজক তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, পূর্বজন্ম যদি থাকে তাহা হইলে লোকের উহা স্মরণ হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, স্মরণ করিতে পারা না পারার উপর কোনও ঘটনার সত্যাসত্য স্থাপন করা ছেলেমানুষি! মানুষ তো তাহার জন্মের কথা মনে করিতে পারে না এবং জীবনে ঘটিয়াছে, এমন আরও অনেক কিছুই তো সে ভুলিয়া যায়।

বক্তা বলেন, খ্রীষ্টধর্মের 'শেষ বিচারের দিন'-এর ন্যায় কোন বস্তু হিন্দুধর্মে নাই। হিন্দুদের ঈশ্বর শাস্তিও দেন না, পুরস্কৃতও করেন না। কোন প্রকার অন্যায় করিলে তাহার শাস্তি অবিলম্বে স্বাভাবিকভাবেই ঘটিবে। যতদিন না পূর্ণতা লাভ হইতেছে, ততদিন আত্মাকে এক দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ করিতে হইবে।

ভারতীয় আচার-ব্যবহার

'বস্টন হেরাল্ড', ১৫ই মে, ১৮৯৪

গতকল্য ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের 'ভারতীয় ধর্ম' (বস্তুতঃ—ভারতীয় আচার-ব্যবহার) সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার জন্য অ্যাসোসিয়েশন-হলে মহিলাদের খুব ভিড় হয়। ১৬নং ওয়ার্ডের ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ এই বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল। (বস্তুতঃ টাইলার স্ট্রীট ডে নার্সারী বিদ্যালয়)। এই ব্রাহ্মণ-সন্ন্যাসী গত বৎসর চিকাগোতে যেমন সকলের মনোযোগ ও উৎসাহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবার বস্টনে অনুরূপ ঘটিয়াছে। তাঁহার আন্তরিক সাধু মার্জিত চালচলন দ্বারা তিনি বহু অনুরাগী বন্ধু লাভ করিয়াছেন।

বক্তা বলেন: হিন্দুজাতির ভিতর বিবাহকে খুব বড় করিয়া দেখা হয় না। কারণ ইহা নয় যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে ঘৃণা করি। আমাদের ধর্ম নারীকে মাতৃবুদ্ধিতে পূজা করিবার উপদেশ দেয় বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়াছে। প্রত্যেক নারী হইলেন নিজের মায়ের মতো—এই শিক্ষা হিন্দুরা বাল্যকাল হইতে পায়। কেহ তো আর জননীকে বিবাহ করিতে চায় না। আমরা ঈশ্বরকে মা বলিয়া ভাবি। স্বর্গবাসী ঈশ্বরের আমরা আদৌ পরোয়া করি না। বিবাহকে আমরা একটি নিম্নতর অবস্থা বলিয়া

মনে করি। যদি কেহ বিবাহ করে, তবে ধর্মপথে তাহার একজন সহায়ক সঙ্গীর প্রয়োজন বলিয়াই করে।

তোমরা বলিয়া থাকো যে, আমরা হিন্দুরা আমাদের নারীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার করি। পৃথিবীর কোন্ জাতি স্ত্রীজাতিকে পীড়া দেয় নাই? ইওরোপ বা আমেরিকায় কোন ব্যক্তি অর্থের লোভে কোন মহিলার পাণিগ্রহণ করিতে পারে এবং বিবাহের পর তাঁহার অর্থ আত্মসাৎ করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে। পক্ষান্তরে ভারতে কোন স্ত্রীলোক যদি ধনলোভে বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সন্তানদের ক্রীতদাস বলিয়া মনে করা হয়। বিত্তবান্ পুরুষ বিবাহ করিলে তাঁহার অর্থ তাঁহার পত্নীর হাতেই যায় এবং সেইজন্য টাকাকড়ির ভার যিনি লইয়াছেন, সেই পত্নীকে পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

তোমরা আমাদিগকে পৌত্তলিক, অশিক্ষিত, অসভ্য প্রভৃতি বলিয়া থাকো, আমরা শুনিয়া এইরূপ কটুভাষী তোমাদের ভদ্রতার অভাব দেখিয়া মনে মনে হাসি। আমাদের দৃষ্টিতে সদ্‌গুণ এবং সৎকুলে জন্মই জাতি নির্ধারণ করে, টাকা নয়। ভারতে টাকা দিয়া সম্মান কেনা যায় না। জাতিপ্রথায় উচ্চতা অর্থ দ্বারা নিরূপিত হয় না। জাতির দিক দিয়া অতি দরিদ্র এবং অত্যন্ত ধনীর একই মর্যাদা। জাতিপ্রথার ইহা একটি চমৎকার দিক।

বিত্তের জন্য পৃথিবীতে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছে, খ্রীষ্টানরা পরস্পর পরস্পরকে মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিয়াছে। ধনলিপ্সা হইতেই জন্মায় হিংসা, ঘৃণা, লোভ এবং চলে প্রচণ্ড কর্মোন্মত্ততা, ছুটাছুটি, কলরব। জাতিপ্রথা মানুষকে এই-সকল হইতে নিষ্কৃতি দেয়। উহা তাহাকে অল্প টাকায় জীবন যাপন করিতে সক্ষম করে এবং সকলকেই কাজ দেয়। জাতিপ্রথায় মানুষ আত্মার চিন্তা করিবার অবসর পায়, আর ভারতীয় সমাজে ইহাই তো আমরা চাই।

ব্রাহ্মণের জন্ম দেবার্চনার জন্য। জাতি যত উচ্চ, সামাজিক বিধি-নিষেধও তত বেশী। জাতিপ্রথা আমাদিগকে হিন্দুজাতিরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। এই প্রথার অনেক ত্রুটি থাকিলেও বহু সুবিধা আছে।

মিঃ বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় ও

কলেজসমূহের বর্ণনা করেন। তিনি বিশেষ করিয়া বারাণসীর (?) প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়টির উল্লেখ করেন। উহার ছাত্র ও অধ্যাপকদের মোট সংখ্যা ছিল ২০,০০০।

বক্তা আরও বলেন, 'তোমরা যখন আমার ধর্ম সম্বন্ধে বিচার করিতে ব'স, তখন ধরিয়া লও যে, তোমাদের ধর্মটি হইল নিখুঁত আর আমারটি ভুল। ভারতের সমাজের সমালোচনা করিবার সময়েও তোমরা মনে কর, যে পরিমাণে উহা তোমাদের আদর্শের সঙ্গে মিলে না, সেই পরিমাণে উহা অমার্জিত। এই দৃষ্টিভঙ্গী অর্থহীন।'

শিক্ষা সম্পর্কে বক্তা বলেন, ভারতে যাহারা অধিক শিক্ষিত, তাহারা অধ্যাপনার কাজ করে। অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিতেরা পুরোহিত হয়।

ভারতের ধর্মসমূহ

'বস্টন হেরাল্ড', ১৭ই মে, ১৮৯৪

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ গতকল্য বিকালে অ্যাসোসিয়েশন হল-এ ১৬নং ওয়ার্ড ডে নার্সারী বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে 'ভারতের ধর্মসমূহ' সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্রচুর শ্রোতৃসমাগম হইয়াছিল।

বক্তা প্রথমে মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে বলেন। ভারতের জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ হইল মুসলমান। ইঁহারা বাইবেলের পুরাতন এবং নূতন দুই টেস্টামেণ্টেই বিশ্বাস করেন, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টকে শুধু ভগবদাদিষ্ট মহাপুরুষ মাত্র বলেন। খ্রীষ্টানদের ন্যায় ইঁহাদের উপাসনালয়সমূহের কোন সংস্থা নাই, তবে সম্মিলিত কোরানপাঠ প্রচলিত।

ভারতবর্ষের আর একটি ধর্মসম্প্রদায় পার্শী জাতি। ইঁহাদের ধর্মগ্রন্থের নাম জেন্দ্-আবেস্তা। ইঁহারা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতায় বিশ্বাসী—কল্যাণের অধিষ্ঠাতা আরমুজ্দ্ এবং অশুভের জনক আহ্রিমান। পার্শীদের নৈতিক-বিধানের সারমর্ম হইল: সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য এবং সৎ কর্ম।

হিন্দুগণ বেদকে তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া মনে করেন। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বকীয় জাতির রীতিনীতি মানিতে বাধ্য, তবে ধর্মের ব্যাপারে নিজের খুশিমত চিন্তা করিয়া দেখিবার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রত্যেককে দেওয়া হয়। ধর্মসাধনার

একটি অংশ হইল কোন সাধুপুরুষ বা ধর্মাচার্যকে খুঁজিয়া বাহির করা এবং তাঁহার মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রবাহ ক্রিয়া করিতেছে, উহার সুযোগ লওয়া।

হিন্দুদের তিনটি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় রহিয়াছে—দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী এবং অদ্বৈতবাদী। এগুলিকে কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পথে স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত তিনটি ধাপ্ বলিয়া মনে করা হয়।

তিন সম্প্রদায়ই ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তবে দ্বৈতবাদীদের মতে ঈশ্বর এবং মানুষ পরস্পর ভিন্ন। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবাদীরা বলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একটি মাত্র সত্তা আছে—ইহা ঈশ্বর ও জীব দুয়েরই অতীত।

বক্তা বেদ হইতে উদ্ধৃত করিয়া হিন্দুধর্মের প্রকৃতি কি, তাহা দেখান এবং বলেন, ভগবান্‌কে পাইতে হইলে আমাদিগকে নিজেদের হৃদয়ে অন্বেষণ করিতে হইবে। পুঁথিপত্রের মধ্যে ধর্ম নাই। ধর্ম হইল অন্তরের অন্তরে তাকাইয়া ঈশ্বর ও অমৃতত্বের সত্যকে উপলব্ধি করা। বেদের একটি উক্তি: যাহাকে আমি পছন্দ করি, তাহাকে সত্যদ্রষ্টা-রূপে গড়িয়া তুলি। সত্যদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই ধর্মের মূল লক্ষ্য।

জৈনধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলিয়া বক্তা তাঁহার আলোচনার উপসংহার করেন। এই ধর্মাবলম্বীরা মূক প্রাণীদের প্রতি বিশেষ দয়া প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের নৈতিক অনুশাসন হইল সংক্ষেপে: কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করাই মহত্তম কল্যাণ।

ভারতের ধর্মসম্প্রদায় ও ধর্মবিশ্বাস

'হার্ভার্ড ক্রিমজন', ১৭ই মে, ১৮৯৪

হার্ভার্ড ধর্ম-সম্মিলনীর উদ্যোগে গতকল্য সন্ধ্যায় সেভার হল-এ হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। বক্তার পরিষ্কার ওজস্বী কণ্ঠ এবং ধীর আন্তরিকতাপূর্ণ বাচনভঙ্গীর জন্য তাঁহার কথাগুলি বিশেষভাবে হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল।

বিবেকানন্দ বলেন, ভারতে নানা ধর্মসম্প্রদায় এবং ধর্মমত বিদ্যমান। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি-ঈশ্বর স্বীকার করে, অপর কতকগুলির মতে

ভগবান্ এবং বিশ্বজগৎ অভিন্ন। তবে যে-কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হউক না কেন, কোনও হিন্দু বলে না যে, তাহার মতটিই সত্য আর অপরে ভ্রান্ত। হিন্দু বিশ্বাস করে যে, ভগবানের নিকট পৌছিবার পথ বহু; যিনি প্রকৃত ধার্মিক, তিনি দল বা মতের ক্ষুদ্র কলহের উর্ধ্বে। যদি কাহারও যথার্থ ধারণা হয় যে, সে দেহ নয়, চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, তবেই তাহাকে ভারতে ধার্মিক বলা হয়, তার পূর্বে নয়।

ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী হইতে গেলে দেহের চিন্তা সর্বতোভাবে বিস্মৃত হওয়া এবং অন্য মানুষকে আত্মা বলিয়া ভাবা প্রয়োজনীয়। এইজন্য সন্ন্যাসীরা কখনও বিবাহ করে না। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার সময় দুইটি ব্রত লইতে হয়—দারিদ্র্য এবং ব্রহ্মচর্য। সন্ন্যাসীর টাকাকড়ি লওয়া বা থাকা নিষিদ্ধ। সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিবার সময় প্রথম একটি ক্রিয়া অনুষ্ঠেয়—নিজের প্রতিমূর্তি দগ্ধ করা। ইহার দ্বারা পুরাতন শরীর নাম ও জাতি যেন চিরকালের জন্য ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। তারপর ব্রতীকে একটি নূতন নাম দেওয়া হয় এবং তিনি স্বেচ্ছামত পর্যটন বা ধর্মপ্রচারের অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু তিনি যে শিক্ষা দেন, তাহার জন্য প্রতিদানে তাঁহার কোন অর্থ লইবার অধিকার নাই।

উপদেশ কম, খাদ্য বেশী

'বল্টিমোর আমেরিকান', ১৫ই অক্টোবর, ১৮৯৪

ক্রমান ব্রাদার্স-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠেয় আলোচনা-সভাগুলির প্রথমটি গত-কল্য রাত্রিতে লাইসিয়াম থিয়েটারে সম্পন্ন হয়। খুব ভিড় হইয়াছিল। আলোচ্য বিষয় ছিল 'প্রাণবন্ত ধর্ম'।

ভারত হইতে আগত ধর্মযাজক স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন শেষ বক্তা। যদিও তিনি অল্পক্ষণ বলিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রোতারা বিশেষ মনোযোগের সহিত তাঁহার কথা শুনেন। তাঁহার ইংরেজী ভাষা এবং বক্তৃতার ধরন অতি সুন্দর। তাঁহার উচ্চারণে বৈদেশিক ধাঁচ থাকিলেও তাঁহার কথা বুঝিতে অসুবিধা হয় না। তিনি তাঁহার স্বদেশীয় পোশাক পরিয়াছিলেন, উহা বেশ জমকালো। তিনি বলেন, তাঁহার পূর্বে অনেক ওজস্বী ভাষণ হইয়া যাওয়াতে তিনি

সংক্ষেপেই তাঁহার বক্তব্য শেষ করিতে চান। পূর্ব-বক্তারা যাহা বলিয়াছেন, তিনি তাহা অনুমোদন করিতেছেন। তিনি অনেক ভ্রমণ করিয়াছেন এবং নানাশ্রেণীর লোকের কাছে ধর্মপ্রসঙ্গ করিয়াছেন। তাঁহার অভিজ্ঞতা এই যে, কি মতবাদ প্রচার করা হইল, তাহাতে অল্পই আসে যায়। আসল প্রয়োজন হইল একটি কার্যকর কর্মপন্থা। বড় বড় কথা যদি কাজে পরিণত করা না হয়, তাহা হইলে মনুষ্যত্বের উপর বিশ্বাস চলিয়া যায়। পৃথিবীর সর্বত্র লোকের ব্যাকুল চাহিদা হইল—উপদেশ কম, খাদ্য বেশী। ভারতবর্ষে মিশনরী পাঠানো ভালই, তাঁহার ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই, তবে তাঁহার মতে লোক কম পাঠাইয়া বেশী টাকা পাঠানো সঙ্গত। ভারতে ধর্মমতের অভাব নাই। নূতন ধর্মমত আমদানী করা অপেক্ষা ধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী জীবনযাপনই অধিক প্রয়োজনীয়। ভারতবাসী এবং পৃথিবীর সর্বত্র অন্যান্য সকলেই উপাসনার রীতি সম্বন্ধে শিক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু মুখে প্রার্থনা উচ্চারণ করা যথেষ্ট নয়। হৃদয়ের আন্তরিকতা দিয়া প্রার্থনা করা চাই। বক্তা বলেন, 'বাস্তবপক্ষে জগতে প্রকৃত কল্যাণচিকীর্ষুর সংখ্যা খুব অল্প। অপরে শুধু তাকাইয়া দেখে, বাহবা দেয় এবং ভাবে যে, তাহারা নিজেরা অনেক কিছু মহৎ কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। প্রেমই যথার্থ জীবন। মানুষ যখন অপরের হিত করিতে ক্ষান্ত হয়, তখন আধ্যাত্মিক দিক দিয়া সে মৃত।'

আগামী রবিবার সন্ধ্যায় লাইসিয়ামে স্বামী বিবেকানন্দ হইবেন প্রধান বক্তা।

বুদ্ধের ধর্ম

'মর্নিং হেরাল্ড', ২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪

ক্রম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী কর্তৃক আয়োজিত 'প্রাণবন্ত ধর্ম' পর্যায়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা গত রাত্রে লাইসিয়াম থিয়েটার লোকের ভিড়ে পুরাপুরি ভরিয়া গিয়াছিল। শ্রোতাদের সংখ্যা তিন হাজার হইবে।···বক্তৃতা করেন রেভারেণ্ড হিরাম ক্রম্যান, রেভারেণ্ড ওয়ালটার ক্রম্যান এবং এই শহরে (বল্টিমোর) সম্প্রতি আগত ব্রাহ্মণ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড স্বামী বিবেকানন্দ। বক্তারা সকলেই স্টেজের উপর বসিয়াছিলেন। রেভারেণ্ড বিবেকানন্দ সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছিলেন।

তিনি একটি হলুদ রঙের পাগড়ি এবং লাল আলখাল্লা পরিয়াছিলেন। আলখাল্লার কটিবন্ধটিও লাল রঙের। এই পোশাক তাঁহার প্রাচ্য চেহারার মর্যাদা বাড়াইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি একটি অদ্ভুত আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহার ব্যক্তিত্বই গতরাত্রের অনুষ্ঠানটিকে যেন জমাইয়া রাখিয়াছিল। সহজ ভাবে একটুও বিব্রত বোধ না করিয়া তিনি ভাষণটি বলিয়া গেলেন। তাহার ভাষা নিখুঁত, উচ্চারণ—ইংরেজী ভাষা-জানা কোন সুশিক্ষিত ল্যাটিন-জাতীয় ব্যক্তির ন্যায়। তাঁহার বক্তৃতার কিয়দংশ দেওয়া হইতেছে :

খ্রীষ্টের জন্মের ৬০০ বৎসর আগে বুদ্ধ তাঁহার ধর্মপ্রচার আরম্ভ করেন। তিনি দেখিলেন, ভারতবর্ষে তখন ধর্ম প্রধানতঃ মানুষের আত্মার প্রকৃতি লইয়া অন্তহীন বাদ-বিতণ্ডায় ব্যাপৃত। তদানীন্তন ধর্মের শিক্ষায় প্রাণিহত্যা, যাগযজ্ঞ এবং অনুরূপ প্রণালী ছাড়া ধর্মপথের অনিষ্টকর বিষয়সমূহের অন্য কোন প্রতীকার ছিল না।

বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তিনি এইরূপ ধর্মব্যবস্থার মধ্যে একটি অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কথা এই যে, তিনি কোন নূতন ধর্ম প্রচলিত করেন নাই, তাঁহার আন্দোলন ছিল সংস্কার-মূলক। সকলের হিত-কামনা ছিল তাঁহার লক্ষ্য। তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম তিনটি আবিষ্কারের মধ্যে নিহিত। প্রথম—অশুভ আছে। দ্বিতীয়—এই অশুভের কারণ কি? বুদ্ধ বলিলেন, অশুভের কারণ মানুষের অপরের উপর প্রাধান্য-লাভের কামনা। নিঃস্বার্থপরতা দ্বারা এই দোষ দূর করা যাইতে পারে। বল প্রকাশ করিয়া ইহার প্রতিরোধ সম্ভবপর নয়। ময়লা দিয়া ময়লা ধোয়া যায় না; ঘৃণা দ্বারা ঘৃণা নিবারিত হয় না।

ইহাই হইল বুদ্ধের ধর্মের ভিত্তি। যতক্ষণ সমাজ মানুষের স্বার্থপরতা এমন সব আইন-কানুন ও সংস্কার মাধ্যমে প্রতিবিধান করিবার চেষ্টা করে, যেগুলির লক্ষ্য হইল জোর করিয়া মানুষকে প্রতিবেশীদের হিতসাধনে প্রযোজিত করা, ততক্ষণ কোনও সুফল হইবার নয়। কৌশলের বিরুদ্ধে কৌশলকে, হিংসার বিরুদ্ধে হিংসাকে না লাগানোই হইল কার্যকর পন্থা। নিঃস্বার্থ নরনারী সৃষ্টি করাই হইল একমাত্র প্রতীকার। বর্তমানের অশুভগুলি দূর করিবার জন্য আইন চালু করা যাইতে পারে, কিন্তু উহাতে বিশেষ কোন ফল হইবে না।

বুদ্ধ দেখিয়াছিলেন, ভারতে ঈশ্বর এবং তাঁহার স্বরূপ লইয়া অত্যধিক জল্পনা চলে, কিন্তু প্রকৃত কাজ হয় অতি সামান্য। এই মুখ্য সত্যটির উপর তিনি সর্বদা জোর দিতেন: আমাদিগকে সৎ এবং পবিত্র হইতে হইবে এবং অপরকে পবিত্র হইবার জন্য সাহায্য করিতে হইবে। তিনি বিশ্বাস করিতেন, মানুষকে উদ্যমশীল হইয়া অপরের উপকার সাধনে লাগিতে হইবে, অন্যের মধ্যে নিজের আত্মাকে, অন্যের ভিতর নিজের জীবনকে খুঁজিয়া পাইতে হইবে। অপরের কল্যাণ-সাধনের দ্বারাই আমরা নিজেদের মঙ্গল বিধান করি। বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন, জগতে সর্বদাই অত্যধিক পরিমাণে মতবাদ চলিতে থাকে, তদনুপাতে কার্যতঃ অভ্যাস দেখা যায় খুব কম। বর্তমানকালে বুদ্ধের মতো ১২ জন লোক যদি ভারতে থাকেন তো ঐ দেশের পক্ষে পর্যাপ্ত। এই দেশে একজন বুদ্ধ পাওয়া গেলে প্রভূত কল্যাণ হইবে।

ধর্মীয় মতবাদ যখন বৃদ্ধি পায়, পিতৃপুরুষের ধর্মে অন্ধবিশ্বাস যখন প্রবল হয় এবং কুসংস্কারকে যখন যুক্তি দ্বারা সমর্থনের চেষ্টা চলে, তখন একটি পরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কেন-না ঐ-সকলের দ্বারা মানুষের অনিষ্টই বাড়িতে থাকে, উহাদের শোধন না হইলে মানুষের কল্যাণ নাই।

মিঃ বিবেকানন্দের বক্তৃতার শেষে শ্রোতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনি দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন।

'বল্টিমোর আমেরিকান', ২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪

'প্রাণবন্ত ধর্ম' সম্বন্ধে জ্রুম্যান ভ্রাতৃমণ্ডলী যে বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার দ্বিতীয়টি শুনিবার জন্য গত রাত্রে লাইসিয়াম থিয়েটার গৃহ লোকে সম্পূর্ণ ভরিয়া গিয়াছিল। প্রধান বক্তা ছিলেন ভারতের স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বলেন এবং বুদ্ধের জন্মের সময় ভারত-বাসীর মধ্যে যে-সব দোষ ছিল, তাহার উল্লেখ করেন। ঐ সময়ে ভারতে সামাজিক অসাম্য পৃথিবীর অন্য যে-কোন অঞ্চল অপেক্ষা হাজার গুণ বেশী ছিল। খ্রীষ্টের জন্মের ছয়শত বৎসর পূর্বে ভারতীয় জনগণের মনে পুরোহিত-সম্প্রদায়ের খুব প্রভাব ছিল। বুদ্ধি-বিচার এবং বিদ্যাবত্তা—পেষণযন্ত্রের এই দুই পাথরের মধ্যে পড়িয়া জনসাধারণ নিষ্পিষ্ট হইতেছিল।

বৌদ্ধধর্ম একটি নূতন ধর্মরূপে স্থাপিত হয় নাই; বরং উহার উৎপত্তি হইয়াছিল সেই সময়কার ধর্মের অবনতির সংশোধকরূপে। বুদ্ধই বোধ করি একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি নিজের দিকে বিন্দুমাত্র না তাকাইয়া সকল উত্তম পরহিতে নিয়োগ করিয়াছিলেন। মানুষের দুঃখকষ্ট-রূপ ভীষণ ব্যাধির ঔষধ অন্বেষণের জন্য তিনি গৃহ এবং জীবনের সকল ভোগসুখ বিসর্জন দিয়াছিলেন। যে যুগে পণ্ডিত এবং পুরোহিতকুল ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথা তর্ক-বিতর্কে ব্যস্ত, বুদ্ধ সেই সময়ে মানুষ যাহা খেয়াল করে না, জীবনের সেই একটি বিপুল বাস্তব সত্য আবিষ্কার করিলেন—দুঃখের অস্তিত্ব। আমরা অপরকে ডিঙাইয়া যাইতে চাই এবং আমরা স্বার্থপর বলিয়া পৃথিবীতে এত অনিষ্ট ঘটে, যে মুহূর্তে জগতের সকলে নিঃস্বার্থ হইতে পারিবে, সেই মুহূর্তে সকল অশুভ তিরোহিত হইবে। সমাজ যতদিন আইন-কানুন এবং সংস্থাসমূহের মাধ্যমে অকল্যাণের প্রতীকার করিতে সচেষ্ট, ততদিন ঐ প্রতীকার অসম্ভব। হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া জগৎ ঐ প্রণালী অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছে; কোনও ফল হয় নাই। হিংসা দ্বারা হিংসা জয় করা যায় না। নিঃস্বার্থপরতা দ্বারাই সকল অশুভ *নিবারিত হয়। নূতন নূতন নিয়ম না করিয়া মানুষকে পুরাতন নিয়মগুলি পালন করিবার শিক্ষা দিতে হইবে।* বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর প্রথম প্রচারশীল ধর্ম, তবে অপর কোনও ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করা বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতা মানবগোষ্ঠীর ভিতর পারস্পরিক সংঘর্ষ আনিয়া কল্যাণ-শক্তি হারাইয়া ফেলে।

সকল ধর্মই ভাল

'ওয়াশিংটন পোস্ট', ২৯শে অক্টোবর, ১৮৯৪

'পীপ্‌ল্‌স্‌ চার্চ' গির্জার ধর্মযাজক ডক্টর কেণ্ট-এর আমন্ত্রণে মিঃ কানন্দ গতকল্য সেখানে বক্তৃতা করেন। সকালের বক্তৃতাটি ছিল রীতিমত ধর্মোপদেশ। ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক মাত্রই তিনি আলোচনা করেন। প্রাচীনপন্থী সম্প্রদায়গুলির নিকট তাঁহার কথা কিছু অভিনব মনে হইবে। তিনি বলেন, প্রত্যেক ধর্মের মূলেই ভাল জিনিস আছে। ভাষাসমূহের ন্যায় বিভিন্ন ধর্মও একটি সাধারণ ভাণ্ডার হইতে উৎপন্ন। গোঁড়া মতবাদ এবং প্রাণহীন

কঙ্কালে পরিণতি—এই দুইটি হইতে যদি ধর্মকে মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক ধর্মই মানুষের লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতে পারে। বিকালের আলোচনাটি ছিল আর্যজাতি সম্বন্ধে। উহা প্রায় একটি বক্তৃতার আকারেই উপস্থাপিত হয়। বক্তা বিভিন্ন জাতির ভাষা, ধর্ম এবং রীতিনীতি বিশ্লেষণ করিয়া একটি সাধারণ সংস্কৃতভাষা-গোষ্ঠী হইতে উহাদের সকলের উৎপত্তি প্রমাণ করেন।

সভার পর মিঃ কানন্দ 'পোস্ট'-এর জনৈক সংবাদ-দাতাকে বলেন, 'আমি কোন নির্দিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করি না। আমার ভূমিকা একজন পরিদর্শকের এবং যতদূর পারি, আমি মানুষকে শিক্ষা দিবার কার্যে ব্রতী। আমার কাছে সব ধর্মই সুন্দর। জীবন ও জগতের উচ্চতর রহস্য সম্বন্ধে অন্যের মতো আমিও কতগুলি ধারণা উপস্থাপিত করার বেশী আর কিছু করিতে পারি না। আমার মনে হয়, পুনর্জন্মবাদ ধর্ম বিষয়ে আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার একটি যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার খুব কাছাকাছি যায়। কিন্তু ইহাকে আমি একটি ধর্মতত্ত্ব বলিয়া খাড়া করিতে চাই না। বড়জোর ইহা একটি মতবাদ। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া ইহা প্রমাণ করা যায় না। যাঁহার ঐ অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাঁহারই পক্ষে ঐ প্রমাণ কার্যকর। তোমার অভিজ্ঞতা আমার কাছে কিছুই নয়, আমার অভিজ্ঞতাও তোমার নিকট নিষ্ফল। আমি অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাসী নই। ধর্মের ব্যাপারে অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানা আমার নিকট অপ্রীতিকর।

তিনি ইহা অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন

তবে আমার বর্তমান অস্তিত্বের ব্যাখ্যার জন্য আমাকে একটি অতীত ও ভবিষ্যৎ অবস্থায় অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। আর আমরা যদি এই পৃথিবী হইতে চলিয়া যাই, আমাদিগকে নিশ্চয়ই অন্য কোন আকার ধারণ করিতে হইবে। এই দিক দিয়া আমার পুনর্জন্মে বিশ্বাস আসে। তবে আমি ইহা হাতে-নাতে প্রমাণ করিতে পারি না। পুনর্জন্মবাদের বদলে অন্য সুষ্ঠুতর কিছু যদি কেহ আমাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি এই মত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। এ পর্যন্ত আমি নিজে ঐরূপ সন্তোষজনক কিছু খুঁজিয়া পাই নাই।

মিঃ কানন্দ কলিকাতার অধিবাসী এবং ওখানকার রাজকীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট। ইংরেজী যাহাদের মাতৃভাষা, তাহাদের মতোই তিনি ইংরেজী বলিতে পারেন। ঐ ভাষার মাধ্যমেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তিনি ইংরেজ জাতির সহিত ভারতবাসীর সংস্পর্শ লক্ষ্য করিবার প্রচুর সুযোগ পাইয়াছেন। কোন বৈদেশিক মিশনরী কর্মী কানন্দের কথাবার্তা শুনিলে ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী করা বিষয়ে নৈরাশ্য পোষণ করিবেন। এই সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, পাশ্চাত্যের ধর্মশিক্ষা প্রাচ্যের চিন্তাধারার উপর কতদূর কার্যকরী হইয়াছে।' কানন্দ উত্তরে বলেন, 'একটি দেশে নূতন কোন চিন্তাধারা গেলে উহার কিছু না কিছু ফল অবশ্যই ঘটে, তবে প্রাচ্য চিন্তাধারার উপর খ্রীষ্টধর্মের শিক্ষা যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহা এতই সামান্য যে, উহা নজরেই আসে না।' প্রাচ্য চিন্তাধারা এ দেশে যেমন স্বল্পই দাগ রাখে, পাশ্চাত্য মতবাদসমূহেরও প্রাচ্যে ঐরূপ ফল, বরং অতটাও নয়। অর্থাৎ দেশের চিন্তাশীল লোকের উপর উহার কোনই প্রভাব নাই। সাধারণ লোকের ভিতর মিশনরীদের কাজের ফলও অতি সামান্য। যতগুলি ব্যক্তি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়, দেশীয় ধর্মসম্প্রদায় হইতে ততগুলি লোক অবশ্যই কমিয়া যায়, তবে দেশের সমগ্র জনসংখ্যা এত বিপুল যে, মিশনরীদের এই ধর্মান্তরী-করণের পরিমাপ নজরে আসে না।

যোগীরা জাদুকর

যোগিগণ বা অপর পারদর্শিগণের অনুষ্ঠিত অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কথা যাহা শোনা যায়, তিনি ঐ সম্বন্ধে কিছু জানেন কিনা—প্রশ্ন করা হইলে মিঃ কানন্দ বলেন যে, অলৌকিক ঘটনা তাঁহার পছন্দ নয়। দেশে অবশ্য বহু জাদুকর দেখা যায়, তবে উহারা যাহা দেখায় তাহা কৌশল বিশেষ। মিঃ কানন্দ নিজে একবার অল্প মাত্রায় একটি মুসলমান ফকিরের নিকট 'আমের ম্যাজিক' দেখিয়াছেন। লামাদের অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অনুরূপ। মিঃ কানন্দ বলেন, 'এই-সব ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে সুশিক্ষিত বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন বা পক্ষপাতশূন্য লোকের একান্তই অভাব, অতএব তাহাদের দেওয়া বিবরণের কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা, তাহার বিচার করা কঠিন।'

হিন্দু জীবন-দর্শন

'ব্রুকলিন টাইম্‌স্', ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

গত রাত্রে পৌচ গ্যালারিতে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক স্বামী বিবেকানন্দকে একটি অভ্যর্থনা দেওয়া হয়।...অভ্যর্থনার পূর্বে এই বিশিষ্ট অতিথি 'ভারতের ধর্মসমূহ' সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দেন। অন্যান্য নানা বিষয়ের আলোচনা ব্যতীত তিনি বলেন, 'আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি শিখিতে'--ইহাই হইল হিন্দুদের জীবনদর্শন। জ্ঞান-সঞ্চয়েই জীবনের পূর্ণ সুখ। মানবাত্মাকে বিদ্যা ও অভিজ্ঞতা-লাভের উপর প্রীতি আনিতে হইবে। তোমার বাইবেলের জ্ঞানের দ্বারা আমি আমার শাস্ত্র ভাল করিয়া বুঝিতে পারি। সেইরূপ তুমিও তোমার বাইবেল স্পষ্টতরভাবে পড়িতে পারিবে, যদি আমার শাস্ত্রের সহিত তোমার পরিচয় থাকে। একটি ধর্ম সত্য হইলে অন্যান্য ধর্মও নিশ্চয়ই সত্য। একই সত্য বিভিন্ন আকারে অভিব্যক্ত হইয়াছে, আর এই আকারগুলি নির্ভর করে ভিন্ন ভিন্ন জাতির শারীরিক ও মানসিক অবস্থার বৈচিত্র্যের উপর।

আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা যদি জড়বস্তু ও তাহার পরিণাম দ্বারা ব্যাখ্যা করা চলিত, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না। কিন্তু চিন্তাশক্তি যে জড়বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করা যায় না। মানুষের দেহ কতকগুলি প্রবৃত্তি যে বংশানুক্রমে লাভ করে, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই প্রবৃত্তিগুলির অর্থ হইল সেই উপযুক্ত শারীরিক সংহতি, যাহার মাধ্যমে একটি বিশেষ মন নিজস্ব ধারায় কাজ করিবে। জীবাত্মা যে বিশেষ মানসিক সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, উহা তাহার অতীত কর্ম দ্বারা সঞ্জাত। তাহাকে এমন একটি শরীর বাছিয়া লইতে হইবে, যাহা তাহার মানসিক সংস্কারগুলির বিকাশের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী হয়। সাদৃশ্যের নিয়মে ইহা ঘটে। বিজ্ঞানের সহিত ইহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে, কেন-না বিজ্ঞান 'অভ্যাস' দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়। অভ্যাস সৃষ্ট হয় কোন কিছুর পুনঃ পুনঃ ঘটনের

ফলে। অতএব নবজাত আত্মার চারিত্রিক সংস্কারগুলি ব্যাখ্যা করিতে হইলে পূর্বে উহাদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি স্বীকার করা প্রয়োজন। ঐ সংস্কারগুলি তো এই জন্মে উৎপন্ন নয়, অতএব নিশ্চয়ই অতীত জন্ম হইতে উহারা আসিয়াছে।

মানবজাতির বিভিন্ন ধর্মগুলি বিভিন্ন অবস্থা মাত্র। মানবাত্মা যে-সব ধাপ অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে, প্রত্যেকটি ধর্ম যেন এক একটি ধাপ। কোন ধাপকেই অবহেলা করা উচিত নয়। কোনটিই খারাপ বা বিপজ্জনক নয়। সবগুলিই কল্যাণপ্রসূ। শিশু যেমন যুবক হয়, যুবক আবার যেমন পরিণতবয়স্কে রূপান্তরিত হয়, মানুষও সেইরূপ একটি সত্য হইতে অপর সত্যে উপনীত হয়। বিপদ আসে তখনই, যখন এই বিভিন্ন অবস্থার সত্যগুলি অনমনীয় হইয়া দাঁড়ায় এবং আর নড়িতে চায় না। তখন মানুষের আধ্যাত্মিক গতি রুদ্ধ হয়। শিশু যদি না বাড়ে তো বুঝিতে হইবে সে ব্যাধিগ্রস্ত। মানুষ ধর্মের পথে যদি ধীরভাবে ধাপে ধাপে আগাইয়া চলে, তাহা হইলে এই ধাপগুলি ক্রমশঃ তাহাকে পূর্ণ সত্যের উপলব্ধি আনিয়া দিবে। এই জন্য আমরা ঈশ্বরের সগুণ ও নির্গুণ উভয় ভাবই বিশ্বাস করি, আর ঐ সঙ্গে অতীতে যে-সকল ধর্ম ছিল, বর্তমানে যেগুলি বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতে যেগুলি আসিবে—সবগুলিই বিশ্বাস করি। আমাদের আরও বিশ্বাস যে, ধর্মসমূহকে শুধু সহ্য করা নয়, আন্তরিকতার সহিত গ্রহণ করা কর্তব্য।

স্থূল জড় জগতে আমরা দেখিতে পাই—বিস্তারই জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু। কোন কিছুর প্রসারণ থামিয়া গেলে উহার জীবনেরও অবসান ঘটে। নৈতিক ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রয়োগ করিলে বলিতে পারা যায়—যদি কেহ বাঁচিতে চায়, তাহাকে ভালবাসিতেই হইবে। ভালবাসা রুদ্ধ হইলে মৃত্যু অনিবার্য। প্রেমই হইল মানব-প্রকৃতি। তুমি উহাকে কিছুতেই এড়াইতে পার না, কেন-না উহাই জীবনের একমাত্র নিয়ম। অতএব আমাদের কর্তব্য ভালবাসার জন্যই ভগবান্‌কে ভালবাসা, কর্তব্যের জন্যই কর্তব্য সম্পাদন করা, কাজের জন্যই কাজ করা। অন্য কোন প্রত্যাশা যেন আমাদের না থাকে। জানিতে হইবে যে, মানুষ স্বরূপতঃ শুদ্ধ ও পূর্ণ, মানুষই ভগবানের প্রকৃত মন্দির।

'ব্রুকলিন ডেলী ঈগ্‌ল্', ৩১শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪

মহম্মদীয়, বৌদ্ধ এবং ভারতের অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মতগুলির উল্লেখ করিয়া বক্তা বলেন যে, হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম বেদের আপ্তবাণী হইতে লাভ করিয়াছেন। বেদের মতে সৃষ্টি অনাদি ও অনন্ত। মানুষ দেহধারী আত্মা। দেহের মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অবিনাশী। দেহ ধ্বংস হইলেও আত্মা থাকিয়া যাইবেন। আত্মা কোন কিছু হইতে উৎপন্ন হন নাই, কেন-না উৎপত্তি অর্থে কতকগুলি জিনিসের মিলন, আর যাহা কিছু সম্মিলিত, ভবিষ্যতে তাহার বিশ্লেষও সুনিশ্চিত। অতএব আত্মার উদ্ভব স্বীকার করিলে উহার লয়ও অবশ্যম্ভাবী। এই জন্য বলা হয়, আত্মার উৎপত্তি নাই। যদি বলো, আমাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কোন কথা আমরা স্মরণ করিতে পারি না কেন, তাহার ব্যাখ্যা সহজ। আমরা যাহাকে বিষয়ের জ্ঞান বলি, তাহা আমাদের মনঃসমুদ্রের একান্তই উপরকার ব্যাপার। মনের গভীরে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রহিয়াছে।

একটা স্থায়ী কিছু অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষা জাগিল। মন, বুদ্ধি—বস্তুতঃ সারা বিশ্বপ্রকৃতিই তো পরিবর্তনশীল। এমন কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় কিনা, যাহা অসীম অনন্ত—এই প্রশ্ন লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে। এক দার্শনিক সম্প্রদায় —বর্তমান বৌদ্ধগণ যাহার প্রতিনিধি—বলিতেন, যাহা কিছু পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই। প্রত্যেক বস্তু অপর বস্তুনিচয়ের উপর নির্ভর করে; মানুষ একটি স্বাধীন সত্তা—এই ধারণা ভ্রম। পক্ষান্তরে ভাববাদীরা বলেন, প্রত্যেকেই এক-একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি। সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান এই যে, প্রকৃতি অন্যোন্য-নির্ভরতা ও স্বতন্ত্রতা, বাস্তবতা ও ভাব-সত্তা—এই উভয়ের সংমিশ্রণ। পারস্পরিক নির্ভরতার প্রমাণ এই যে, আমাদের শরীরের গতি-সমূহ আমাদের মনের অধীন, মন আবার খ্রীষ্টানরা যাহাকে 'আত্মা' বলে, সেই চৈতন্যসত্তা দ্বারা চালিত। মৃত্যু একটি পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর পর অন্য লোকে গিয়া যে-আত্মারা উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আর যাঁহারা এই পৃথিবীতে রহিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে চৈতন্য-সত্তার দিক দিয়া কোনও পার্থক্য নাই। সেইরূপ অপর লোকে নিম্নগতি-প্রাপ্ত আত্মারাও এখানকার অন্যান্য আত্মার সহিত অভিন্ন। প্রত্যেক মানুষই স্বরূপতঃ পূর্ণ সত্তা। অন্ধকারে বসিয়া 'অন্ধকার, অন্ধকার' বলিয়া পরিতাপ করিলে কোন লাভ নাই;

বরং দেশলাই আনিয়া আলো জ্বালিলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়। সেইরূপ 'আমাদের শরীর সীমাবদ্ধ, আমাদের আত্মা মলিন' বলিয়া বসিয়া বসিয়া অনুশোচনা নিষ্ফল। তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে যদি আবাহন করি, সংশয়ের অন্ধকার কাটিয়া যাইবে। জীবনের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ। খ্রীষ্টানরা হিন্দুদের নিকট শিখিতে পারেন, হিন্দুরাও খ্রীষ্টানদের নিকট।

বক্তা বলেন : তোমাদের সন্তানদের শিখাও যে, ধর্ম হইল একটি প্রত্যক্ষ বস্তু, নেতিবাচক কিছু নয়। ইহা মানুষের শিখানো বুলি নয়, ইহা হইল জীবনের একটি বিস্তার। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে একটি মহৎ সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, যাহা অনবরত বিকশিত হইতে চাহিতেছে। এই বিকাশের নামই ধর্ম। প্রত্যেকটি শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কতকগুলি পূর্বসঞ্চিত অভিজ্ঞতা লইয়া আসে। আমরা আমাদের মধ্যে যে স্বতন্ত্রতার ভাব অনুভব করি, উহা হইতে বুঝা যায় যে, শরীর ও মন ছাড়া আমাদের মধ্যে অপর একটি সত্য রহিয়াছে। শরীর ও মন পরাধীন। কিন্তু আমাদের আত্মা স্বাধীন সত্তা। উহাই আমাদের ভিতরকার মুক্তির ইচ্ছা সৃষ্টি করিতেছে। আমরা যদি স্বরূপতঃ মুক্ত না হইতাম, তাহা হইলে আমরা জগৎকে সৎ ও পূর্ণ করিয়া তুলিবার আশা পোষণ করিতে পারিতাম কি? আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরাই আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ি। আমরা এখন যাহা, তাহা আমাদের নিজেদেরই সৃষ্টি। ইচ্ছা করিলে আমরা আমাদিগকে ভাঙিয়া নূতন করিয়া গড়িতে পারি। আমরা বিশ্বপিতা ভগবান্‌কে বিশ্বাস করি। তিনি তাঁহার সন্তানদের জনক ও পালয়িতা—সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান্, তোমরা যেমন ব্যক্তি-ঈশ্বরকে স্বীকার কর, আমরাও ঐরূপ করি। কিন্তু আমরা ব্যক্তি-ঈশ্বরের পরেও যাইতে চাই, আমরা বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের নির্বিশেষ সত্তার সহিত আমরা স্বরূপতঃ এক। অতীতে যে-সব ধর্ম হইয়াছে, বর্তমানে যেগুলি আছে এবং ভবিষ্যতে যে-সকল ধর্ম উদ্ভূত হইবে, সবগুলির উপরই আমাদের শ্রদ্ধা। ধর্মের প্রত্যেক অভিব্যক্তির প্রতি হিন্দু মাথা নত করেন, কেন-না জগতে কল্যাণকর আদর্শ হইল গ্রহণ—বর্জন নয়। সকল সুন্দর বর্ণের ফুল দিয়া আমরা তোড়া তৈরি করিয়া বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্‌কে উপহার দিব। তিনি যে আমাদের একান্ত আপনার জন। ভালবাসার জন্যই আমরা তাঁহাকে

ভালবাসিব, কর্তব্যের জন্যই তাঁহার প্রতি আমাদের কর্তব্য সাধিব, পূজার জন্যই আমরা তাঁহার পূজা করিব।

ধর্মগ্রন্থসমূহ ভালই, তবে ঐগুলি শুধু মানচিত্রের মতো। ধর একটি বই-এ লেখা আছে, বৎসরে এত ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। একজন যদি আমাকে বইটি নিংড়াইতে বলেন, ঐরূপ করিয়া এক ফোঁটাও জল পাইব না। বই শুধু বৃষ্টির ধারণাটি দেয়; ঠিক সেইরূপ শাস্ত্র, মন্দির, গির্জা প্রভৃতি আমাদিগকে পথের নির্দেশ মাত্র দেয়। যতক্ষণ উহারা আমাদিগকে ধর্মপথে আগাইয়া যাইতে সাহায্য করে, ততক্ষণ উহারা হিতকর। বলিদান, নতজানু হওয়া, স্তোত্রপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণ—এ-সব ধর্মের লক্ষ্য নয়। আমরা যখন যীশুখ্রীষ্টকে সামনা-সামনি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইব, তখনই আমাদের পূর্ণতার উপলব্ধি হইবে। পূর্বোক্ত ক্রিয়াকলাপ যদি আমাদিগকে সেই পূর্ণতা উপলব্ধি করিতে সাহায্য করে, তবেই উহারা ভাল। শাস্ত্রের কথা বা উপদেশ আমাদের উপকারে আসিতে পারে। কলম্বাস এই মহাদেশ আবিষ্কার করিবার পর দেশে ফিরিয়া গিয়া স্বদেশবাসীকে নূতন পৃথিবীর সংবাদ দিলেন। অনেকে বিশ্বাস করিতে চাহিল না। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, নিজেরা গিয়া খুঁজিয়া দেখ। আমরাও সেইরূপ শাস্ত্রের উপদেশ পড়িবার পর যদি নিজেরা সাধনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত সত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে আমরা যে দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করি, তাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না।

বক্তৃতার পর বক্তাকে যে-কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া তাঁহার অভিমত জানিবার সুযোগ উপস্থিত সকলকে দেওয়া হইয়াছিল। অনেকে এই সুযোগ কাজে লাগাইয়াছিলেন।[১]

১ 'স্বামীজীর বাণী ও রচনা'—৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯১, ৪৯৬ 'প্রশ্নোত্তর' দ্রষ্টব্য।

নারীত্বের আদর্শ

'ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ২১শে জানুআরি, ১৮৯৫

'এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্ স্বামী বিবেকানন্দকে শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত পরিচিত করিয়া দিলে তিনি তাঁহার বক্তৃতায় অংশতঃ বলেন :

কোন জাতির বস্তিতে উৎপন্ন জিনিস ঐ জাতিকে বিচার করিবার পরিমাপক নয়। পৃথিবীর সকল আপেল গাছের তলা হইতে কেহ পোকায় খাওয়া সমস্ত পচা আপেল সংগ্রহ করিয়া উহাদের প্রত্যেকটিকে লইয়া এক একখানি বই লিখিতে পারে, তবুও আপেল গাছের সৌন্দর্য এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে তাহার কিছুই জানা নাই, এমনও সম্ভব। জাতির মহত্তম ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের দ্বারাই জাতিকে যথার্থ বিচার করা চলে। যাহারা পতিত, তাহারা তো নিজেরাই একটি শ্রেণীবিশেষ। অতএব কোন একটি রীতিকে বিচার করিবার সময় উহার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি এবং আদর্শ দ্বারাই বিচার করা শুধু সমীচীন নয়, ন্যায্য ও নীতিসঙ্গত।

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম জাতি—ভারতীয় আর্যগণের নিকট নারীত্বের আদর্শ অতি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। আর্যজাতিতে পুরুষ এবং নারী উভয়েই ধর্মাচার্য হইতে পারিতেন। বেদের ভাষায় স্ত্রী ছিলেন স্বামীর সহধর্মিণী[১] অর্থাৎ ধর্মসঙ্গিনী। প্রত্যেক পরিবারে একটি যজ্ঞ-বেদী থাকিত। বিবাহের সময় উহাতে যে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইত, উহা মৃত্যু পর্যন্ত জাগাইয়া রাখা হইত। দম্পতির একজন মারা গেলে উহার শিখা হইতে চিতাগ্নি জ্বালা হইত। স্বামী ও স্ত্রী একত্র গৃহের যজ্ঞাগ্নিতে প্রত্যহ দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতি দিতেন। পত্নীকে ছাড়িয়া পতির একা যজ্ঞে অধিকার ছিল না, কেন-না পত্নীকে স্বামীর অর্ধাঙ্গ মনে করা হইত। অবিবাহিত ব্যক্তি যাজ্ঞিক হইতে পারিতেন না। প্রাচীন রোম ও গ্রীসেও এই নিয়ম প্রচলিত ছিল।

---

১ রিপোর্টে আছে : 'Sabatimini.'

কিন্তু একটি স্বতন্ত্র পৃথক্ পুরোহিত-শ্রেণীর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এই-সকল জাতির ভিতর নারীর ধর্মকৃত্যে সমানাধিকার পিছনে হটিয়া গিয়াছিল। সেমিটিক রক্তসম্ভূত অ্যাসিরীয় জাতির ঘোষণা প্রথমে শোনা গেল: কন্যার কোনও স্বাধীন মত থাকিবে না, বিবাহের পরও তাহাকে কোন অধিকার দেওয়া হইবে না। পারসীকরা এই মত বিশেষভাবে গ্রহণ করিল, পরে তাহাদের মাধ্যমে উহা রোম ও গ্রীসে পৌঁছিল এবং সর্বত্র নারীজাতির উন্নতি ব্যাহত হইতে লাগিল।

আর একটি ব্যাপারও এই ঘটনার জন্য দায়ী—বিবাহ-পদ্ধতির পরিবর্তন। প্রথমে পারিবারিক নিয়ম ছিল জননীর কর্ত্রীত্ব অর্থাৎ মাতা ছিলেন পরিবারের কেন্দ্র। কন্যারা তাঁহার স্থান অধিকার করিত। ইহা হইতে স্ত্রীলোকের বহুবিবাহরূপ আজব প্রথার উদ্ভব হয়। অনেক সময় পাঁচ বা ছয় ভ্রাতা একই স্ত্রীকে বিবাহ করিত। এমনকি বেদেও ইহার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। নিঃসন্তান অবস্থায় কোন পুরুষ মারা গেলে তাঁহার বিধবা পত্নী সন্তান না হওয়া পর্যন্ত অপর একজন পুরুষের সহিত বাস করিতে পারিতেন। সন্তানের দাবি কিন্তু এই পুরুষের থাকিত না। বিধবার মৃত স্বামীই সন্তানের পিতা বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে বিধবার পুনর্বিবাহের প্রচলন হয়। বর্তমান কালে অবশ্য উহা নিষিদ্ধ।

কিন্তু এই-সকল অস্বাভাবিক অভিব্যক্তির পাশাপাশি ব্যক্তিগত পবিত্রতার একটি প্রগাঢ় ভাব জাতি-মানসে দেখা দিতে থাকে। এতৎসম্পর্কিত বিধানগুলি খুবই কঠোর ছিল। প্রত্যেক বালক বা বালিকাকে গুরুগৃহে পাঠানো হইত। বিশ বা ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত উহারা সেখানে বিদ্যা-চর্চায় ব্যাপৃত থাকিত। চরিত্রে লেশমাত্র অশুচিভাব দেখা গেলে প্রায় নিষ্ঠুরভাবেই তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া হইত। জাতির হৃদয়ের এই ব্যক্তিগত শুচিতার ভাব এত গভীর রেখাপাত করিয়াছে যে, উহা যেন একটি বাতিক বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানগণের চিতো (চিতোর)-অবরোধের সময় ইহার একটি সুস্পষ্ট উদাহরণ দেখা যায়। প্রবল আক্রমণের বিরুদ্ধে পুরুষরা নগরীটি অনেকক্ষণ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখা গেল পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তখন নগরীর নারীগণ বাজারে একটি বিরাট অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বলিত করিল। শত্রুপক্ষ নগর-দ্বার ভাঙিয়া ভিতরে

ঢুকিতেই ৭৪,৫০০ কুল-ললনা একসঙ্গে ঐ কুণ্ডে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্ম-বিসর্জন দিল। এই মহৎ দৃষ্টান্তটি ভারতে বর্তমান কাল পর্যন্ত অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। চিঠির খামের উপরে ৭৪॥ সংখ্যাটি লিখিয়া দেওয়ার রীতি আছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যদি কেহ বে-আইনিভাবে ঐ চিঠিটি পড়ে, তাহা হইলে যে মহাপাপ হইতে বাঁচিবার জন্য চিতোরের মহাপ্রাণা নারীকুলকে অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে হইয়াছিল, ঐরূপ অপরাধে সে অপরাধী হইবে।

ইহার (বৈদিক যুগের) পর হইল সন্ন্যাসীদের যুগ, যাহা আসে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের সহিত। বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা দিয়াছিল—গৃহত্যাগী যতিরাই শুধু 'নির্বাণে'র অধিকারী। নির্বাণ হইল কতকটা খ্রীষ্টানদের স্বর্গরাজ্যের মতো। এই শিক্ষার ফলে সারা ভারত যেন সন্ন্যাসীদের একটি বিরাট মঠে পরিণত হইল। সকল মনোযোগ নিবদ্ধ রহিল শুধু একটি মাত্র লক্ষ্যে—একটি মাত্র সংগ্রামে—কি করিয়া পবিত্র থাকা যায়। স্ত্রীলোকের উপর সকল দোষ চাপানো হইল। এমন কি চলতি হিতবচনে পর্যন্ত নারী হইতে সতর্কতার কথা ঢুকিয়া গেল। যথা: নরকের দ্বার কি? এই প্রশ্নটি সাজাইয়া উত্তরে বলা হইল: 'নারী'। আর একটি: এই মাটির সহিত আমাদের বাঁধিয়া রাখে কোন্ শিকল?—'নারী'। অপর একটি: অন্ধ অপেক্ষাও অন্ধ কে?—'যে নারী দ্বারা প্রবঞ্চিত।'

পাশ্চাত্যের মঠসমূহেও অনুরূপ ধারণা দেখা যায়। সন্ন্যাস-প্রথার পরিবিস্তার সব সময়েই স্ত্রীজাতির অবনতি সূচিত করিয়াছে।

কিন্তু অবশেষে নারীত্বের আর একটি ধারণা উদ্ভূত হইল। পাশ্চাত্যে এই ধারণা রূপ নিল পত্নীর আদর্শে, ভারতে জননীর আদর্শে। এই পরিবর্তন শুধু ধর্মযাজকগণের দ্বারা আসিয়াছিল, এরূপ মনে করিও না। আমি জানি, জগতে যাহা কিছু মহৎ ঘটে, ধর্মযাজকেরা তাহার উদ্যোক্তা বলিয়া দাবি করে, কিন্তু এ-দাবি যে ন্যায্য নয়, নিজে একজন ধর্মপ্রচারক হইয়া এ-কথা বলিতে আমার সঙ্কোচ নাই। জগতের সকল ধর্মগুরুর উদ্দেশ্যে আমি সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমি বলিতে বাধ্য যে, পাশ্চাত্যে নারী-প্রগতি ধর্মের মাধ্যমে আসে নাই। জন স্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় ব্যক্তিরা এবং বিপ্লবী ফরাসী দার্শনিকরাই ইহার জনয়িতা। ধর্ম সামান্য

কিছু করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সবটা নয়। বেশী কথা কি, আজিকার দিনেও এশিয়া-মাইনরে খ্রীষ্টান বিশপরা উপপত্নী-গোষ্ঠী রাখেন!

অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রতি যে মনোভাব দেখা যায়, উহাই খ্রীষ্টধর্মের আদর্শানুগ। সামাজিক ও মানসিক উন্নতির বিচারে পাশ্চাত্যদেশীয় ভগিনীগণ হইতে মুসলমান নারীর পার্থক্য বিপুল। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না—মুসলমান নারী অসুখী, কেন-না বাস্তবিকই তাঁহার কোন কষ্ট নাই। ভারতে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া নারী সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করিয়া আসিতেছে। এদেশে কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে সম্পত্তির অধিকার নাও দিতে পারেন, কিন্তু ভারতবর্ষে স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার যাবতীয় বিষয়-সম্পত্তি স্ত্রীর প্রাপ্য—ব্যক্তিগত সম্পত্তি তো সম্পূর্ণভাবে, স্থাবর সম্পত্তি জীবিতকাল পর্যন্ত।

ভারতে পরিবারের কেন্দ্র হইলেন মা। তিনিই আমাদের উচ্চতম আদর্শ। আমরা ভগবান্‌কে বিশ্বজননী বলি, আর গর্ভধারিণী মাতা হইলেন সেই বিশ্বজননীরই প্রতিনিধি। একজন মহিলা-ঋষিই প্রথম ভগবানের সহিত ঐকাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন। বেদের একটি প্রধান সূক্তে তাঁহার অনুভূতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের ঈশ্বর সগুণ এবং নির্গুণ দুই-ই। নির্গুণ যেন পুরুষ, সগুণ প্রকৃতি। তাই আমরা বলি, 'যে হস্তদ্বয় শিশুকে দোল দেয়, তাহাতেই ভগবানের প্রথম প্রকাশ।' যে-জাতক ঈশ্বর-আরাধনার ভিতর দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, সেই হইল আর্য; আর অনার্য সেই, যাহার জন্ম হইয়াছে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মাধ্যমে।

প্রাগ্‌জন্ম প্রভাব-সম্বন্ধীয় এই মতবাদ বর্তমানকালে ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করিতেছে। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই বলিতেছে, 'নিজেকে শুচি এবং শুদ্ধ রাখো।' ভারতবর্ষে শুচিতার ধারণা এত গভীর যে, আমরা এমন কি বিবাহকে পর্যন্ত ব্যভিচার বলিয়া থাকি, যদি না বিবাহ ধর্ম-সাধনায় পরিণত হয়। প্রত্যেক সৎ হিন্দুর সহিত আমিও বিশ্বাস করি যে, আমার জন্মদাত্রী মাতার চরিত্র নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক, এবং সেইজন্য আমার মধ্যে আজ যাহা কিছু প্রশংসনীয়, তাহা তাঁহারই নিকট পাওয়া। ভারতীয় জাতির জীবন-রহস্য ইহাই—এই পবিত্রতা।

প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম

'ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ৪ঠা ফেব্রুআরি, ১৮৯৫

এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডক্টর জেন্‌স্ স্বামী বিবেকানন্দকে বক্তৃতামঞ্চে উপস্থাপিত করিলে তিনি তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করেন। উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে :

বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে হিন্দুদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। যীশুখ্রীষ্ট যেমন প্রচলিত ইহুদী ধর্মের প্রতিপক্ষতা করিয়াছিলেন, বুদ্ধও সেইরূপ ভারতবর্ষের তৎকালীন ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। খ্রীষ্টকে তাঁহার দেশবাসীরা অস্বীকার করিয়াছিল, বুদ্ধ কিন্তু স্বদেশে ঈশ্বরাবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন। যে-সব মন্দিরের দ্বারদেশে বুদ্ধ পৌরোহিত্য-ক্রিয়াকলাপের নিন্দা করিয়াছিলেন, সেই-সকল মন্দিরেই আজ তাঁহার পূজা হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার নামে যে মতবাদ প্রচলিত হইয়াছিল, উহাতে হিন্দুদের আস্থা নাই। বুদ্ধ যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, হিন্দুরা তাহা শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বৌদ্ধেরা যাহা প্রচার করে, তাহা গ্রহণ করিতে তাহারা রাজী নয়। কারণ বুদ্ধের বাণী নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বহু বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছিল। ঐ রঞ্জিত ও বিকৃত বাণীর ভারতীয় ঐতিহ্যের সহিত খাপ খাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

বৌদ্ধধর্মকে পুরাপুরি বুঝিতে হইলে উহা যাহা হইতে উদ্ভূত, আমাদিগকে সেই মূল ধর্মটির দিকে অবশ্যই ফিরিয়া দেখিতে হইবে। বৈদিক গ্রন্থগুলির দুটি ভাগ। প্রথম—কর্মকাণ্ড[১], যাহাতে যাগযজ্ঞের কথা আছে, আর দ্বিতীয় হইল বেদান্ত—যাহা যাগযজ্ঞের নিন্দা করে, দান ও প্রেম শিক্ষা দেয়, মৃত্যুকে বড় করিয়া দেখায় না। বেদবিশ্বাসী যে সম্প্রদায়ের বেদের যে অংশে প্রীতি, সেই অংশই তাহারা গ্রহণ করিয়াছে। অবৈদিকদের মধ্যে চার্বাকপন্থী বা ভারতীয় জড়বাদীরা বিশ্বাস করিত যে, সব কিছু হইল জড়; স্বর্গ, নরক, আত্মা বা ঈশ্বর বলিয়া কিছু নাই। দ্বিতীয় একটি সম্প্রদায়—জৈনগণও নাস্তিক, কিন্তু অত্যন্ত নীতিবাদী। তাহারা ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করিত, কিন্তু আত্মা মানিত।

১ রিপোর্টে আছে : 'Oura makunda' অর্থাৎ Karma-kanda.

আত্মা অধিকতর পূর্ণতার অভিব্যক্তির জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে। এই দুই সম্প্রদায়কে অবৈদিক বলা হইত। তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বৈদিক হইলেও ব্যক্তি-ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিত না। তাহারা বলিত বিশ্বজগতের সব কিছুর জনক হইল পরমাণু বা প্রকৃতি।

অতএব দেখা যাইতেছে, বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতের চিন্তা-জগৎ ছিল বিভক্ত। তাঁহার ধর্মের নির্ভুল ধারণা করিবার জন্য আর একটি বিষয়েরও উল্লেখ প্রয়োজনীয়—উহা হইল সেই সময়কার জাতি-প্রথা। বেদ শিক্ষা দেয় যে, যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনিই ব্রাহ্মণ; যিনি সমাজের সকলকে রক্ষা করেন, তিনি খোক্ত (ক্ষত্রিয়) আর যিনি ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া অন্নসংস্থান করেন, তিনি বিশ (বৈশ্য)। এই সামাজিক বৈচিত্র্যগুলি পরে অত্যন্ত ধরাবাঁধা কঠিন জাতিভেদের ছাঁচে পরিণতি অর্থাৎ অবনতি লাভ করে এবং ক্রমে দৃঢ়-গঠিত সুসম্বদ্ধ একটি পৌরোহিত্য-শাসন সমগ্র জাতির কাঁধে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন ঠিক এই সময়েই। অতএব তাঁহার ধর্মকে ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক সংস্কারের একটি চরম প্রয়াস বলা যাইতে পারে।

সেই সময়ে দেশের আকাশ-বাতাস বাদ-বিতণ্ডায় ভরিয়া আছে। বিশ হাজার অন্ধ পুরোহিত দুই কোটি পরস্পর-বিবদমান অন্ধ মানুষকে পথ দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে! এইরূপ সঙ্কটকালে বুদ্ধের ন্যায় একজন জ্ঞানী পুরুষের প্রচার-কার্য অপেক্ষা জাতির পক্ষে বেশী প্রয়োজনীয় আর কি থাকিতে পারে? তিনি সকলকে শুনাইলেন—'কলহ বন্ধ কর, পুঁথিপত্র তুলিয়া রাখো, নিজের পূর্ণতাকে বিকাশ করিয়া তোল।' জাতি-বিভাগের মূল তথ্যটি বুদ্ধ কখনও প্রতিবাদ করেন নাই, কেন-না উহা সমাজ-জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতারই অভিব্যক্তি এবং সব সময়েই মূল্যবান্। কিন্তু যাহা বংশগত বিশেষ সুবিধার দাবি করে, বুদ্ধ সেই অবনত জাতিপ্রথার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-গণকে তিনি বলিলেন, 'প্রকৃত ব্রাহ্মণেরা লোভ, ক্রোধ এবং পাপকে জয় করিয়া থাকেন। তোমরা কি ঐরূপ করিতে পারিয়াছ? যদি না পারিয়া থাকো, তাহা হইলে আর ভণ্ডামি করিও না। জাতি হইল চরিত্রের একটি অবস্থা, উহা কোন কঠোর গণ্ডীবদ্ধ শ্রেণী নয়। যে-কেহ ভগবান্‌কে জানে ও ভালবাসে, সে-ই যথার্থ ব্রাহ্মণ।' যাগ-যজ্ঞ সম্বন্ধে বুদ্ধ বলিলেন, 'যাগ-যজ্ঞ আমাদিগকে পবিত্র করে, এমন কথা বেদে কোথায় আছে? উহা হয়তো

দেবতাগণকে সুখী করিতে পারে, কিন্তু আমাদের কোন উন্নতি সাধন করে না। অতএব এই-সব নিষ্ফল আড়ম্বরে ক্ষান্তি দিয়া ভগবান্‌কে ভালবাসো এবং পূর্ণতা লাভ করিবার চেষ্টা কর।'

পরবর্তী কালে বুদ্ধের এই-সকল শিক্ষা লোকে বিস্মৃত হয়। ভারতের বাহিরে এমন অনেক দেশে উহা প্রচারিত হয়, যেখানকার অধিবাসীদের এই মহান্ সত্যসমূহ গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না। এই-সকল জাতির বহুতর কুসংস্কার ও কদাচারের সহিত মিশিয়া বুদ্ধবাণী ভারতে ফিরিয়া আসে এবং কিম্ভূতকিমাকার মতসমূহের জন্ম দিতে থাকে। এইভাবে উঠে শূন্যবাদী সম্প্রদায়, যাহার মতে বিশ্বসংসার, ভগবান্ এবং আত্মার কোন মূলভিত্তি নাই। সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল। ক্ষণকালের সম্ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুতেই তাহারা বিশ্বাস করিত না। ইহার ফলে এই মত পরে অতি জঘন্য কদাচারসমূহ সৃষ্টি করে। যাহা হউক উহা তো বুদ্ধের শিক্ষা নয়, বরং তাঁহার শিক্ষার ভয়াবহ অধোগতি মাত্র। হিন্দুজাতি যে ইহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া এই কুশিক্ষাকে দূর করিয়া দিয়াছিল, এজন্য তাহারা অভিনন্দনীয়।

বুদ্ধের প্রত্যেকটি বাণী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্ত-গ্রন্থে এবং অরণ্যের মঠসমূহে লুক্কায়িত সত্যগুলিকে যাঁহারা সকলের গোচরীভূত করিতে চাহিয়াছেন, বুদ্ধ সেই-সকল সন্ন্যাসীর একজন। অবশ্য আমি বিশ্বাস করি না যে, জগৎ এখনও ঐ-সকল সত্যের জন্য প্রস্তুত। লোকে এখনও ধর্মের নিম্নতর অভিব্যক্তিগুলিই চায়, যেখানে ব্যক্তি-ঈশ্বরের উপদেশ আছে। এই কারণেই মৌলিক বৌদ্ধধর্ম জনগণের চিত্তকে বেশীদিন ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তিব্বত ও তাতার দেশগুলি হইতে আমদানী বিকৃত আচারসমূহের প্রচলন যখন হইল, তখনই জনগণ দলে দলে বৌদ্ধধর্মে ভিড়িয়াছিল। মৌলিক বৌদ্ধ-ধর্ম আদৌ শূন্যবাদ নয়। উহা জাতিভেদ ও পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে একটি সংগ্রাম-প্রচেষ্টা মাত্র। বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক ইতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে এবং মানুষে মানুষে বিভেদ-সৃষ্টিকারী আভিজাত্য-প্রথাকে ভাঙিয়া দেয়।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বক্তৃতা শেষ করেন বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করিয়া। তাঁহার ভাষায় বুদ্ধ ছিলেন 'এমন একজন মহাপুরুষ, যাঁহার মনে একটি মাত্র চিন্তাও উঠে নাই বা যাঁহার দ্বারা

একটি মাত্র কাজও সাধিত হয় নাই, যাহা মানুষের হিতসাধন ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যে চালিত। তাঁহার মেধা এবং হৃদয় উভয়ই ছিল বিরাট—তিনি সমুদয় মানবজাতি এবং প্রাণিকুলকে প্রেমে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং কি উচ্চতম দেবদূত, কি নিম্নতম কীটটির জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।' বুদ্ধ কিভাবে জনৈক রাজার যজ্ঞে বলিপ্রদানের উদ্দেশ্যে নীত একটি মেষযূথকে বাঁচাইবার জন্য নিজেকে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়াছিলেন, বক্তা প্রথমে তাহা বর্ণনা করেন। তারপর তিনি চিত্রিত করেন—দুঃখসন্তপ্ত মানুষের ক্রন্দনে ব্যথিত এই মহাপুরুষ কিভাবে স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে ত্যাগ করেন, পরে তাঁহার শিক্ষা ভারতে সর্বজনীনভাবে যখন গৃহীত হইল, তখন কিভাবে তিনি জনৈক নীচকুলোদ্ভব পারিয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তৎপ্রদত্ত শূকর-মাংস আহার করেন এবং উহার ফলে অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

জগতে ভারতের দান

'ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ২৭শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৫

সোমবার রাত্রে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে পায়ারপণ্ট এবং ক্লিণ্টন স্ট্রীটের সংযোগস্থলে লং আইল্যাণ্ড হিস্টরিক্যাল সোসাইটি হলে হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ 'জগতে ভারতের দান' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। শ্রোতৃসংখ্যা বেশীই ছিল।

বক্তা তাঁহার স্বদেশের আশ্চর্য সৌন্দর্যের কথা বলেন—যে-দেশ নীতি, শিল্পকলা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আদিম বিকাশ-ভূমি, যে-দেশের পুত্রদের চরিত্রবত্তা ও কন্যাদের ধর্মনিষ্ঠার কথা বহু বৈদেশিক পর্যটক কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। অতঃপর বক্তা বিশ্বজগতে ভারত কি কি দিয়াছে, তাহা দ্রুত-গতিতে বিস্তারিতভাবে প্রদর্শন করেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে ভারতের দানপ্রসঙ্গে তিনি বলেন, খ্রীষ্টধর্মের উপর ভারত প্রচুর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। যীশুখ্রীষ্টের উপদেশগুলির মূল উৎসের অনুসন্ধান করিলে দেখানো যাইতে পারে, উহা বুদ্ধের বাণীর ভিতর রহিয়াছে।

ইওরোপীয় এবং আমেরিকান গবেষকদের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বক্তা

বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টের মধ্যে বহু সাদৃশ্য প্রদর্শন করেন। যীশুর জন্ম, গৃহত্যাগান্তে নির্জন বাস, অন্তরঙ্গ শিষ্যসংখ্যা এবং তাঁহার নৈতিক শিক্ষা তাঁহার আবির্ভাবের বহু শত বৎসর পূর্বেকার বুদ্ধের জীবনের ঘটনার মতোই। বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, এই মিল কি শুধু একটি আকস্মিক ব্যাপার অথবা বুদ্ধের ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের একটি পূর্বতন আভাস? মনে হয়, পাশ্চাত্যের অধিকাংশ মনীষী দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিতেই সন্তুষ্ট, কিন্তু এমনও কোন কোন পণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নির্ভীকভাবে বলেন, খ্রীষ্টধর্ম সাক্ষাৎ বৌদ্ধধর্ম হইতে প্রসূত, যেমন খ্রীষ্টধর্মের প্রথম বিরুদ্ধবাদী শাখা মনিকাই-বাদকে (Monecian heresy) এখন সর্বসম্মতভাবে বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায়ের শিক্ষা বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম যে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই বিষয়ে আরও অনেক প্রমাণ রহিয়াছে। ভারত-সম্রাট্ অশোকের সম্প্রতি আবিষ্কৃত শিলালিপিতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। অশোক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর লোক। তিনি গ্রীক রাজাদের সহিত সন্ধিপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে যে-সব অঞ্চলে খ্রীষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে, সম্রাট্ অশোকের প্রেরিত প্রচারকগণ সেই-সকল স্থানে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা বিস্তার করিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, খ্রীষ্টধর্মে কি করিয়া ঈশ্বরের ত্রিত্ব-বাদ, অবতারবাদ এবং ভারতীয় নীতি-তত্ত্ব আসিল এবং কেনই বা আমাদের দেশের মন্দিরের পূজার্চনার সহিত তোমাদের ক্যাথলিক গির্জার 'মাস্'[১]-আবৃত্তি এবং 'আশীর্বাদ'[২] প্রভৃতি ধর্মকৃত্যের এত সাদৃশ্য। খ্রীষ্টধর্মের বহু আগে বৌদ্ধধর্মে এই-সকল জিনিস প্রচলিত ছিল। এখন এই তথ্যগুলির উপর নিজদের বিচার-বিবেচনা তোমরা প্রয়োগ করিয়া

---

১ মাস্ (Mass): যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার বারো জন অন্তরঙ্গ শিষ্যসহ শেষ নৈশ ভোজন-(Last Supper) কালে এক টুকরা রুটি ভাঙিয়া বলিয়াছিলেন, ইহা আমার শরীর, এবং পানীয় মদ্যকে তাঁহার দেহের রক্ত বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ক্যাথলিক গির্জায় যীশুখ্রীষ্টের এই শেষ নৈশ ভোজনের স্মরণে রুটি এবং মদ্য বিশেষ পূজাকৃত্যের সহিত আহুতি দেওয়া হয়। পুরোহিতের মন্ত্র ও স্তবাদি উচ্চারণের ফলে অতীন্দ্রিয় শক্তির আবেশে ঐ রুটি ও মদ্য খ্রীষ্টের দিব্যদেহের মাংস ও রক্তে পরিণত হয়, ক্যাথলিক ধর্মমতের ইহা একটি প্রধান বিশ্বাস; ভক্তেরা পরে উহা 'প্রসাদ'-স্বরূপ গ্রহণ করেন। উদ্দেশ্য খ্রীষ্টের বিরাট দেহের সহিত একাত্মতা এবং তাঁহার অভয় ও কৃপা লাভ করা। এই অনুষ্ঠানকে 'মাস্' বলে।

২ আশীর্বাদ (Benediction): ক্যাথলিক গির্জায় উপাসনার পর পুরোহিত বা ধর্মযাজক কর্তৃক উপাসকদের উদ্দেশে উচ্চারিত ঈশ্বরের অভয় ও মঙ্গল আশ্বাস-বাণী।

দেখ। আমরা হিন্দুরা তোমাদের ধর্ম প্রাচীনতর, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি, যদি যথেষ্ট প্রমাণ তোমরা উপস্থিত করিতে পারো। আমরা তো জানি যে, তোমাদের ধর্ম যখন কল্পনাতেও উদ্ভূত হয় নাই, তাহার অন্ততঃ তিনশত বৎসর আগে আমাদের ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহা প্রযোজ্য। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের আর একটি দান বৈজ্ঞানিক-দৃষ্টিসম্পন্ন চিকিৎসকগণ ;' সার উইলিয়ম হাণ্টারের মতে বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কার এবং বিকল কর্ণ ও নাসিকার পুনর্গঠনের উপায় নির্ণয়ের দ্বারা ভারতবর্ষ আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। অঙ্কশাস্ত্রে ভারতের কৃতিত্ব আরও বেশী। বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও বর্তমান বিজ্ঞানের বিজয়গৌরব-স্বরূপ মিশ্রগণিত—ইহাদের সবগুলিই ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হয় ; বর্তমান সভ্যতার প্রধান ভিত্তিপ্রস্তর-স্বরূপ সংখ্যা-দশকও ভারতমনীষার সৃষ্টি। দশটি সংখ্যাবাচক দশমিক (decimal) শব্দ বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষার শব্দ।

দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা এখনও পর্যন্ত অপর যে-কোন জাতি অপেক্ষা অনেক উপরে রহিয়াছি। প্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সঙ্গীতে ভারত জগৎকে দিয়াছে প্রধান সাতটি স্বর এবং স্বরের তিনটি গ্রাম সহ স্বরলিপি-প্রণালী। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দেও আমরা এইরূপ প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত উপভোগ করিয়াছি। ইওরোপে উহা প্রথম আসে মাত্র একাদশ শতাব্দীতে। ভাষা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইহা এখন সর্ববাদিসম্মত যে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা যাবতীয় ইওরোপীয় ভাষার ভিত্তি। এই ভাষাগুলি বিকৃত উচ্চারণ-বিশিষ্ট সংস্কৃত ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমাদের মহাকাব্য কাব্য ও নাটক অপর যে-কোন ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনার সমতুল্য। জার্মানির শ্রেষ্ঠ কবি আমাদের শকুন্তলা-নাটক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে বলিয়াছেন, উহাতে 'স্বর্গ ও পৃথিবী সম্মিলিত'। 'ঈসপ্‌স্ ফেব্‌ল্‌স্' নামক প্রসিদ্ধ গল্পমালা ভারতেরই দান, কেন-না ঈসপ একটি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাঁহার বই-এর উপাদান লইয়াছিলেন। 'অ্যারেবিয়ান নাইটস্' নামক বিখ্যাত কথাসাহিত্য এমনকি 'সিণ্ডারেলা ও বরবটির ডাঁটা' গল্পেরও উৎপত্তি ভারতেই। শিল্পকলার ক্ষেত্রে ভারতই প্রথম তুলা ও লাল রং উৎপাদন করে এবং সর্বপ্রকার অলঙ্কার-নির্মাণেও প্রভূত দক্ষতা দেখায়,

চিনি ভারতেই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছিল। ইংরেজী 'সুগার' কথাটি সংস্কৃত শর্করা হইতে উৎপন্ন। সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাবা তাস ও পাশা খেলা ভারতেই আবিষ্কৃত হয়। বস্তুতঃ সব দিক দিয়া ভারতবর্ষের উৎকর্ষ এত বিরাট ছিল যে, দলে দলে বুভুক্ষু ইওরোপীয় ভাগ্যান্বেষীরা ভারতের সীমান্তে উপস্থিত হইতে থাকে এবং পরোক্ষভাবে এই ঘটনাই পরে আমেরিকা-আবিষ্কারের হেতু হয়।

এখন দেখা যাক—এই-সকলের পরিবর্তে জগৎ ভারতকে কি দিয়াছে। নিন্দা, অভিশাপ ও ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারত-সন্তানদের রুধির-স্রোতের মধ্য দিয়া অপরে তাহার সমৃদ্ধির পথ করিয়া লইয়াছে ভারতকে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত করিয়া এবং ভারতের পুত্রকন্যাগণকে দাসত্বে ঠেলিয়া দিয়া। আর এখন আঘাতের উপর অপমান হানা হইতেছে ভারতে এমন একটি ধর্ম প্রচার করিয়া, যাহা পুষ্ট হইতে পারে শুধু অপর সমস্ত ধর্মের ধ্বংসের উপর। কিন্তু ভারত ভীত নয়। সে কোন জাতির কৃপাভিখারী নয়। আমাদের একমাত্র দোষ এই যে, আমরা অপরকে পদদলিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে পারি না, আমরা বিশ্বাস করি—সত্যের অনন্ত মহিমায়। বিশ্বের নিকট ভারতের বাণী হইল—প্রথমতঃ তাহার মঙ্গলেচ্ছা। অহিতের প্রতিদানে ভারত দিয়া চলে হিত। এই মহৎ আদর্শের উৎপত্তি ভারতেই। ভারত উহা কার্যে পরিণত করিতে জানে। পরিশেষে ভারতের বাণী হইল : প্রশান্তি সাধুতা ধৈর্য ও মৃদুতা আখেরে জয়ী হইবেই। এক সময়ে যাহাদের পৃথিবীতে ছিল বিপুল অধিকার, সেই পরাক্রান্ত গ্রীক জাতি আজ কোথায়? তাহারা বিলুপ্ত। একদা যাহাদের বিজয়ী সৈন্যদলের পদভরে মেদিনী কম্পিত হইত, সেই রোমান জাতিই বা কোথায়? অতীতের গর্ভে। পঞ্চাশ বৎসরে যাহারা এক সময়ে অতলান্তিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়াছিল, সেই আরবরাই বা আজ কোথায়? কোথায় সেই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষের নিষ্ঠুর হত্যাকারী স্প্যানিয়ার্ডগণ? উভয় জাতিই আজ প্রায় বিলুপ্ত, তবে তাহাদের পরবর্তী বংশধরগণের ন্যায়পরতা ও দয়াধর্মের গুণে তাহারা সামূহিক বিনাশ হইতে রক্ষা পাইবে, পুনরায় তাহাদের অভ্যুদয়ের ক্ষণ আসিবে।

বক্তৃতার শেষে স্বামী বিবেকানন্দকে করতালি দ্বারা সাদরে অভিনন্দিত

করা হয়। ভারতের রীতি-নীতি সম্বন্ধে তিনি অনেকগুলি প্রশ্নেরও উত্তর দেন। গতকল্যকার (২৫শে ফেব্রুআরি) 'স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন' পত্রিকায় ভারতবর্ষে বিধবাদের নির্যাতিত হওয়া লইয়া যে উক্তিটি প্রকাশিত হইয়াছে, উহার তিনি স্পষ্টভাবে প্রতিবাদ করেন।

বিবাহের পূর্বে নারীর নিজস্ব সম্পত্তি যদি কিছু থাকে, ভারতীয় আইন অনুসারে স্বামীর মৃত্যুর পর তাহাতে তাঁহার অধিকার তো বজায় থাকিবেই, তা ছাড়া স্বামীর নিকট হইতে তিনি যাহা কিছু পাইয়াছিলেন এবং মৃত স্বামীর সাক্ষাৎ অপর কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে তাঁহার সম্পত্তিও বিধবার দখলে আসিবে। পুরুষের সংখ্যা-ন্যূনতার জন্য ভারতে বিধবারা ক্বচিৎ পুনরায় বিবাহ করেন।

বক্তা আরও উল্লেখ করেন যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকের সহমরণ-প্রথা এবং জগন্নাথের রথচক্রে আত্মবলিদান সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রমাণের জন্য তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে সার উইলিয়ম হাণ্টার প্রণীত 'ভারত সাম্রাজ্যের ইতিহাস' নামক পুস্তকটি দেখিতে বলেন।

ভারতের বালবিধবাগণ

'ডেলী ঈগল্', ২৭শে ফেব্রুআরি, ১৮৯৫

ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে হিস্টরিক্যাল হল-এ হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ সোমবার রাত্রে 'জগতে ভারতবর্ষের দান' সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তা যখন মঞ্চের উপর উঠেন, তখন হলে প্রায় আড়াই শত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্রুকলিন রমাবাঈ সার্কেল-এর সভাপতি মিসেস জেম্স্ ম্যাক্‌কীন কয়েকদিন আগে 'ভারতবর্ষে বালবিধবাদের উপর দুর্ব্যবহার করা হয় না'—বক্তার এই উক্তিটির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানটি ভারতে খ্রীষ্টমতানুগ সেবাকার্য করিয়া থাকেন। বক্তার নিকট এই প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর শুনিবার জন্য শ্রোতৃবৃন্দের খুব আগ্রহ দেখা যায়। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার ভাষণে ঐ বিষয়ের কোন উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে একজন শ্রোতা ঐ প্রসঙ্গটি তুলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন—ঐ

সম্পর্কে তাঁহার কি বলিবার আছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, বালবিধবাদের প্রতি নির্যাতন বা কঠোর ব্যবহার করা হয়—এই সংবাদ সত্য নয়। তিনি আরও বলেন : ইহা ঠিকই যে কোন কোন হিন্দুর বিবাহ হয় খুব অল্প বয়সে। অনেকে কিন্তু বেশ পরিণত বয়সেই বিবাহ করে। কেহ কেহ বা আদৌ বিবাহ করে না। আমার পিতামহের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন তিনি একেবারেই বালক। আমার পিতা বিবাহ করেন চৌদ্দ বৎসর বয়সে। আমার বয়স ত্রিশ বৎসর, আমি এখনও বিবাহ করি নাই। স্বামী মারা গেলে তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি তাঁহার বিধবা পত্নী পান। দরিদ্রের ঘরে বিধবার কষ্ট অন্যান্য দেশে যেমন, ভারতেও সেইরূপ। কখন কখন বৃদ্ধেরা বালিকা বিবাহ করে। এইরূপ বৃদ্ধ স্বামী ধনী হইলে যত শীঘ্র মারা যায়, তাহার বিধবা স্ত্রীর পক্ষে ততই মঙ্গল। আমি ভারতের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু বিধবাদের প্রতি যেরূপ নির্যাতনের কথা প্রচার করা হইতেছে, ঐরূপ একটিও দেখিতে পাই নাই। এক সময়ে আমাদের দেশে এক ধরনের ধর্মোন্মত্ততা ছিল। তখন কখন-কখন বিধবারা মৃত পতির জলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া মৃত্যু বরণ করিতেন। হিন্দু জনসাধারণ যে এই রীতি পছন্দ করিত, তাহা নয়, তবে উহা বন্ধ করিবার চেষ্টাও ছিল না। অবশেষে ব্রিটিশরা ভারত অধিকার করিলে ইহা নিষিদ্ধ হয়। সহমৃতা নারীকে সাধ্বী বলিয়া খুব সম্মান করা হইত। অনেক সময়ে তাঁহাদের স্মৃতিতে স্তম্ভাদি নির্মিত হইত।

হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি

'ব্রুকলিন স্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিয়ন', ৮ই এপ্রিল, ১৮৯৫

গত রাত্রিতে ক্লিণ্টন এভিনিউ-স্থিত পউচ গ্যালারীতে ব্রুকলিন এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের একটি বিশেষ সভায় হিন্দুসন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাই ছিল প্রধান কর্মসূচী। আলোচ্য বিষয় ছিল : 'হিন্দুদের কয়েকটি রীতিনীতি—ঐগুলির তাৎপর্য ও কদর্থ।' প্রশস্ত গ্যালারীটি একটি বৃহৎ জনতায় ভরিয়া গিয়াছিল।

পরিধানে প্রাচ্য পোশাক, উজ্জ্বল চক্ষু এবং মুখে প্রতিভার দীপ্তি লইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশ, উহার অধিবাসী এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে

বলিতে আরম্ভ করিলেন। বক্তা বলেন, শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট তিনি শুধু চান তাঁহার ও তাঁহার স্বদেশের প্রতি ন্যায়দৃষ্টি। তিনি ভাষণের প্রারম্ভে ভারত সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা উপস্থাপিত করিবেন। ভারত একটি দেশ নয়, মহাদেশ। যে-সব পর্যটক কখনও ভারতবর্ষে যান নাই, তাঁহারা উহার সম্বন্ধে অনেক ভুল মত প্রচার করিয়াছেন। ভারতে নয়টি পৃথক্ প্রধান ভাষা আছে এবং প্রাদেশিক উপভাষার সংখ্যা একশতেরও বেশী। বক্তা তাঁহার স্বদেশ সম্বন্ধে যাহারা বই লিখিয়াছেন, তাঁহাদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, এই-সব ব্যক্তির মস্তিষ্ক কুসংস্কার দ্বারা বিকৃত হইয়া গিয়াছে। ইহাদের একটি ধারণা যে, ইহাদের ধর্মের গণ্ডীর বাহিরে প্রত্যেকটি লোক ভয়ানক শয়তান। হিন্দুদের দন্তধাবন-প্রণালীর অনেক সময়ে কদর্থ করা হইয়া থাকে। তাহারা মুখে পশুর লোম বা চামড়া ঢুকাইবার পক্ষপাতী নয় বলিয়া বিশেষ কয়েকটি গাছের ছোট ডাল দিয়া দাঁত পরিষ্কার করে। জনৈক পাশ্চাত্য লেখক এই জন্য লিখিয়াছেন, 'হিন্দুরা প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া একটি গাছ গিলিয়া ফেলে।' বক্তা বলেন যে, হিন্দুবিধবাদের জগন্নাথের রথচক্রের নীচে আত্মবলিদানের রীতি কখনও ছিল না। এই গল্প যে কিভাবে চালু হইল, তাহা বুঝা ভার।

জাতিভেদ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের মন্তব্যগুলি ছিল খুব ব্যাপক এবং চিত্তাকর্ষক। ভারতীয় জাতিপ্রথা উচ্চাবচ শ্রেণীতে বিভক্ত নয়। প্রত্যেকটি জাতিই নিজের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ। জাতিপ্রথা কোন ধর্মকৃত্য নয়, উহা হইল বিভিন্ন কারিগরির বিভাগ-ব্যবস্থা। স্মরণাতীত কাল হইতে উহা মানব-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। বক্তা ব্যাখ্যা করিয়া দেখান—কিভাবে সমাজে প্রথমে কয়েকটি মাত্র নির্দিষ্ট অধিকার বংশানুক্রমিক ছিল। পরে চলিল প্রত্যেকটি শ্রেণীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন এবং বিবাহ ও পানাহারকে সীমাবদ্ধ করা হইল নিজ নিজ শ্রেণীর মধ্যে।

হিন্দুগৃহে খ্রীষ্টান বা মুসলমানের উপস্থিতিতে কি প্রভাব হয়, বক্তা তাহা বর্ণনা করেন। কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি হিন্দুদের ঘরে ঢুকিলে ঘর অশুচি হইয়া যায়। বিধর্মী গৃহে আসিলে গৃহস্বামী প্রায়ই পরে স্নান করিয়া থাকেন। অন্ত্যজ জাতিদের প্রসঙ্গে বক্তা বলেন যে, উহারা সমাজে মেথরের কাজ, ঝাড়ুদারি প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে এবং উহারা গলিত মাংসভোজী। তিনি আরও

বলেন যে, ভারত সম্বন্ধে যে-সকল পাশ্চাত্য লেখক বই লিখিয়াছেন, তাঁহারা সমাজের এই-সকল নিম্নস্তরের লোকের সংস্পর্শেই আসিয়াছেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুদের জীবনের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ঘটে নাই। জাতির নিয়ম-কানুন ভাঙিলে কি শাস্তি হয়, তাহা বক্তা বর্ণনা করেন। শাস্তি শুধু এই যে, নিয়ম-ভঙ্গকারী যে-জাতির অন্তর্ভুক্ত, সেই জাতির মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান ও পানাহার তাঁহার ও তাঁহার সন্তানগণের পক্ষে নিষিদ্ধ। এই সম্পর্কে অন্য যে-সব ধারণা পাশ্চাত্যে প্রচারিত, তাহা অতিরঞ্জিত ও ভুল।

জাতিপ্রথার দোষ দেখাইতে গিয়া বক্তা বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ না দিয়া এই প্রথা জাতির কর্মজীবনে জড়তার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহাতে জনগণের অগ্রগতি সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত হইয়াছে। এই প্রথা সমাজকে পাশবিক রেষারেষি হইতে মুক্ত রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্যদিকে উহা সামাজিক উন্নতি রুদ্ধ করিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধ করিয়া উহা প্রজাবৃদ্ধি ঘটাইয়াছে। জাতিপ্রথার সপক্ষে বক্তা বলেন যে, উহাই সমতা এবং ভ্রাতৃত্বের একমাত্র কার্যকর আদর্শ। কাহারও আর্থিক অবস্থা জাতিতে তাহার উচ্চাবচ স্থানের পরিমাপক নয়। জাতির মধ্যে প্রত্যেকেই সমান। বড় বড় সমাজসংস্কারক-গণের সকলেরই চিন্তায় একটি মস্ত ভুল হইয়াছিল। জাতিপ্রথার যথার্থ উৎপত্তি-সূত্র যে সমাজের একটি বিশিষ্ট পরিবেশ, উহা দেখিতে না পাইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ধর্মের বিধিনিষেধই ঐ প্রথার জনক। বক্তা ইংরেজ ও মুসলমান শাসকগণের দেশকে বেয়নেট, গোলাবারুদ এবং তরবারির সাহায্যে সুসভ্য করিবার চেষ্টার তীব্র নিন্দা করেন। তাঁহার মতে জাতিভেদ দূর করিতে হইলে সামাজিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন এবং দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক প্রণালীর ধ্বংস-সাধন একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, ইহা অপেক্ষা বরং বঙ্গোপসাগরের জলে সকলকে ডুবাইয়া মারা শ্রেয়ঃ। ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হইল তিনটি 'ব'—বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রাণ্ডি। ইহারই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হইয়াছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেণ্টে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। রাশিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে এবং বলিতেছে, 'আমরাও একটু সভ্যতা লইয়া আসি।' ইংলণ্ডের সভ্যতা বিস্তার কিন্তু চলিতেছেই।

সন্ন্যাসী বক্তা মঞ্চের উপর একদিক হইতে অপর দিকে পায়চারি করিতে

করিতে হিন্দুদের প্রতি কিভাবে অবিচার করা হয়, ইহা বর্ণনা করিবার সময় খুব উত্তেজিত হইয়া উঠেন। তাঁহার কথাও বেশ দ্রুত গতিতে চলে। বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুদের কটাক্ষ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা স্বদেশে ফিরিবে শ্যাম্পেন এবং বিজাতীয় নূতন ভাবে পুরাপুরি দীক্ষা লইয়া। বাল্য-বিবাহকে নিন্দা করিবার এত ধুম কেন? না—সাহেবরা বলিয়াছে, উহা খারাপ। হিন্দুগৃহে শাশুড়ী পুত্রবধূকে যদি নিপীড়ন করে তো তাহার কারণ এই যে, পুত্র প্রতিবাদ করে না। বক্তা বলেন, বিদেশীরা যে-কোন সুযোগে হিন্দুদের উপর গালিবর্ষণ করিতে উন্মুখ, কেন-না তাঁহাদের নিজেদের এত বেশী দোষ আছে যে, তাঁহারা উহা ঢাকা দিতে চান। তাঁহার মতে প্রত্যেক জাতিকে নিজের মুক্তি সাধন নিজেই করিতে হইবে, অন্য কেহ উহার সমস্যার সমাধান করিয়া দিতে পারে না।

বিদেশী ভারত-বন্ধুদের প্রসঙ্গে বক্তা জিজ্ঞাসা করেন, আমেরিকায় ডেভিড হেয়ারের কথা কেহ কখনও শুনিয়াছেন কিনা? ইনি ভারতে নারীদের জন্য প্রথম কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের অধিকাংশ শিক্ষা প্রচারের জন্য ব্যয় করেন। বক্তা অনেকগুলি ভারতীয় প্রবাদ-বাক্য শুনান। ঐগুলি আদৌ ইংরেজগণের প্রশংসাসূচক নয়। ভারতের জন্য একটি ব্যাকুল আবেদন প্রকাশ করিয়া তিনি বক্তৃতার সমাপ্তি করেন। তিনি বলেন, 'ভারত যতদিন তাহার নিজের প্রতি ও স্বধর্মের প্রতি খাঁটি থাকিবে, ততদিন কোন আশঙ্কার কারণ নাই। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞানহীন এই ভয়ানক পাশ্চাত্য যখন ভারতে ভণ্ডামি ও নাস্তিকতা রপ্তানি করে, তখনই ভারতের বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানা হয়। ঝুড়ি-ঝুড়ি গালাগালি, গাড়ি-বোঝাই তিরস্কার এবং জাহাজ-ভরতি নিন্দা না পাঠাইয়া অন্তহীন একটি প্রীতির স্রোত লইয়া আসা হউক। আসুন, আমরা সকলে মানুষ হই।'

সংক্ষিপ্ত লিপি-অবলম্বনে

অনুবন্ধ

১৯০০ খৃঃ প্রথমার্ধে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফর্নিয়া রাজ্যের স্যান্ ফ্রান্সিস্কো এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি শহরে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। তন্মধ্যে ১৭টি বক্তৃতা মিস আইডা আনসেল নাম্নী জনৈক মহিলা সাঙ্কেতিক লিপিতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। তিনি ঐ লিপিসঙ্কেত তখন মাত্র শিখিয়াছেন, পারদর্শিতা জন্মে নাই। কাজেই স্বামীজীর কথা জায়গায় জায়গায় ছাড়িয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকই ছিল। মিস আনসেল নিজের অনুধ্যানের জন্যই স্বামীজীর বক্তৃতার সাঙ্কেতিক লিপি লইয়াছিলেন, লিপিগুলি বিস্তার করিয়া পূর্ণ বক্তৃতার আকারে প্রকাশ করিবার কোনও সঙ্কল্প তাঁহার ছিল না। পঞ্চাশ বৎসর লিপিগুলি তাঁহার নোটখাতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকিবার পর অনেকের অনুরোধে দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্বে মিস আনসেল লিপিগুলি বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৭টি বক্তৃতা সম্পূর্ণ করিতে পারেন। এই অংশে অনূদিত বক্তৃতাগুলি মিস আইডা আনসেলের ঐ নোট হইতে প্রস্তুত। স্বামীজী যেমন যেমন বলিয়াছিলেন, লেখিকা হুবহু তাহা বজায় রাখিয়াছেন, ভাষা বা ব্যাকরণ সম্পাদনা করেন নাই। যে-সব স্থানে তিনি নিজে স্বামীজীর কতকগুলি কথা ধরিতে পারেন নাই, সেই জায়গাগুলি কয়েকটি বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। বন্ধনীর মধ্যেকার অংশ স্বামীজীর নিজের উক্তি নয়, তাঁহার কোনও কথার সূত্র ধরিয়া দিবার জন্য লিপিকার কর্তৃক সম্বদ্ধ।

অনুবাদকস্য[১]

---

১ এই অংশটিরও অনুবাদ করিয়াছেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

আত্মা এবং ঈশ্বর

২৩শে মার্চ, ১৯০০ খৃঃ স্যান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত

মানুষকে সর্বপ্রথম যাহা তাহার নিজের অপেক্ষা উচ্চতর শক্তিসমূহের বিষয় চিন্তা করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল, উহা ভয় অথবা কৌতূহল, তাহা আমাদিগের আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।...এই ভাবগুলি হইতে মানুষের মনে বিশেষ বিশেষ পূজার প্রবৃত্তি উদ্ভূত হইয়াছিল। মানবেতিহাসে এমন কোন সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, যখন কোন না কোন প্রকার পূজার আদর্শ বর্তমান নাই। ইহার কারণ কি? কিসে আমাদিগকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর বাহিরে কোন কিছুর উপলব্ধির জন্য এত ব্যাকুল করে? মনোরম প্রাতঃকালের স্পর্শেই হউক অথবা মৃত আত্মার ভয়েই হউক, কেন আমরা অতীন্দ্রিয়ের আবেশ অনুভব করি?...প্রাগৈতিহাসিক যুগে যাইবার প্রয়োজন নাই, কেন-না এই ব্যাপারটি দুই হাজার বৎসর আগেও যেমন ছিল, আজও সেইরূপ বর্তমান। আমরা এখানে পরিতৃপ্তি খুঁজিয়া পাই না। যে অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, প্রচুর ক্ষমতা এবং ধনৈশ্বর্য সত্ত্বেও কিসের যেন একটা অতৃপ্তি আমাদিগকে চঞ্চল করে।

বাসনা অনন্ত। উহার চরিতার্থতা কিন্তু খুবই সীমাবদ্ধ। আমাদের চাওয়ার আর শেষ নাই, কিন্তু যাহা চাই তাহা যখন পাইতে যাই, তখনই সঙ্কট উপস্থিত হয়। আদিম মানুষের ক্ষেত্রেও এইরূপ ঘটিত। তাহার আকাঙ্ক্ষা যদিও ছিল স্বল্প, তবু উহা সে মিটাইতে পারিত না। এখন আমাদের শিল্প-বিজ্ঞানের কত উন্নতি ও বৈচিত্র্য হইয়াছে, তথাপি আমাদের চাহিদা দূর হইতেছে না। একদিকে বাসনা পরিপূর্তির উপায়গুলিকে আমরা নিপুণতর করিয়া চলিয়াছি, অপরদিকে বাসনাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতেছে।

আদিমতম মানুষ যে-সব জিনিস নিজে সম্পন্ন করিতে পারিত না, তাহাদের জন্য স্বভাবতই বাহির হইতে সাহায্য চাহিত।...কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, অথচ উহা পাওয়া যাইতেছে না। অতএব বাহিরের শক্তিসমূহের সহায়তার দিকে তাহাকে তাকাইতে হইত। সে-কালের সেই

অজ্ঞ আদিম মানুষ আর বর্তমানের সুসভ্য মানুষ উভয়েই যখন ভগবানের কাছে কোন বাসনা-পরিপূর্তির জন্য মিনতি করিতেছে, তখন উভয়ে একই পর্যায়ে পড়ে। কোনও পার্থক্য আছে কি? কেহ কেহ হয়তো বলিবেন, না বহু পার্থক্য আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এই ধারণা ভুল। বস্তুতঃ অনেক সময়েই আমরা সমলক্ষণ ব্যাপারসমূহের মধ্যে মনগড়া প্রভেদ খাড়া করি। আদিম মানুষ ও সভ্য মানুষ একই শক্তির নিকট প্রার্থনা জানাইতেছে। ঐ শক্তিকে তুমি ভগবান্ বা আল্লা বা জিহোভা যাহা খুশি বলিতে পারো। মানুষ কিছু চায়, আর নিজের ক্ষমতায় যখন উহা আয়ত্ত করিতে পারে না, তখন কোন এক জনের সাহায্য খুঁজে। এই প্রবৃত্তি আদিম কালে যেমন ছিল, এখনও সেইরূপ রহিয়াছে।...আমরা প্রত্যেকেই আদিম বর্বররূপে পৃথিবীতে আসি, ধীরে ধীরে নিজদিগকে সংস্কৃত করি।...নিজেদের হৃদয় অন্বেষণ করিলে এখানে আমরা প্রত্যেকেই এই সত্যটি ধরিতে পারিব। এখনও আমাদের অসহায়তার ভয় কাটে নাই। বড় বড় কথা আমরা বলিতে পারি, দার্শনিক বলিয়া খ্যাতিও লাভ করিতে পারি, কিন্তু জীবনে যখন আঘাত আসে, তখন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কত দুর্বল, আমাদের সাহায্যের কত প্রয়োজন! যত কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে, আমরা সবগুলিতেই বিশ্বাস করিতে থাকি। অবশ্য এমন কোন কুসংস্কার পৃথিবীতে নাই, যাহার কিছু না কিছু সত্য ভিত্তি আছে। ধরুন আমি যদি সারা মুখ ঢাকিয়া শুধু নাকের ডগাটি দেখাই, তবুও উহা তো আমার মুখেরই একটি অংশ। কুসংস্কার সম্বন্ধেও এইরূপ। একটি বৃহৎ সত্যের ক্ষুদ্র অংশগুলিও তুচ্ছ নয়। দেখুন, মৃতব্যক্তিকে কবর দেওয়া ব্যাপারটি হইতেই ধর্মের নিম্নতম বিকাশ ঘটিয়াছিল।...প্রথমে মৃতদেহকে কাপড়ে জড়াইয়া ঢিবির ভিতর রাখিয়া দেওয়া হইত। মৃতব্যক্তির আত্মা রাত্রে আসিয়া ঢিবিতে বাস করে—ইহাই ছিল প্রচলিত বিশ্বাস।...তারপর আরম্ভ হইল ভূমিতে মৃতদেহ প্রোথিত করিবার রীতি।...কবরস্থানের দরজায় সহস্রদন্তী এক ভীষণা দেবী দাঁড়াইয়া!...ইহার পর আসিল মৃতদেহ দাহ করিবার প্রথা। ধারণা ছিল চিতাগ্নির শিখা আত্মাকে ঊর্ধ্বলোকে লইয়া যায়।...মিশরবাসীরা মৃতের জন্য খাদ্য এবং জল লইয়া যাইত।

ইহার পরবর্তী উল্লেখযোগ্য ভাব হইল গোষ্ঠীগত দেবতাদের ধারণা। একটি গোষ্ঠীর উপাস্য হইলেন এক দেবতা, অপর গোষ্ঠীর আরাধ্য অপর এক-

জন দেবতা। ইহুদী জাতির ঈশ্বর জিহোভা ছিলেন তাহাদের নিজস্ব জাতীয় দেবতা। ইনি অন্যান্য গোষ্ঠীর উপাসিত দেবতাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন এবং তাঁহার আশ্রিত জাতির মঙ্গলের জন্য সব কিছু করিতে পারিতেন। তাঁহার আশ্রিত নয়—এমন একটি সমগ্র জাতিকেও যদি তিনি বিনষ্ট করিতেন, তাহাতে বলিবার কিছু ছিল না, তাহা ন্যায্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। তিনি কিছু দয়াও অবশ্য দেখাইতেন, কিন্তু সে-করুণা একটি ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর প্রতিই সীমাবদ্ধ ছিল।

ক্রমশঃ উচ্চতর আদর্শ দেখা দিল। বিজেতা জাতির যিনি অধিপতি, তাঁহাকে সকল দলপতির উপরে স্থান দেওয়া হইল। তিনি হইলেন দেবতাদেরও দেবতা।...পারসীকরা যখন মিশর জয় করে, তখন পারস্যের সম্রাট্‌কে এইরূপ মনে করা হইত। দেব বা মানুষ কেহই তাঁহার সমকক্ষ নয়। এমন কি সম্রাটের দিকে দৃষ্টিপাত করাও ছিল প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ।

ইহার পর দেখিতে পাই সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের ধারণা—যিনি সকল ক্ষমতার আধার, সর্বজ্ঞ এবং বিশ্বজগতের পালয়িতা। তাঁহার আবাসস্থান হইল স্বর্গ। মানুষের তিনিই বিশেষভাবে আরাধ্য, সর্বাপেক্ষা প্রিয়, কেন-না মানুষের জন্যই তিনি সব কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন। সারা পৃথিবী মানুষের ভোগের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। সূর্য, চন্দ্র, তারাসমূহ তাহারই জন্য।

এই-সব ধারণা যাহাদের, তাহাদের মন আদিম স্তরে রহিয়াছে, বলিতে হইবে। তাহাদের আদৌ সভ্য ও সংস্কৃত বলা চলে না। উচ্চতর ধর্মসমূহের প্রসার হয় গঙ্গা ও ইউফ্রাটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে। ভারতবর্ষের বাহিরে স্বর্গবাসী ঈশ্বর-ধারণার অতিরিক্ত ধর্মের আর কোন গভীরতর বিকাশ আমরা দেখিতে পাই না। ভারতের বাহিরে উচ্চতম ঈশ্বরীয় জ্ঞান বলিতে এ পর্যন্ত ইহাই পাওয়া গিয়াছে। ঈশ্বর স্বর্গে বসিয়া আছেন আর বিশ্বাসীরা মৃত্যুর পর তথায় যাইবে।...আমার বিশ্লেষণে ইহাকে আমাদের একটি অত্যন্ত আদিম ধারণা বলা উচিত। আফ্রিকার মাম্বো-জাম্বো আর এই স্বর্গবাসী পিতা—একই কথা। তিনি জগৎকে চালিত করিতেছেন এবং অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা সর্বত্র পূর্ণ হইতেছে।

প্রাচীন হিব্রুরা স্বর্গকে গ্রাহ্য করিত না। যীশুখ্রীষ্টকে তাহাদের না মানিবার ইহাই ছিল অন্যতম কারণ, কেন-না তিনি মৃত্যুর পর জীবনের

কথা বলিতেন। সংস্কৃত ভাষায় স্বর্গ-শব্দের অর্থ এই পৃথিবীর অতীত স্থান। অতএব পৃথিবীর যত কিছু অশুভ সংশোধনের স্থান হইল স্বর্গ। আদিম মানুষ অশুভের পরোয়া করে না।...অশুভ কেন থাকিবে, ইহা লইয়া সে প্রশ্ন তুলে না।...

...শয়তান-শব্দটি পারসীক।...পারসীক এবং হিন্দুরা ধর্মের ক্ষেত্রে একই আর্যজাতির বিশ্বাস-সমূহের উত্তরাধিকারী। তাহাদের ভাষাতেও ঐক্য ছিল—তবে এক জাতির ভাষায় 'শুভ'বাচক শব্দগুলি অপর জাতির ভাষায় 'অশুভ' বুঝাইত। 'দেব' শব্দটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত শব্দ, উহার অর্থ ঈশ্বর। পারসীক ভাষায় উহার অর্থ হইল শয়তান।...

পরে মানুষের ধর্মবিষয়ক চিন্তা আরও বিকাশপ্রাপ্ত হইলে নানা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইল। ঈশ্বরকে বলা হইতে লাগিল মঙ্গলময়। পারসীকদের মতে বিশ্বসংসারের অধীশ্বর দুই জন—একজন শুভ, অন্যজন অশুভ। প্রথমে সব কিছুই ছিল সুন্দর—চিরবসন্তযুক্ত মনোরম দেশ, মৃত্যুহীন জীবন, ব্যাধিহীন শরীর। অতঃপর আবির্ভাব হইল অশুভের অধিকর্তার। ইনি ভূমি স্পর্শ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আসিল ব্যাধি মৃত্যু আবার মশক ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি 'অনিষ্টকারী' ও হিংস্র জন্তুসমূহ। অতঃপর আর্যগণ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রাচীন আর্যেরা উত্তর অঞ্চলে বহু কাল ছিলেন। ইহুদীরা শয়তানের ধারণা পারসীকদের নিকট হইতে পায়। পারসীকরাও শিক্ষা দিত যে, একদিন এই অশুভ ঈশ্বর বিনষ্ট হইবেন। আমাদের কর্তব্য হইল শুভ ঈশ্বরের পক্ষে থাকিয়া অশুভের অধীশ্বরের সহিত এই চিরন্তন সংঘর্ষে ঈশ্বরের শক্তি বৃদ্ধি করা।...সমস্ত পৃথিবী ভস্মীভূত হইবে এবং প্রত্যেকেই একটি নূতন দেহ পাইবে।

পারসীকদের ধারণা ছিল মন্দ লোকেরাও একদিন পবিত্রতা লাভ করিবে, তখন তাহাদের আর অশুভ প্রবৃত্তি থাকিবে না। আর্যদের প্রকৃতি ছিল স্নেহ-মমতাময় ও কবিত্বপ্রবণ। সেজন্য তাহারা অনন্তকাল নরকাগ্নিতে দহনের কথা ভাবিতে পারিত না। মৃত্যুর পর মানুষের নূতন শরীর হইবে। আর মৃত্যু হইবে না। ভারতের বাহিরে ধর্মের ধারণায় ইহাই হইল চরম উৎকর্ষ। উহার সহিত নৈতিক উপদেশও রহিয়াছে। মানুষের কর্তব্য তিনটি বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া—সচ্চিন্তা, সদ্‌বাক্য এবং সৎকার্য। এই মাত্র। ইহা একটি কার্যকর

ও জ্ঞানগর্ভ ধর্ম। ইহার মধ্যে কিছু কবিত্বেরও আবির্ভাব ঘটিয়াছে, কিন্তু কবিত্ব ও চিন্তাধারার উচ্চতর পরিণতি আছে।

ভারতে বেদের প্রাচীনতম অংশে এই শয়তানের ঈষৎ প্রসঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে তাহার প্রভাব স্থায়ী নয়, একবার দেখা দিয়াই সে যেন গা ঢাকা দিয়াছে। বেদে অশুভের জনক এই শয়তান যেন একটি প্রহার খাইয়া পলায়ন করিয়াছে। ভারত হইতে শয়তান যখন চলিয়া গেল, তখন পারসীকরা তাহাকে গ্রহণ করিল। আমরা তাহাকে পৃথিবী হইতে একেবারে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিতেছি। পারসীকদের ধারণা লইয়া আমরা তাহাকে একটি সুসভ্য ভদ্রলোকে পরিণত করিতে চাই। তাহাকে আমরা একটি নব কলেবর দিব। ভারতে শয়তানের ইতিবৃত্ত এইখানে শেষ হইল।

কিন্তু পরমেশ্বরের ধারণা আগাইয়া চলিল। তবে এখানে আর একটি ঘটনা মনে রাখিতে হইবে। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সঙ্গে মানবীয় প্রতাপের ধারণাও বাড়িয়া চলিয়া অবশেষে পারস্যসম্রাটের মহামহিমায় গিয়া ঠেকিয়াছিল। কিন্তু অন্যদিকে তত্ত্ববিদ্যা ও দর্শনের উদ্ভব হইল। মানুষের আভ্যন্তরীণ সত্য—আত্মার ধারণা দেখা দিল এবং উহার ক্রমবিকাশ ঘটিতে লাগিল। ভারতবর্ষের বাহিরে অন্যান্য জাতির ঈশ্বরের ধারণা একটি বস্তুনিষ্ঠ আকারে গিয়া থামিয়াছিল। ভারত এই ধাপ খানিকটা অতিক্রম করিতে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। এইদেশে (আমেরিকায়) লক্ষ লক্ষ লোক বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরের একটি দেহ আছে।...গোটা সম্প্রদায় এইরূপ বলে। তাহাদের ধারণা, ঈশ্বর সমগ্র জগতের শাসক, কিন্তু একটি বিশেষ স্থান আছে, যেখানে তিনি সশরীরে বাস করিতেছেন। তিনি একটি সিংহাসনের উপর বসিয়া আছেন। সেখানে প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়, সেই রাজাধিরাজের উদ্দেশে গান গাওয়া হয়—যেমন পৃথিবীর মন্দিরে আমরা করি।

ভারতে কিন্তু উপাসকদের যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান ছিল, যাহার ফলে তাহারা ঈশ্বরকে কখনও দেহধারী করিয়া তুলে নাই। ভারতে ব্রহ্মের কোন মন্দির দেখিতে পাইবে না। ইহার কারণ এই যে, আত্মার ধারণা ভারতে সর্বদাই বিদ্যমান ছিল। হিব্রুজাতি কখনও আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন করে নাই। বাইবেলের 'পুরাতন সমাচারে' আত্মার কোনও কথা পাওয়া যায় না। 'নূতন সমাচারে'ই উহা প্রথম দেখি। পারসীকরা ছিল আশ্চর্যরকমে করিতকর্মা, যুদ্ধপ্রিয়,

বিজেতা জাতি। তাহারা যেন বর্তমান ইংরেজদের প্রাচীন সংস্করণ—প্রতিবেশী জাতিদের সহিত সর্বদা যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিতেছে। এই ধরনের ব্যাপারে তাহারা এত ব্যস্ত থাকিত যে, আত্মার সম্বন্ধে চিন্তা করিবার তাহাদের ফুরসত ছিল না।...

আত্মার প্রাচীনতম ধারণা ছিল এই যে, উহা স্থূলদেহের অভ্যন্তরে একটি সূক্ষ্ম শরীর-বিশেষ। স্থূলদেহ বিনাশ পাইলে সূক্ষ্মদেহের আবির্ভাব ঘটে। মিশরদেশে বিশ্বাস ছিল যে, সূক্ষ্মদেহেরও মৃত্যু আছে। স্থূলদেহের বিকার ঘটিলে সূক্ষ্মদেহেরও বিশ্লেষ হইতে থাকে। এইজন্য মিশরের পিরামিড নির্মিত হইয়াছিল—যাহাতে মৃত ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারে, এই আশায়। পিরামিডে রক্ষিত মৃতদেহকে আরক প্রভৃতির সহায়ে সতেজ রাখিবার চেষ্টা করা হইত।...

ভারতবাসীদের মৃতদেহের প্রতি কোন দৃষ্টি নাই। তাহাদের ভাব এই: শবটিকে কোথাও লইয়া গিয়া পুড়াইয়া ফেলা যাক। পুত্রকে পিতার মৃতদেহে অগ্নিসংযোগ করিতে হয়।

মানুষ দুই প্রকৃতির—দৈব ও আসুর। যাহারা দৈব প্রকৃতির, তাহারা নিজদিগকে চৈতন্যময় আত্মা বলিয়া ভাবে। আসুর প্রকৃতির মানুষ মনে করে, তাহারা দেহ। ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণ শিক্ষা দিতেন, শরীরের কোন অপরিণামী সত্তা নাই। 'কোন ব্যক্তি যেমন পুরাতন বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, মানবাত্মাও সেইরূপ জীর্ণদেহ ছাড়িয়া দিয়া আর একটি নূতন দেহ গ্রহণ করে।' আমার ক্ষেত্রে আমার পরিবেষ্টনী ও শিক্ষা-দীক্ষা আমাকে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর বিপরীত দিকে লইয়া যাইবার জন্য উন্মুখ ছিল, কেন-না আমি সদাই মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলাম। উহারা দেহের প্রতি অধিক মনোযোগী।

দেহ হইতে আত্মা তো মাত্র একটি ধাপ। ভারতে আত্মার আদর্শের উপর খুব ঝোঁক দেওয়া হইত। ঈশ্বরের ধারণার সহিত আত্মার ধারণা এক হইয়া গিয়াছিল! আত্মার ধারণাকে যদি প্রসারিত করা যায়, তাহা হইলে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তে আসিতেই হইবে যে, আত্মা নাম ও রূপের অতীত।... ভারতীয় শিক্ষা হইল এই যে, আত্মা নিরবয়ব। যাহা কিছুর আকৃতি আছে, তাহা কোন না কোন সময়ে বিনষ্ট হইবে। জড়ভূত ও শক্তির সমবেত কার্য

বিনা কোন আকৃতির উদ্ভব হইতে পারে না। আর সকল সংহত বস্তুরই তো বিশ্লেষ অবশ্যম্ভাবী। অতএব তোমার আত্মার যদি নাম ও রূপ স্বীকার কর, তবে আর তুমি অমর নও, তুমি মৃত্যুর অধীন। আত্মা যদি স্থূল দেহের অনুরূপ একটি সূক্ষ্মদেহমাত্র হয়, তাহা হইলে আকৃতিমান্ বলিয়া উহা প্রকৃতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতির জন্মমৃত্যুর নিয়মও উহার প্রতি প্রযুক্ত হইবে।··· ভারতের ঋষিরা উপলব্ধি করিয়াছেন—আত্মা মন নয়, সূক্ষ্মদেহও নয়।···

চিন্তাসমূহ নিয়ন্ত্রিত ও সংযত করা যায়।···মনঃসংযমকে কতদূর লইয়া যাওয়া যায়, ভারতীয় যোগীরা তাহা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে সাধনা করিয়াছেন। কঠোর অভ্যাস দ্বারা চিন্তার গতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চল করা যায়। মনই যদি মানুষের প্রকৃত স্বরূপ হইত, তাহা হইলে চিন্তার ঊর্ধ্বে মানুষের মৃত্যু ঘটিত। ধ্যানে চিন্তা বিলুপ্ত হয়, মনের উপাদানগুলিও সর্বতোভাবে স্তিমিত হইয়া যায়। রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসও রুদ্ধ হয়, কিন্তু সাধকের তো মৃত্যু হয় না। যদি চিন্তা-সমষ্টির উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিত, তাহা হইলে ঐরূপ অবস্থায় তাঁহার দেহ-মন-সংঘাতটির বিনাশই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহারা দেখিয়াছেন, ঐরূপ ঘটে না। ইহা পরীক্ষিত সত্য। অতএব তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, মন ও মনের চিন্তারাশি প্রকৃত মানুষ নয়। বিচার করিয়াও দেখা গেল যে, মন কখনও মানুষের আত্মা হইতে পারে না।

আমি চলি, চিন্তা করি, কথা বলি। এই-সমস্ত কাজের মধ্যে একটি একতার সূত্র রহিয়াছে। চিন্তা ও কর্মরাশির অসংখ্য বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সকল বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুস্যূত অপরিবর্তনীয় একটি সত্তা বিরাজ করিতেছে। এই সত্তা কখনও শরীর হইতে পারে না। শরীর তো প্রতি মিনিটে পরিবর্তনশীল। উহা মনও হইতে পারে না, কেন-না মনেও তো অজস্র নূতন নূতন চিন্তা সর্বদাই উঠিতেছে। ঐ একত্বের ভিত্তি শরীর-মনের যুগ্ম সংহতি, ইহাও বলা চলে না। শরীর, মন ও সংহতি প্রকৃতির অন্তর্গত এবং প্রকৃতির নিয়মের অধীন। মন যদি মুক্তই হয়, তাহা হইলে সে···

অতএব যিনি প্রকৃত মানুষ, তিনি প্রকৃতির এলাকার মধ্যে নন। ইনি সেই অপরিবর্তনীয় চৈতন্যময় পুরুষ—যাঁহার দেহ ও মন অবশ্য প্রকৃতির অধীন। ইনি প্রকৃতিকে ব্যবহার করিতেছেন, যেমন তোমরা এই চেয়ারটি, এই কলমটি

এবং এই কালিকে ব্যবহার কর। ইনিও সেইরূপ প্রকৃতির সূক্ষ্ম ও স্থূল আকৃতিকে কাজে লাগাইতেছেন। স্থূল আকৃতি হইল দেহ, সূক্ষ্ম আকৃতি মন। ইনি নিজে নিরবয়ব, সর্বপ্রকার আকৃতিহীন। আকারসমূহ প্রকৃতিতে। প্রকৃতির পারে যিনি, তাঁহার স্থূল বা সূক্ষ্ম—কোনও রূপ থাকিতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই অরূপ। তাঁহাকে সর্বব্যাপীও হইতে হইবে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করা প্রয়োজন। টেবিলের উপর এই গ্লাসটির কথা ধর। গ্লাস একটি আকার, টেবিলটিও একটি আকার। ইহারা যখন ভাঙিয়া যায়, তখন গ্লাসত্বের এবং টেবিলত্বের অনেকখানিই চলিয়া যায়।...

আত্মার কোন রূপ নাই বলিয়া কোন নামও নাই। ইনি যেমন এই গ্লাসটির মধ্যে ঢুকিবেন না, সেইরূপ স্বর্গেও যাইবেন না, নরকেও নয়। যে আধারে ইনি বর্তমান, সেই আধারের রূপ ইনি গ্রহণ করেন। আত্মা যদি দেশে (space) না থাকেন, তাহা হইলে দুইটি কল্প সম্ভবপর। হয় তিনি দেশে অনুস্যূত অথবা দেশ তাঁহাতেই অবস্থিত। তোমার দেহ দেশে অবস্থান করিতেছে বলিয়া তোমার একটি আকার অবশ্যই প্রয়োজন। দেশ আমাদিগকে সীমাবদ্ধ করে, আমাদিগকে যেন বাঁধিয়া ফেলে এবং আমাদিগের উপর একটি আকৃতি চাপাইয়া দেয়। পক্ষান্তরে তুমি যদি দেশে অবস্থান না কর তো দেশ তোমাতেই বিদ্যমান। সকল স্বর্গ, সকল পৃথিবী সেই চৈতন্যময় পুরুষে অবস্থিত।

ঈশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে বাধ্য। ঈশ্বর সর্বত্র বিদ্যমান। 'হস্ত না থাকিলেও তিনি সমস্ত বস্তু ধারণ করেন, পদবিহীন হইলেও তিনি সর্বত্র বিচরণ করেন।'...তিনি নিরাকার, মৃত্যুহীন, অনন্ত। ঈশ্বরের এইরূপ ধারণা বিকাশ-প্রাপ্ত হইল।...তিনি সকল আত্মার অধীশ্বর, যেমন আমারই আত্মা আমার এই দেহের অধিপতি। আমার আত্মা যদি দেহ ছাড়িয়া যান, তাহা হইলে দেহ এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। সেইরূপ পরমাত্মা যদি আমার আত্মা হইতে বিযুক্ত হন, আত্মার অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। তিনি বিশ্বভুবনের স্রষ্টা, আবার যাহা কিছু ধ্বংস হইতেছে, তাহারও সংহর্তা তিনিই। জীবন তাঁহার ছায়া, মৃত্যুও তাঁহার ছায়া।

প্রাচীন ভারতের দার্শনিকগণ মনে করিতেন, এই কলুষিত পৃথিবী মানুষের সমাদরের যোগ্য নয়। কি ভাল, কি মন্দ—কিছুই এখানে চিরস্থায়ী নয়।

আমি পূর্বে বলিয়াছি, শয়তান ভারতে বেশী সুযোগ পায় নাই। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, ধর্মচিন্তায় ভারতবাসী খুব সাহসী ছিল। তাহারা ধর্মের ক্ষেত্রে অবোধ শিশুর ন্যায় আচরণ করিতে চায় নাই। শিশুদের বৈশিষ্ট্য তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ কি? তাহারা সর্বদাই অপরের উপর দোষ চাপাইতে চায়। শিশুমন ভুল করিলে অন্য কাহাকেও দোষী করিতে তৎপর। একদিকে আমরা চেঁচাই—'আমাকে ইহা দাও, উহা দাও।' অন্যদিকে বলি—'আমি ইহা করি নাই। শয়তান আমাকে প্রলোভিত করিয়াছিল। সে-ই ইহার জন্য দায়ী।' ইহাই মানুষের ইতিহাস—দুর্বল মানবজাতির ইতিবৃত্ত!...

মন্দ 'আসিল কেন? জগৎ একটি জঘন্য নোংরা গর্তের মতো কেন? আমরাই ঐরূপ করিয়াছি। অন্য কেহ দোষী নয়। আমরাই আগুনে হাত দিয়াছি বলিয়া হাত পুড়িয়া গিয়াছে। ভগবান্ আমাদিগকে আশীর্বাদ করুন। মানুষ যাহা পাইবার যোগ্য, তাহাই পায়। ভগবান্ তো করুণাময়। আমরা যদি তাঁহার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি আমাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য করেন। তিনি তো নিজেকে আমাদের মধ্যে বিলাইয়া দিতে প্রস্তুত।

ইহাই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী। ভারতবাসীর প্রকৃতি কাব্য-ঘেঁষা। কাব্যের জন্য তাহারা পাগল। তাহাদের দর্শনও কাব্য। যে দর্শনের কথা বলিতেছি, উহা একটি কবিতা। সংস্কৃতভাষায় যাহা কিছু উচ্চচিন্তা, সবই কবিতায় লেখা। তত্ত্ববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা—সবই কাব্য।

হাঁ, আমরাই দায়ী। আমরা দুঃখ পাই কেন? বলিতে পারো, 'আমি জন্মিয়াছি দুঃখীদরিদ্রের ঘরে। সারা জীবন কি কঠোর সংগ্রাম করিয়াছি, তাহা বেশ জানি।' দার্শনিকেরা ইহার উত্তরে বলিবেন: হাঁ এই দুঃখ-ভোগের জন্য তুমিই দায়ী। যে দুঃখ ও দারিদ্র্যের কথা বলিলে, উহা কি অকারণ ঘটিয়াছে বলিতে চাও? তুমি তো যুক্তিবাদী। তোমার জীবনের ঘটনাসমূহের কারণ-পরম্পরা রহিয়াছে। উহার কেন্দ্র তুমিই। তুমিই সর্বক্ষণ তোমার জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেছ।...স্বীয় জীবনের ছাঁচ তোমারই গড়া। তোমার জীবন-গতির জন্য তুমি নিজেই দায়ী। কাহাকেও দোষ দিও না, কোন শয়তানকে আসামী খাড়া করিও না। তাহাতে তোমারই শাস্তির মাত্রা বাড়িবে।...

এক ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচার-সভায় হাজির করা হইল। ঈশ্বর তাহার শাস্তি ঠিক করিলেন—ত্রিশ ঘা বেত। অপর এক ব্যক্তি যে পৃথিবীতে নিজে কিছু উপলব্ধি না করিয়া ধর্মোপদেশ দিত, মৃত্যুর পর ঈশ্বরের বিচার-সভায় নীত হইলে ঈশ্বর হুকুম দিলেন—ইহার নিজের পাপের জন্য ত্রিশ ঘা বেত এবং অপরকে ভুল উপদেশ দিয়াছে বলিয়া আরও পনর ঘা বেত। ধর্মোপদেশ দেওয়ার এই বিপদ। আমার ভাগ্যে কি আছে, আমি জানি না। আমি তো পৃথিবীর সর্বত্র ধর্ম-বক্তৃতা করিয়া বেড়াই। যত লোক আমার উপদেশ শুনিয়াছে, প্রত্যেকের জন্য যদি আমাকে পনর ঘা বেত খাইতে হয়, তবে তো সমূহ বিপদ![১]

আমাদিগকে এই ভাবটি বুঝিতে হইবে—ঈশ্বরের মায়া দৈবী। উহা তাঁহার ক্রিয়াশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, 'আমার এই দৈবী মায়া দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাহারা আমার শরণ লয়, তাহারা মায়াকে অতিক্রম করিতে পারে।' আমরা দেখিতে পাই যে, নিজেদের চেষ্টায় এই মায়ার মহাসমুদ্র পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন, একপ্রকার অসম্ভব। সেই পুরাতন মুরগী ও তার ডিমের প্রশ্ন—কোন্‌টি আগে? যে-কোন কর্ম কর, উহা ফল প্রসব করিবে। কর্মটি কারণ, ফলটি কার্য। কিন্তু ফলটি আবার তোমাকে নূতন কর্মে প্রবৃত্ত করে। এখানে ফলটি হইল কারণ, নূতন কর্মটি হইল কার্য। এইভাবে কার্য-কারণ-পরম্পরা চলিতে থাকে। একবার গতি আরম্ভ হইলে উহার আর বিরতি ঘটে না। ভাল বা মন্দ কোন কাজ করিলে উহার ক্রিয়া শুরু হইয়া যাইবে। উহা থামাইবার উপায় নাই। অতএব এই কর্মবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া অতি কঠিন। কার্য-কারণের নিয়ম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী যদি কেহ থাকেন এবং তিনি যদি আমাদের উপর প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগকে কর্মচক্রের বাহিরে টানিয়া আনিতে পারেন।

আমরা বলি, এইরূপ একজন আছেন। তিনি ঈশ্বর—অসীম করুণাময়। তিনি আছেন বলিয়াই আমাদের মুক্তি সম্ভব। নিজের ইচ্ছাতে কি তুমি মুক্ত হইতে পারো? 'ঈশ্বর-কৃপায় মুক্তি'—এই মতবাদের অন্তর্নিহিত

১ এখানে অনুবাদে খুব স্বাধীনতা লওয়া হইয়াছে। যিনি নোট লইয়াছিলেন, তিনি স্বামীজীর কথা গুলাইয়া ফেলিয়াছেন, মনে হয়।—অনুবাদক

দর্শন বুঝিতে পারিতেছ কি? তোমরা পাশ্চাত্যবাসীরা খুব নিপুণ-বুদ্ধি—কিন্তু যখন তোমরা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিতে বস, তখন সবই বড় জটিল করিয়া তোল। মুক্তি অর্থে যদি প্রকৃতির বাহিরে যাওয়া বুঝায়, তাহা হইলে কর্ম দ্বারা তোমরা কি করিয়া মুক্তিলাভ করিবে? মুক্তির অর্থ ঈশ্বরে অবস্থান। ইহা তখনই সম্ভব, যখন তুমি নিজের আত্মার প্রকৃত স্বরূপ চিনিতে পারো—যে-আত্মা প্রকৃতি ও তাহার যাবতীয় বিকার হইতে পৃথক্। এই আত্মাই ঈশ্বর—বিশ্বপ্রকৃতি এবং জীবসমূহের মধ্যে ওতপ্রোত।

আমার ব্যষ্টি আত্মার সহিত আমার শরীরের যে সম্পর্ক, পরমাত্মার সহিত ব্যষ্টি আত্মাসমূহেরও সেই প্রকার সম্বন্ধ। আমরা ব্যষ্টিরা হইলাম পরমাত্মার দেহ। ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি—তিনই এক। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, কার্য-কারণের নিয়ম প্রকৃতির প্রতিটি অংশে পরিব্যাপ্ত। প্রকৃতির ফাঁসে একবার আটকাইয়া পড়িলে আর বাহির হইয়া আসা যায় না। কার্য-কারণের নিয়মে একবার বদ্ধ হইলে সম্ভাব্য পরিত্রাণ তোমাদের অনুষ্ঠিত সৎকর্ম দ্বারা হইবার নয়। জগতের প্রত্যেকটি মাছির জন্য তোমরা হাসপাতাল নির্মাণ করিতে পারো…এরূপ সৎকর্ম কখনই তোমাদিগকে মুক্তি দিবে না। এই-সব লোক হিতকর কীর্তিকলাপ গড়ে আবার ভাঙে। মুক্তি আসে তাঁহারই সহিত তাদাত্ম্যে, যিনি কখনও প্রকৃতিতে বাঁধা পড়েন নাই, যিনি প্রকৃতির অধীশ্বর। প্রকৃতি তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, তিনিই প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেন। নিয়ম তাঁহাকে চালিত করে না, তাঁহারই ইচ্ছায় নিয়ম চালু হয়।…তিনি নিত্য বর্তমান, তাঁহার করুণার অন্ত নাই। যে মুহূর্তে তুমি তাঁহাকে ঠিক ঠিক খুঁজিবে, সেই মুহূর্তেই তাঁহাকে পাইবে। কেন-না তিনিই যে তোমার প্রকৃত স্বরূপ।

কেন পরমাত্মা আমাদিগকে উদ্ধার করেন নাই? আমরা তাঁহাকে চাই নাই বলিয়া। আমরা তাঁহাকে ছাড়া অন্য সব কিছু চাই। তাঁহার জন্য যখনই প্রগাঢ় ব্যাকুলতা জাগিবে, তখনই তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমরা ভগবান্‌কে বলি, 'প্রভু, আমাকে একটি সুন্দর বাড়ি দাও, আমাকে স্বাস্থ্য দাও, এই বিপদটি কাটাইয়া দাও' ইত্যাদি। মানুষ যখন তাঁহাকে ছাড়া আর কিছুই চায় না, তখনই তিনি দেখা দেন। একটি ভক্তের প্রার্থনা:

'হে প্রভু, ধনী ব্যক্তির স্বর্ণ রৌপ্যের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপর যেমন প্রীতি, তোমার প্রতি আমার সেইরূপই ভালবাসা যেন জাগে। আমি পৃথিবী বা স্বর্গের সুখ চাই না, রূপ-যৌবন চাই না, বিদ্যা-গৌরব চাই না। মুক্তিও চাই না। বার বার যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও আমার ভয় নাই। কিন্তু আমার কাম্য শুধু একটি বস্তু—তোমাকে ভালবাসা—ভালবাসার জন্যই ভালবাসা—যাহার নিকট স্বর্গ অতি তুচ্ছ।'

মানুষ যাহা চায়, তাহাই পায়। যদি সর্বদা শরীরের ধ্যান কর, পুনরায় শরীর ধারণ করিতে হইবে। এই শরীরটি গেলে আবার একটি আসিবে, একটির পর একটি শরীর-পরিগ্রহ চলিতে থাকিবে। জড়ভূতকে ভালবাসিলে জড়ভূতেই আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে। প্রথমে আসে পশুজন্ম। একটি কুকুরকে যখন হাড় কামড়াইতে দেখি, তখন বলি, 'ভগবান্, আমাদিগকে রক্ষা করুন,—যেন কুকুর-জন্ম না হয়!' অত্যন্ত দেহাসক্তির পরিণাম কুকুর বিড়াল হইয়া জন্মানো। আরও যদি অবনত হও, তাহা হইলে খনিজ প্রস্তরাদি হইবে—শুধু জড়পিণ্ড, আর কিছু নয়।...

অপর অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা কোন আপস করিতে যাইবেন না। সত্যকে ধরিয়াই মুক্তিপথে যাওয়া যায়। ইহা হইল আর একটি মূলমন্ত্র।...

মানুষ যখন শয়তানকে লাথি মারিয়া দূর করিয়া দিল, তখনই তাহার যথার্থ আধ্যাত্মিক উন্নতি শুরু হইল। সে সাহসের সহিত খাড়া হইয়া দাঁড়াইল এবং সংসারের দুঃখকষ্টের দায়িত্ব নিজেরই স্কন্ধে লইল। পক্ষান্তরে যখনই সে ভূত-ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়াছে এবং কার্য-কারণের নিয়ম লইয়া মাথা ঘামাইয়াছে, তখনই তাহাকে নতজানু হইয়া কাঁদিয়া বলিতে হইয়াছে, 'প্রভু, আমাকে বাঁচাও। তুমিই তো আমাদের স্রষ্টা ও পিতা, আমাদের পরম বন্ধু।' ইহা কাব্য, তবে আমার মনে হয়, খুব উৎকৃষ্ট কাব্য নয়। ইহা যেন অনন্তকে রূপায়িত করা। প্রত্যেক ভাষায় এইরূপ অসীমকে রূপায়িত করিবার নিদর্শন আছে। কিন্তু এই অনন্ত যথার্থ অনন্ত নন—ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়-স্পৃষ্ট অনন্ত—আমাদের মাংসপেশী-বিধৃত অনন্ত।...

'তাঁহাকে সূর্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র বা তারকারাজি বা বিদ্যুৎও নয়।'[১] ইহা অনন্তের আর একপ্রকার চিত্রণ—নিষেধাত্মক ভাষায়।...

১ কঠ উপ., ২।২।১৫ ; মুঃ উপ., ২।২।১০ ; শ্বেঃ উপ., ৬।১৪

উপনিষদের অধ্যাত্মবাদে অনন্তকে এই ভাবেই চরম বর্ণনা করা হইয়াছে। বেদান্ত পৃথিবীর শুধু শ্রেষ্ঠ দর্শনই নয়, ইহা শ্রেষ্ঠ কাব্যও বটে !···

এখন ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও, বেদের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশের মধ্যে পার্থক্য হইল এই : প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়বেদ্য জগৎ। বহির্জগতের আনন্ত্য, প্রকৃতি ও প্রকৃতির অধিকর্তা—ইহা লইয়াই বেদের প্রথম ভাগের ধর্মকর্ম। দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ বেদান্তের অন্বেষ্টব্য ভিন্ন। এখানে মানব-মনীষা ঐ-সকলকে ছাড়াইয়া গিয়া অভিনব আলোকের সন্ধান পাইয়াছে। দেশগত আনন্ত্যে সে তৃপ্তি পায় নাই। উপনিষদের ঘোষণা : 'স্বতোবর্তমান পরমাত্মা মানুষের ইন্দ্রিয়নিচয়কে বহির্মুখ করিয়া গড়িয়াছেন। যাহাদের দৃষ্টি বাহিরে, তাহারা আন্তর সত্যের সন্ধান পায় না। তবে এমন কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা সত্যকে জানিবার ইচ্ছায় নিজেদের দৃষ্টি ভিতরের দিকে ফিরাইয়া দিয়া অন্তরের অন্তরে প্রত্যগাত্মার মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন।'[১]

আত্মার আনন্ত্য দেশগত আনন্ত্য নয়, এই আনন্ত্যই যথার্থ আনন্ত্য—উহা দেশ ও কালের উর্ধ্বে।···পাশ্চাত্য এই দেশকালাতীত অধ্যাত্মজগতের সন্ধান পায় নাই।···তাহাদের মন বহিঃপ্রকৃতি এবং উহার অধীশ্বরের দিকেই নিয়োজিত। আপন অন্তরে তাকাইয়া হারানো সত্যকে খুঁজিয়া বাহির কর। এই সংসার-স্বপ্ন হইতে মন কি দেবতাদের সহায়তা বিনা জাগিয়া উঠিতে পারে? একবার যদি সংসারের চাকা ঘুরিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে কৃপাময় পরমপিতা আমাদিগকে উহা হইতে বাহির করিয়া না আনিলে আমাদের উপায় নাই।

তবে করুণাময় ভগবানের নিকট গেলেও উহা চরম মুক্তি হইবে না। দাসত্ব দাসত্বই। সোনার শিকলও লোহার শিকলের ন্যায়ই বিপজ্জনক। নিষ্কৃতির পথ আছে কি ?

না, তুমি বদ্ধ নও। কেহই কোন কালে বদ্ধ ছিল না। আত্মা সংসারের অতীত। আত্মাই সব। তুমিই সেই এক। দুই নাই। ঈশ্বর হইলেন মায়ার পর্দায় তোমারই প্রতিবিম্ব। আত্মাই প্রকৃত ঈশ্বর। মানুষ যাঁহাকে অজ্ঞানবশে পূজা করে, তিনি আত্মারই প্রতিবিম্ব। স্বর্গবাসী পিতাকে ভগবান্ বলা হয়। কিন্তু ভগবানের ভগবত্তা কিসে? তিনি তোমার নিজেরই

১ কঠ উপ., ২।১।১

প্রতিবিম্ব বলিয়া। সর্বদা যে তুমি ভগবান্‌কে দেখিতেছ, ইহা বুঝিতে পারিলে কি? তোমার যত বিকাশ ঘটে, সেই প্রতিবিম্বও তত স্পষ্টতর হইতে থাকে।

'একই বৃক্ষে দুইটি সুন্দর পাখি[১] বসিয়া আছে। উপরের পাখিটি হইল স্থির, শান্ত, গম্ভীর। নীচেরটি কিন্তু সদা চঞ্চল—মিষ্ট ও তিক্ত ফল খাইয়া কখনও সুখী, কখনও দুঃখী। —জীবাত্মারূপী নীচের পাখিটি যখন পরমাত্মারূপী উপরের পাখিটিকে নিজের স্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখনই তাহার দুঃখের অবসান হয়।'

…'ঈশ্বর' বলিও না; 'তুমি' বলিও না; বলো 'আমি'। দ্বৈতবাদের ভাষা হইল—'হে ঈশ্বর, তুমি আমার পিতা।' অদ্বৈতের ভাষা হইল: 'আত্মা' আমার নিজের অপেক্ষাও প্রিয়। অন্তরতম সত্যের কোন নাম আমি দিব না। নিকটতম শব্দ যদি কিছু থাকে, তাহা 'আমি'।…

'ঈশ্বরই সত্য। জগৎ স্বপ্নমাত্র। ধন্য আমি যে, আমি এই মুহূর্তে জানিতেছি—আমি চিরকালই মুক্ত ছিলাম, চিরকালই মুক্ত থাকিব। আমি যে পূজা করিতেছি, আমিই উহার লক্ষ্য। প্রকৃতি বা অজ্ঞান কোন কিছুই আমাকে অভিভূত করে নাই। প্রকৃতি আমা হইতে তিরোহিত, দেবতারা আমা হইতে তিরোহিত, পূজা…কুসংস্কার সবই আমা হইতে তিরোহিত। আমি আমাকে জানিতেছি। আমিই সেই অনন্ত। ইনি অমুক ভদ্রলোক, ইনি অমুক মহিলা; দায়িত্ব, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সব বুদ্ধিই লয় পাইয়াছে। আমিই সেই ভূমা। আমার মৃত্যু কি সম্ভবপর, অথবা জন্ম? কাহাকে আমি ভয় করিব? আমিই সেই এক। আমি কি নিজেকে ভয় করিব? অপর কে আছে, যাহা হইতে ত্রাস জন্মিবে? একমাত্র সত্তা আমিই। অপর কিছু নাই। আমিই সব।'

চাই শুধু নিজের চিরমুক্ত স্বরূপের স্মৃতি। কর্ম-সম্পাদ্য মুক্তি খুঁজিও না। ঐ মুক্তি কখনও পাওয়া যায় না। তুমি যে বরাবরই মুক্ত রহিয়াছ।

আবৃত্তি করিয়া চল—'মুক্তোঽহম্'। যদি পরমুহূর্তে মোহ আসে এবং বলিতে হয় 'আমি বদ্ধ'—তাহাতেও পিছাইও না। এই গোটা সম্মোহনটিকেই দূর করিয়া দাও।

১ শ্বে. উপ., ৪।৬; মু. উপ., ৩।১।১

এই তত্ত্ব প্রথমে শুনিতে হয়। শুনিয়া দিনের পর দিন উহা চিন্তা করিতে থাকো। অহোরাত্র মন এই ভাবনা দ্বারা পরিপূর্ণ রাখো।

'আমিই ঐ পরম সত্য। আমিই বিশ্বের অধিপতি। মোহ কখনও ছিল না।' মনের সকল শক্তি দিয়া এইভাবে ধ্যান করিতে থাকো, যত দিন না বাস্তবিক প্রত্যক্ষ কর যে, এই দেওয়ালগুলি, গৃহগুলি, চারিদিকের সব কিছু গলিয়া যাইতেছে, শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় বিষয় অদৃশ্য হইতেছে। 'একাকী আমি দাঁড়াইয়া থাকিব। আমি সেই এক।' চেষ্টা করিয়া চল। ভাবনা কিসের? আমরা চাই মুক্তি; অলৌকিক শক্তি আমাদের কাম্য নয়। সকল পৃথিবী আমরা ত্যাগ করিলাম; সকল স্বর্গ, সকল নরক আমরা তুচ্ছ করিলাম। অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা, এই ঐশ্বর্য, অমুক বিভূতি—এ-সকল লইয়া আমি কি মাথা ঘামাইব? মন বশীভূত হইল কি না হইল—তাহাতেই বা আমার কি আসে যায়? মন যদি দৌড়াইতে চায়, দৌড়াক। আমি তো মন নই, সে যথারুচি চলুক।

সৎ অসৎ দুয়েরই উপর সূর্য সমভাবে কিরণ দেয়। কাহারও চোখের দোষের জন্য সূর্যের কি কোন হানি হয়? 'সোঽহম্। মন যাহা কিছু করে, তাহা আমাকে স্পর্শ করে না। অপরিচ্ছন্ন স্থানে সূর্যের আলোক পড়িলে সূর্য তো তাহা দ্বারা অপবিত্র হয় না। আমি সৎস্বরূপ।'

ইহাই হইল অদ্বৈত-দর্শনের ধর্ম। ইহা কঠিন। কিন্তু সাধন করিয়া চল। সকল কুসংস্কার দূর করিয়া দাও। গুরু বা শাস্ত্র বা দেবতা বিদায় হউন। মন্দির, পুরোহিত, প্রতিমা, অবতার—এমন কি ঈশ্বরকে পর্যন্ত বিদায় দাও। ঈশ্বর বলিয়া যদি কেহ থাকেন, সে ঈশ্বর আমিই। সত্যান্বেষী দার্শনিক-গণ, উত্তিষ্ঠত। অভীঃ। ঈশ্বর ও জগৎরূপ কুসংস্কারের কথা বলিও না। 'সত্যমেব জয়তে'। আর ইহাই সত্য। আমিই অনন্ত।

ধর্মের কুসংস্কারসমূহ অসার কল্পনামাত্র…। এই সমাজ—এই যে আমি তোমাদিগকে সম্মুখে দেখিতেছি, তোমাদের সহিত কথা বলিতেছি,—এ সবই মিথ্যাপ্রতীতি। এ সবই ত্যাগ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখ, তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিক হইতে গেলে কি প্রয়োজন হয়! এই সাধনপ্রণালীকে জ্ঞানযোগ বলে—জ্ঞান বিচারের পথ। অন্যান্য পথ সহজ ও মন্থর…কিন্তু জ্ঞানপথে প্রচণ্ড মনের বল আবশ্যক। দুর্বল ব্যক্তির জন্য ইহা নয়। তোমার বলা চাই:

'আমি আত্মা—নিত্যমুক্ত; আমার কখনও বন্ধন ছিল না। কাল আমাতে বিদ্যমান, আমি কালে নই। আমারই মনে ঈশ্বরের জন্ম। যাঁহাকে পিতা ঈশ্বর অথবা বিশ্বস্রষ্টা ঈশ্বর বলা হয়, তিনি আমারই মানস-সৃষ্ট।'

তোমরা যদি নিজেদের দার্শনিক বলো তো কাজে উহা দেখাও। এই পরম সত্যের অনুধ্যান ও আলোচনা কর। পরস্পর পরস্পরকে এই পথে সাহায্য কর এবং সকল প্রকার কুসংস্কার বর্জন কর।

প্রাণায়াম*

২৮শে মার্চ, ১৯০০ খৃঃ স্যান্ ফ্রান্সিস্কোতে প্রদত্ত

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়ন্ত্রণ-অভ্যাস জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া আসিতেছে। এমন কি ইহা মন্দিরদর্শন বা স্তবস্তোত্রাদি পাঠের মতো ধর্মাচরণের একটি অঙ্গরূপে পরিণত হইয়াছে।...আমি এই বিষয়ের প্রতিপাদ্যগুলি তোমাদের নিকট উপস্থাপিত করিবার চেষ্টা করিব।

তোমাদিগকে আমি বলিয়াছি, ভারতীয় দার্শনিক কিভাবে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দুটি বস্তুতে পর্যবসিত করেন—প্রাণ ও আকাশ। প্রাণ-অর্থে শক্তি। যাহা কিছু গতি বা সম্ভাব্য গতি, চাপ, আকর্ষণ...বিদ্যুৎ, চুম্বকশক্তি, শরীরের ক্রিয়ানিচয়, মনের স্পন্দন প্রভৃতি রূপে প্রকাশ পাইতেছে, সবই সেই এক মূলশক্তি প্রাণের অভিব্যক্তি। প্রাণের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইল—যাহা মস্তিষ্কে বুদ্ধির আলোকরূপে অভিব্যক্ত।...

শরীরে প্রাণের যত কিছু অভিব্যক্তি, তাহার প্রত্যেকটিকে মন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা উচিত।...শরীরকে সম্পূর্ণভাবে মনের অধিকারে আনা চাই। আমাদের সকলের পক্ষে ইহা সম্ভব নয়; বরং আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে ইহার বিপরীতটিই সত্য। যাহা হউক আমাদের লক্ষ্য হইল—মনকে এমনভাবে তৈরি করা, যাহাতে খুশিমতো সে শরীরের প্রত্যেক অংশ শাসন করিতে পারে। ইহাই তত্ত্ববিচার ও দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী। অবশ্য আমরা বাস্তবক্ষেত্রে যখন আসি, তখন ইহা খাটে না। তখন আমরা গাড়িটিকে ঘোড়ার আগে

* Vedanta and the West পত্রিকার ১৯৫৮ নভেম্বর-ডিসেম্বর, সংখ্যায় প্রকাশিত

স্থাপন করিয়া বসি। শরীরই তখন মনের উপর কর্তৃত্ব করে। আঙুলে কেহ চিমটি কাটিলে আমি যন্ত্রণা বোধ করি। দেহেরই প্রভাব মনের উপর চলিতে থাকে। দেহে অবাঞ্ছনীয় কিছু ঘটিলে আমার দুশ্চিন্তার অবধি থাকে না, আমার মনের সাম্যচ্যুতি ঘটে। এই অবস্থায় শরীরই আমাদের মনের প্রভু। আমরা দেহের সহিত এক হইয়া যাই। নিজদিগকে শরীর ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারি না।

তত্ত্বদর্শী আসিয়া আমাদিগকে এই দেহাত্মবুদ্ধির বাহিরে যাইবার পথ দেখান। আমাদের প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দেন। তবে যুক্তিবিচার দ্বারা বুদ্ধিতে ইহা ধারণা করা ও স্বরূপের প্রত্যক্ষানুভূতি—এই দুই-এর সুদীর্ঘ ব্যবধান রহিয়াছে, যেমন একটি বাড়ির নক্সা ও বাস্তব বাড়িটির মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকে। অতএব ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য নানা প্রণালী থাকা চাই। পূর্ববর্তী আলোচনায় আমরা তত্ত্বজ্ঞানের পন্থা অনুশীলন করিতেছিলাম—আত্ম-স্বরূপে দাঁড়াইয়া সব কিছুকে নিয়ন্ত্রিত করা—আত্মার মুক্তস্বভাব ঘোষণা করা—শরীরের সাহায্য না লইয়া শরীরকে জয় করা। ইহা খুবই কঠিন। সকলের জন্য এই পথ নয়। দেহাসক্ত মনের পক্ষে ইহা ধারণা করা দুষ্কর।

কিছু স্থূল সহায়তা পাইলে মন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। মন নিজেই এই চরম আধ্যাত্মিক সত্যের অনুভূতি যদি সম্পাদন করিতে পারে, তাহা হইলে তদপেক্ষা সঙ্গত আর কিছু আছে কি? কিন্তু দুঃখের বিষয়, মন তাহা পারে না। আমাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে স্থূল সাহায্যের প্রয়োজন হয়। রাজযোগের প্রণালী হইল—এই স্থূল সাহায্যগুলি গ্রহণ করা। উহা আমাদের শরীরের ভিতর যে-সব শক্তি ও সামর্থ্য রহিয়াছে, সেগুলিকে কাজে লাগাইয়া কতকগুলি উন্নত মানসিক অবস্থা সৃষ্টি করে এবং মনকে উত্তরোত্তর সবল করিয়া উহাকে তাহার হৃত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিতে সহায়তা করে। কেবল ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া কেহ যদি চরম আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা তো অতি উত্তম। কিন্তু আমরা অনেকেই তো উহা পারি না। সেজন্য আমাদিগকে স্থূল সাহায্য অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ ইচ্ছাশক্তিকে লক্ষ্যপথে লইয়া যাইতে হইবে।

…সমগ্র জগৎ হইল বহুত্বে একত্বের একটি বিপুল নিদর্শন। মাত্র এক

সমষ্টি মন রহিয়াছে। উহারই বিভিন্ন অবস্থা বিভিন্ন নামে পরিচিত। মনরূপ মহাসমুদ্রে ঐগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবর্ত। আমরা একই সময়ে সমষ্টি ও ব্যষ্টি। এইভাবে খেলা চলিতেছে…। বাস্তবপক্ষে একত্বের কখনও বিচ্যুতি ঘটে না। জড় পদার্থ, মন এবং আত্মা—তিনই এক।

এই-সকল বিভিন্ন নাম মাত্র। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু একটিই সত্য আছে, পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্টিকোণ হইতে আমরা উহাকে প্রত্যক্ষ করি। একটি দৃষ্টিকোণে উহা জড়বস্তুরূপে প্রতীত হয়, অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে উহাকেই দেখি মনরূপে, দুই বস্তু কিছু নাই। একজন একটি দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করিয়াছিল। ভয়ে অস্থির হইয়া সে অপর একজনকে সাপটিকে মারিবার জন্য ডাকিতে লাগিল। তাহার স্নায়ুমণ্ডলীতে কম্পন শুরু হইল, বুক ধড়াস ধড়াস করিতে আরম্ভ করিল…। ভয় হইতেই এই-সব লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। অবশেষে সে যখন আবিষ্কার করিল, উহা দড়ি, তখন সব বিকার চলিয়া গেল। আমরাও চিরন্তন সত্য-বস্তুকে এইরূপ নানা মিথ্যা আকারে দেখিতেছি। আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ, আমরা যাহাকে জড় পদার্থ বলি, সে-সবই সেই অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় সত্য-বস্তুই। তবে আমরা যেভাবে দেখিতেছি, উহা তাহা নয়। যে-মন দড়ি দেখিয়া উহাকে সাপ বলিয়া ভাবিয়াছিল, সে-মন যে মোহগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা নয়; তাহা হইলে সে কিছুই দেখিত না। একটি জিনিসকে অপর জিনিস বলিয়া দেখা, একেবারে যাহার অস্তিত্ব নাই—এমন কিছু দেখা নয়। আমরা শরীর দেখিতেছি, অনন্তকে জড়বস্তু বলিয়া মনে করিতেছি।…আমরা সত্যেরই সন্ধান করিতেছি। আমরা কখনও প্রবঞ্চিত নই। সর্বদাই আমরা সত্যকেই জানিতেছি, তবে সত্যের প্রতিচ্ছবি কখন কখন আমাদের কাছে ভুল হইতেছে, এই মাত্র। একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে কেবল একটি বস্তুকেই দেখা চলে। যখন আমি সর্পকে দেখিতেছি, রজ্জু তখন সম্পূর্ণ তিরোহিত। আবার যখন রজ্জু দেখি, তখন সর্প আর নাই। এক সময়ে একটি মাত্র বস্তু প্রত্যক্ষ হইতে পারে।…

আমরা যখন জগৎ দেখিতেছি, তখন ঈশ্বরকে দেখিব কিরূপে? ইহা মনে মনে বেশ ভাবিয়া দেখ। 'জগৎ' অর্থে ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে বহু বস্তু-রূপে প্রতীয়মান ঈশ্বরই। যখন তুমি সাপ দেখিতেছ, তখন দড়ি আর নাই।

যখন চৈতন্য-সত্তার বোধ হইবে, তখন অপর যাহা কিছু সব লোপ পাইবে। তখন আর জড়বস্তুকে দেখিবে না, কেন-না যাহাকে জড়বস্তু বলিতেছিলে, তাহা চৈতন্য ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের ইন্দ্রিয়নিচয়ই বহুর 'অধ্যাস' লইয়া আসে।

জলাশয়ের সহস্র সহস্র তরঙ্গে একই সূর্য প্রতিবিম্বিত হইয়া সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র সূর্যের সৃষ্টি করে। ইন্দ্রিয় দ্বারা যখন আমি ব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকাই, তখন উহাকে জড়বস্তু ও শক্তি বলিয়া ব্যাখ্যান করি। একই সময়ে উহা এক ও বহু। বহু এককে নষ্ট করে না, যেমন মহাসমুদ্রের কোটি কোটি তরঙ্গ সমুদ্রের একত্বকে কখনও ব্যাহত করে না। সর্বদা উহা সেই এক মহাসমুদ্র। যখন জগৎকে দেখিতেছ, মনে রাখিও—আমরা উহাকে জড় বা শক্তি দুইয়েতেই পরিণত করিতে পারি। আমরা যদি কোন বস্তুর বেগ বাড়াইয়া দিই, উহার ভর (mass) কমিয়া যায়…। পক্ষান্তরে ভর বৃদ্ধি করিলে বেগ হ্রাস পায়।…এমন একটি অবস্থায় পৌছানো যায়, যেখানে বস্তুর ভর সম্পূর্ণ লোপ পাইবে।…

জড়কে শক্তির কারণ অথবা শক্তিকে জড়ের কারণ বলা চলে না। উভয়ের সম্পর্ক এমন যে, একটি অপরটির মধ্যে তিরোহিত হয়। একটি তৃতীয় পক্ষ অবশ্যই থাকা প্রয়োজন, উহাই মন। বিশ্বজগৎকে জড় বা শক্তি কোনটি হইতেই উৎপন্ন করা যায় না। মন জড় নয়, শক্তিও নয়, অথচ সর্বদাই জড় ও শক্তিকে প্রসব করিতেছে। আখেরে মন হইতেই সকল শক্তির উদ্ভব। 'বিশ্ব-মন'-এর অর্থ ইহাই—সকল ব্যষ্টি-মনের সংহতি। প্রত্যেক ব্যষ্টি-মন সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, আর সব সৃষ্টি একত্র যোগ করিলে অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চ খাড়া হয়। বহুত্বে একত্ব—একই সময়ে বহু ও এক।

ব্যক্তি-ঈশ্বর হইলেন সকল জীবের সমষ্টি, আবার তাঁহার একটি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যও আছে—যেমন আমাদের দেহে অসংখ্য কোষের সমষ্টি, কিন্তু গোটা দেহটিরও একটি পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

যাহা কিছুর গতি আছে, উহা প্রাণ বা শক্তির অন্তর্গত। এই প্রাণই নক্ষত্র সূর্য চন্দ্রকে ঘুরাইতেছে ; প্রাণই মাধ্যাকর্ষণ……

অতএব প্রকৃতির যাবতীয় শক্তিই বিশ্বমনের সৃষ্টি। আর আমরা ঐ

বিশ্ব-মনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশরূপে ভূমাপ্রকৃতি হইতে প্রাণকে আহরণ করিয়া নিজেদের ব্যষ্টি-প্রকৃতিতে দেহের ক্রিয়া, মনের চিন্তা সৃষ্টি প্রভৃতি কাজে লাগাইতেছি। যদি বলো—চিন্তা সৃষ্টি করা যায় না, তাহা হইলে কুড়ি দিন না খাইয়া দেখ, কিরূপ বোধ হয়।...চিন্তাও আমাদের ভুক্ত খাদ্য দ্বারাই উৎপন্ন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যে-প্রাণ সব কিছুকে চালাইতেছে, উহাকে আমাদের দেহের মধ্যে নিয়ন্ত্রণের নাম 'প্রাণায়াম'। সহজ বুদ্ধিতে আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেহের যাবতীয় ক্রিয়ার মূলে রহিয়াছে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস। নিশ্বাস বন্ধ করিলে দেহের ব্যাপারও রুদ্ধ হইয়া যায়। পুনরায় শ্বাস লইলে ক্রিয়া আরম্ভ হয়। তবে প্রাণায়ামের লক্ষ্য শ্বাস-নিরোধ মাত্র নয়, শ্বাসের পশ্চাতে এক সূক্ষ্মতর শক্তিকে বশে আনা।

জনৈক রাজা মন্ত্রীর প্রতি কোন কারণে অসন্তুষ্ট হইয়া একটি উচ্চ গম্বুজের উপর তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ দেন। মন্ত্রীর স্ত্রী রাত্রে স্বামীর সহিত দেখা করিতে আসিলে মন্ত্রী বলিলেন, 'কান্নাকাটি করিয়া লাভ নাই বরং সুকৌশলে আমাকে একটি দড়ি পাঠাইয়া দিও।' মন্ত্রিপত্নী একটি গুবরে পোকার একটি পায়ে একগাছি রেশমের সুতা বাঁধিয়া উহার মাথায় খানিকটা মধু মাখাইয়া উহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রেশমের সুতার সহিত প্রথমে খানিকটা মোটা সুতা এবং পরে মোটা টোয়াইন সুতার গুটি সংলগ্ন ছিল। টোয়াইনের গুটিটিতে বাঁধা ছিল একগাছি শক্ত মোটা দড়ি। মধুর গন্ধে পোকাটি ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল এবং ক্রমে বুরুজের মাথায় উঠিল। মন্ত্রী পোকাটি ধরিলেন এবং ক্রমশঃ সিল্কের সুতা, মোটা সুতা এবং টোয়াইনের সুতা ধরিয়া মোটা দড়িগাছটি নীচে হইতে উপরে টানিয়া তুলিলেন এবং উহার সাহায্যে বুরুজ হইতে পলায়ন করিলেন। আমাদের দেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস যেন ঐ রেশমী সুতা। উহাকে আয়ত্ত করিলে ক্রমশঃ আমরা স্নায়ুমণ্ডলীরূপ মোটা সুতা এবং চিন্তারূপ টোয়াইনের সুতাকে ধরিতে পারি। অবশেষে আমরা হাতে পাই প্রাণরূপ শক্ত রজ্জু। প্রাণ-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা মুক্তি লাভ করি।

জড়স্তরের বস্তুর সাহায্যে আমাদিগকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর অনুভূতিতে উপস্থিত হইতে হইবে। বিশ্বজগৎ একটিই সত্তা, উহার যে বিন্দুতেই স্পর্শ কর না কেন, সব বিন্দুই ঐ এক বিন্দুরই হেরফের। একটি একতা সর্বত্র অনুস্যূত।

অতএব শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ স্থূল ব্যাপারকে ধরিয়াও সূক্ষ্ম চৈতন্যকে অধিগত করা যায়।

এখন শরীরের যে-সব স্পন্দন আমাদের জ্ঞানগোচর নয়, প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা উহাদিগকে আমরা ক্রমশঃ অনুভব করিতে আরম্ভ করি। আর ঐ-সব স্পন্দন-অনুভবের সঙ্গে উহারা আমাদের বশে আসে। আমরা বীজাকারে নিহিত চিন্তাগুলিকে দেখিতে পাইব এবং উহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারিব। অবশ্য আমাদের সকলেরই যে ইহা সম্পাদনের সুযোগ বা ইচ্ছা বা ধৈর্য বা শ্রদ্ধা আসিবে তাহা নয়, তবে এই-সম্পর্কীয় সাধারণ জ্ঞানও প্রত্যেকের কিছু না কিছু উপকার সাধন করে।

প্রথম সুফল স্বাস্থ্য। আমাদের শতকরা নিরানব্বই জন যথাযথভাবে নিঃশ্বাস লই না। ফুস্‌ফুসে যথেষ্ট বাতাস আমরা টানিয়া লই না। ··· শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিয়মিত করিতে পারিলে শরীর শুদ্ধ হয়, মন শান্ত হয়···। লক্ষ্য করিয়া থাকিবে—মনের যখন শান্তি থাকে—তখন নিঃশ্বাস ধীরে ধীরে এবং তালে তালে পড়িতে থাকে। সেইরূপ নিঃশ্বাসকে যদি স্থির ও ছন্দোবদ্ধ করা যায় তো মনেরও শান্তি আসে। অপরপক্ষে মন যখন উদ্বিগ্ন, তখন নিঃশ্বাসের তালও কাটিয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা নিঃশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে মনের শান্তি অবশ্যই সুলভ্য। মন যদি উত্তেজিত হয়, ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ কর এবং মনকে স্থির করিবার চেষ্টা না করিয়া দশ মিনিট তালে তালে নিঃশ্বাস লইতে থাকো। দেখিবে মন শান্ত হইয়া আসিতেছে। এই ধরনের অভ্যাসগুলি হইল সাধারণ লোকের উপযোগী এবং উপকারী। অপরগুলি যোগীদের জন্য।

গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াগুলি প্রথম ধাপ মাত্র। বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য প্রায় চুরাশীটি আসন আছে। কেহ কেহ প্রাণায়ামকে জীবনের প্রধানতম অনুশীলনরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। নিঃশ্বাসের গতিকে লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা কোন কাজই করেন না। সর্বদা তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে কোন্ নাকে বেশী শ্বাস বহিতেছে। দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে শ্বাসের গতি থাকিলে তাঁহারা কতকগুলি কাজ করিবেন, বামদিকে শ্বাস বহিলে অন্য কতকগুলি কাজ। যখন উভয় নাসাপথেই শ্বাসগতি সমান থাকে, তখন তাঁহারা ভগবদুপাসনা করেন। শ্বাসের এইরূপ অবস্থায় মনঃসংযম সহজ হয়। শ্বাসের দ্বারা দেহের স্নায়ুপ্রবাহকে

ইচ্ছামত শরীরের যে কোন অংশে চালিত করা যায়। কোন অঙ্গ পীড়িত হইলে প্রাণপ্রবাহ সেই অঞ্চলে নিয়োজিত করিয়া পীড়ার উপশম করা চলে।

আরও নানাপ্রকার যৌগিক ক্রিয়া প্রচলিত আছে। কতকগুলি সম্প্রদায় আছে, যাহারা শ্বাস-ব্যাপারকে থামাইয়া রাখিতে চায়। তাহারা এমন কিছু করিবে না, যাহাতে বেশী নিঃশ্বাস লইতে হয়। তাহারা একপ্রকার ধ্যানস্থ হইয়া থাকে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ তখন প্রায় সবই বন্ধ। হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও একপ্রকার স্তব্ধ।…এই সব ক্রিয়ায় খুব বিপদ্ আছে। আরও কতক-গুলি কঠিন ক্রিয়ার উদ্দেশ্য উন্নততর যৌগিক শক্তি লাভ করা। কাহারও চেষ্টা থাকে—শ্বাসরুদ্ধ করিয়া শরীরকে হাল্কা করিয়া ফেলা। তখন তাহারা শূন্যে উঠিতে পারে। আমি কখনও কাহাকেও এইরূপ শূন্যে উঠিতে বা বাতাসে উড়িতে দেখি নাই। তবে বই-এ এইরূপ ক্ষমতার উল্লেখ আছে। এই-সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভান আমি করিতে চাই না। তবে আমি অনেক আশ্চর্য যৌগিক ক্রিয়া দেখিয়াছি।…একবার এক ব্যক্তিকে শূন্য হইতে ফল ও ফুল বাহির করিতে দেখিয়াছিলাম।

…যোগী যোগশক্তি দ্বারা স্বীয় দেহকে এত ক্ষুদ্র করিয়া ফেলিতে পারেন যে, উহা এই দেওয়ালকে ভেদ করিয়া যাইতে পারে। আবার তাঁহার শরীরকে এত ভারী করাও সম্ভব যে, দুই শত লোক তাঁহাকে তুলিতে পারিবে না। যদি ইচ্ছা করেন তো তিনি পাখির ন্যায় আকাশে উড়িয়া যাইবেন। কোন যোগীর কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় ক্ষমতালাভ করা সম্ভব নয়। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে এক যোগী হয়তো সৃষ্টি করিতেন, অপর এক যোগী উহা ধ্বংস করিয়া দিতেন।…যোগবিষয়ক গ্রন্থে এই-সকল কথা আছে। আমার নিজের পক্ষে এই সব বিশ্বাস করা কঠিন, তবে আমি অবিশ্বাসও করি না। নিজের চোখে যে-সব বিষয় দেখিয়াছি, সেইগুলিতে কোন সন্দেহ নাই।……

জগতে জ্ঞান-আহরণ যদি সম্ভবপর হয় তো উহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা নয়, মনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া। পাশ্চাত্যদেশীয়রা বলেন, 'ইহা আমাদের স্বভাব, আমরা উহা বদলাইতে পারি না।' কিন্তু এই প্রকার মনোভাব দ্বারা সামাজিক সমস্যার সমাধান হয় না, জগতেরও কোন উন্নতি ঘটে না।……

বলবান্‌রা সব কিছু গ্রাস করিয়া লইতেছে, দুর্বলেরা দুঃখভোগ করিতেছে। যাহার কাড়িয়া লইবার ক্ষমতা আছে, তাহার লোভেরও সীমা নাই।

বঞ্চিতেরা ধনীর প্রতি প্রবল ঘৃণা লইয়া নিজেদের সুযোগের অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসিবে, তখন তাহাদের আচরণও হইবে অনুরূপ। ইহাই প্রতিদ্বন্দ্বিতার রীতি, অনিয়ন্ত্রিত ভোগপ্রবৃত্তির পরিণাম। সমস্যার সমাধান হইতে পারে শুধু মানুষের মনকে সুপরিচালিত করিয়া।...মানুষ যাহা করিতে চায় না, তাহা তাহাকে আইনের জোরে করানো যায় না।.. সে যদি আন্তরিক সৎ হইতে চায়, তবেই সে সৎ হইতে পারে। আইন-আদালত কখন তাহাকে সৎপথে আনিতে পারে না।

মানুষের মনেই সকল জ্ঞান। একটি পাথরে কে জ্ঞান দেখিয়াছে? জ্যোতির্বিদ্যা কি তারাগুলিতে? মানুষই জ্ঞানের আধার। আসুন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমরা অনন্ত শক্তিস্বরূপ। মনের ক্ষমতার সীমা কে টানিতে পারে? আমরা সকলেই সেই অনন্ত মনস্বরূপ, আসুন আমরা ইহা অনুভব করি। প্রত্যেকটি জলবিন্দুর সহিত সমগ্র মহাসমুদ্রটি রহিয়াছে। মানুষের মন ঐ মহাসমুদ্রের মতো। ভারত-মনীষা মনের এই শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির আলোচনা করিয়াছে এবং উহাদের বিকাশ-সাধনে সে তৎপর। পূর্ণতার উপলব্ধি সময়-সাপেক্ষ। ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করা চাই। যদি পঞ্চাশ হাজার বৎসরও লাগে, তাহাতেই বা কি? মানুষ যদি স্বেচ্ছায় তাহার মনের মোড় ফিরাইয়া পূর্ণতার অভিলাষী হয়, তবেই পূর্ণতার উপলব্ধি সম্ভবপর।

রাজযোগে বিঘোষিত সব বিষয়ে তোমাদের বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন নাই। তবে একটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, উহা হইল মানুষের দেবত্ব-লাভের সামর্থ্য। মানুষ যখন তাহার নিজের মনের চিন্তাসমূহের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব অর্জন করে, তখনই ঐ দেবত্ব-বিকাশ সম্ভবপর।......মনের ভাবনা ও ইন্দ্রিয়সমূহ আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য, আমার চালক নয়—এইরূপ অবস্থা আসা চাই, তবেই সব অশুভ লোপ পাইবে।...

মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়া ভরিয়া রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করিয়া তোলা এবং উহাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—ইহাই হইল শিক্ষার আদর্শ। মনকে যদি একটি বিন্দুতে একাগ্র করিতে চাই, উহা সেখানে যাইবে; আবার যে মুহূর্তে আমি উহাকে ডাক দিব, উহা সেই বিন্দু হইতে যেন ফিরিয়া আসিতে পারে।...

ইহাই বিষম সঙ্কট। অনেক কষ্টে আমরা কিছু একাগ্রতার শক্তি লাভ

করি। মন কতকগুলি বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনাসক্তির ক্ষমতা আমরা অর্জন করি না। মনকে একটি বিষয় হইতে ইচ্ছা-মতো টানিয়া আনিতে পারি না, এমন কি অর্ধেক জীবন দিতে রাজী হইলেও না।

মনকে একাগ্র করা ও বিযুক্ত করা—দুই ক্ষমতাই আমাদের থাকা প্রয়োজন। ব্যক্তি এই দুইটিতেই নিপুণ তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছেন। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছাড় খাইতেছে শুনিলেও তিনি দুঃখী হইবেন না। এইরূপ স্থিরতা কি পুঁথি পড়িয়া লাভ করা যায়? রাশি রাশি বই পড়িতে পারো,... শিশুর মাথায় এক মুহূর্তে পনর হাজার শব্দ ঢুকাইয়া দিতে পারো, যতকিছু মতবাদ, যতকিছু দর্শন আছে, সব তাহাকে শিখাইতে পারো...মাত্র একটি বিজ্ঞান আছে, যাহা দ্বারা মনের প্রভুত্ব লাভ করা যায়—মনোবিদ্যা... প্রাণায়াম হইতেই ইহার আরম্ভ।

ধীরে এবং ক্রমে ক্রমে মনের বিভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিতে পারা যায় এবং অবশেষে মন বশে আসে। ইহা সুদীর্ঘ অভ্যাসের ব্যাপার। হাল্কা কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য ইহা কখনই অভ্যাস করা উচিত নয়। যাহার যথার্থ আগ্রহ আছে, সে একটি নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসরণ করে। রাজযোগ কোন বিশ্বাস, মতবাদ বা ঈশ্বরের কথা বলে না। যদি তোমার দুই হাজার দেবতার উপর আস্থা থাকে, বেশ তো ঐ বিশ্বাসের পথেই চল না। ক্ষতি কি? কিন্তু রাজযোগে পাওয়া যায় ব্যক্তি-সম্পর্কশূন্য তত্ত্ব।

মহা মুশকিল এই যে, আমরা বচন ও মতবাদ ঝাড়িতে বৃহস্পতি। কিন্তু এই বাক্যের বোঝা অধিকাংশ মানুষকে কোনই সাহায্য করে না। তাহাদের প্রয়োজন বাস্তব জিনিসের সংস্পর্শ। বড় বড় দার্শনিক তত্ত্বের কথা বলিলে তাহারা ধারণা করিতে পারিবে না, তাহাদের মাথা গুলাইয়া যাইবে। সরল শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাসের কথা অল্প অল্প করিয়া শিক্ষা দিলে বরং তাহারা বুঝিতে পারিবে এবং অভ্যাস করিয়া আনন্দও পাইবে। ধর্মের ইহা প্রাথমিক পাঠ। শ্বাসপ্রশ্বাসের অভ্যাস দ্বারা প্রচুর উপকার হইবে। আমার মিনতি—আপনারা শুধু উপর উপর কৌতূহলী হইবেন না। কয়েকদিন অভ্যাস করিয়া দেখুন। যদি ফল না পান, আসিয়া আমাকে গালি দিবেন।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি পুঞ্জীভূত শক্তি। ঐ মহাশক্তি প্রতি বিন্দুতে বর্তমান।

উহার এক কণাই আমাদের সকলের পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি আমরা জানি কি করিয়া উহা আয়ত্ত করা যায়।...

'অমুক কাজ আমাকে করিতেই হইবে'—এই বুদ্ধিই আমাদিগকে নষ্ট করিতেছে, ইহা ক্রীতদাসের বুদ্ধি।...আমি তো চিরমুক্ত। আমার আবার কর্তব্যের বন্ধন কি? আমি যাহা করি, তাহা আমার খেলা। একটু আমোদ করিয়া লই···এই পর্যন্ত।···

প্রেতাত্মারা দুর্বল। তাহারা আমাদের নিকট হইতে কিছু প্রাণশক্তি পাইতে চেষ্টা করিতেছে।···

একটি মন হইতে অপর মনে আধ্যাত্মিক তেজ সংক্রমিত করা যায়। যিনি দেন, তিনি গুরু; যে গ্রহণ করে, সে শিষ্য। এইভাবেই পৃথিবীতে আধ্যাত্মিক শক্তি বিকীর্ণ হয়।

মৃত্যুর সময় ইন্দ্রিয়সমূহ মনে লয় পায়, মন লীন হয় প্রাণে। আত্মা দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময় মন ও প্রাণের খানিকটা অংশ সঙ্গে লইয়া যান। সূক্ষ্ম-দেহের ধারক হিসাবে কিছু সূক্ষ্ম উপাদানও নেন। কোন প্রকার বাহন ব্যতীত প্রাণ থাকিতে পারে না।···প্রাণ সংস্কারসমূহে আশ্রয় পায়। নূতন শরীর পরিগ্রহ-কালে উহা পুনরায় পৃথক্ হয়। যথাকালে নূতন দেহ ও নূতন মস্তিষ্ক নির্মিত হয়। আত্মা উহার মাধ্যমে পুনরায় অভিব্যক্ত হন।···

প্রেতাত্মারা শরীর সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহাদের মধ্যে যাহারা খুব দুর্বল, তাহারা যে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহাই স্মরণ করিতে পারে না। তাহারা অপর মানুষের শরীরে প্রবেশ করিয়া পৃথিবীর কিছু ভোগসুখ লাভ করিবার চেষ্টা করে। যে-কেহ ঐ প্রেতাত্মাদের প্রশ্রয় দেয়, তাহাদের সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে, কেন-না প্রেতাত্মারা তাহার জীবনীশক্তি শোষণ করে।

এই জগতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই চিরন্তন নয়।...মুক্তি-অর্থে সত্যকে জানা। আমরা নূতন কিছু হই না, আমরা যাহা তাহাই থাকি। আত্মসত্যে শ্রদ্ধা আনিতে পারিলেই মুক্তি সম্ভব, কর্ম দ্বারা নয়; ইহা জ্ঞানের প্রশ্ন। তুমি কে—ইহা তোমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, আর কিছু নয়। সংসার-স্বপ্ন তৎক্ষণাৎ ঘুচিয়া যাইবে। তোমরা এবং অন্যান্য সকলে এই পৃথিবীতে নানা স্বপ্ন দেখিয়া চলিয়াছ। মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া আবার নূতন এক স্বপ্ন দেখা শুরু হইবে। ঐ স্বপ্ন চলিবে কিছুকাল। উহার অবসান ঘটিলে পুনরায় শরীর

পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে আসা—হয়তো খুব সদ্‌ভাবে জীবনযাপন, অনেক দান-ধ্যান। কিন্তু তাহা তো আর আত্মজ্ঞান আনিয়া দিবে না। প্রকৃত দান অর্থে হাসপাতাল নির্মাণ নয়—ইহা আমরা কবে বুঝিব?

বিজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, 'সকল বাসনা আমা হইতে চলিয়া গিয়াছে। আমি আর ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে যাইব না।' তিনি তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়াসী হইয়া কঠোর সাধনায় লাগিয়া যান। অবশেষে একদিন দেখিতে পান—এই জগদ্‌বৈচিত্র্য কী মিথ্যা কল্পনা, কী দুঃস্বপ্ন, আর স্বর্গ বা লোক-লোকান্তরের প্রসঙ্গ আরও নিকৃষ্টতর ফাঁকি,—তখন তিনি হাসিয়া উঠেন।

যোগের মূল সত্য*

৫ই এপ্রিল, ১৯০০, স্যান্ ফ্রান্সিস্কো শহরে প্রদত্ত।

ব্যাবহারিক ধর্ম সম্বন্ধে কাহারও ধারণা নির্ভর করে—সে নিজে কার্য-কারিতা বলিতে কি বুঝে এবং কোন্ দৃষ্টিকোণ হইতে সে শুরু করিতেছে, তাহার উপর। তিন ভাবেই আমরা ধর্মের অভ্যাস করিতে পারি—কর্মকে অবলম্বন করিয়া, পূজাপ্রণালীর মাধ্যমে কিংবা জ্ঞানবিচার দ্বারা।

যিনি দার্শনিক, তিনি চিন্তা করিয়া চলেন...। বন্ধন ও মুক্তির পার্থক্য—জ্ঞান ও অজ্ঞানের তারতম্য হইতেই ঘটে। দার্শনিকের লক্ষ্য হইল সত্যের উপলব্ধি, তাঁহার নিকট ধর্মের ব্যাবহারিক উপযোগিতার অর্থ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ।...যিনি উপাসক, তাঁহার ব্যাবহারিক ধর্ম হইল ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষমতা। কার্যকর ধর্ম বলিতে কর্মী বুঝেন—সৎ কাজ করিয়া যাওয়া। অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ের মতো ধর্মের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায়ই অপরের আদর্শের কথা মনে রাখি না। সারা পৃথিবীকে আমরা আমাদের নিজেদের আদর্শে বাঁধিতে চাই।

হৃদয়বান্ ব্যক্তির ধর্মাচরণ হইল—মানুষের উপকার-সাধন। যদি কেহ হাসপাতাল-নির্মাণে তাঁহাকে সাহায্য না করে, তাহা হইলে তাঁহার মতে সে একান্তই অধার্মিক। কিন্তু সকলকেই যে উহা করিতে হইবে, তাহার

---

* Vedanta and the West পত্রিকার সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৫৭, সংখ্যায় 'Breathing and Meditation' নামে প্রকাশিত।

কোন যুক্তি আছে কি? দার্শনিকও এইরূপে যে-কেহ তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারে না, তাহাকে হয়তো প্রকাশ্যভাবে নিন্দা করিতে থাকিবেন। কেহ কেহ হয়তো বিশ হাজার হাসপাতাল নির্মাণ করিয়াছে, দার্শনিক ঘোষণা করিবেন, উহারা তো দেবতাদের ভারবাহী পশু। উপাসকেরও কার্যকর ধর্ম সম্বন্ধে নিজস্ব ধারণা ও আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহার মতে যাহারা ভগবান্‌কে ভাল-বাসিতে পারে না, তাহারা যত বড় কাজই করুক না কেন, ভাল লোক নয়। যোগী মনঃসংযম এবং অন্তঃপ্রকৃতির জয়ে উদ্যোগী। তাঁহার প্রশ্ন শুধু: ঐ দিকে কতটা অগ্রসর হইয়াছ? ইন্দ্রিয় ও দেহের উপর কতটা আধিপত্য লাভ করিয়াছ? আমরা যেমন বলিয়াছি, ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ অনুযায়ী অপরের বিচার করিয়া থাকেন। * * *

আমরা সর্বদাই ব্যাবহারিক ধর্মের কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু এই ব্যাবহারিকত্ব আমাদের ধারণা অনুযায়ী হওয়া চাই, বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশ-সমূহে। প্রোটেস্ট্যাণ্টদের আদর্শ হইল সৎকর্ম। তাঁহারা ভক্তি বা দার্শনিক জ্ঞানের বড় ধার ধারেন না, তাঁহারা মনে করেন, উহাতে বেশী কিছু নাই। 'তোমার আধ্যাত্মিক জ্ঞান আবার কি? মানুষের কিছু কর্ম করা চাই'—ইহাই হইল তাঁহাদের মনোভাব।···মানবহিতৈষণার একটু ছিটাফোঁটা! গির্জাসমূহ তো মুখে দিবারাত্র সহানুভূতিহীন অজ্ঞেয়বাদের বিরুদ্ধে গালিবর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তবুও মনে হয় কার্যতঃ উহারই দিকে তাহারা দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। নীরস উপযোগবাদের ক্রীতদাস! উপযোগিতার ধর্ম! বর্তমানে তো দেখা যাইতেছে—এই ভাবটিই খুব প্রবল। আর এই জন্যই পাশ্চাত্যে কোনও কোনও বৌদ্ধমত খুব জনপ্রিয় হইতেছে। ঈশ্বর আছেন কি না, আত্মা বলিয়া কিছু আছে কি না, তাহা তো সাধারণ মানুষের জ্ঞানগোচর নয়, অথচ জগতে অশেষ দুঃখ। অতএব জগতের কল্যাণ-চিকীর্ষাই প্রত্যক্ষ নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

আমাদের আলোচ্য যোগ-মতের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু এরূপ নয়। ইহা বলে যে, মানুষের আত্মা সত্যই আছে এবং উহারই মধ্যে সকল শক্তি নিহিত রহিয়াছে। আমরা যদি শরীরকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিতে পারি, তাহা হইলে অন্তরের ঐ শক্তি বিকশিত হইবে। আত্মাতেই সকল জ্ঞান। মানুষের এত সংগ্রাম কেন? দুঃখের উপশমের জন্য...। শরীরের উপর আমাদের আধিপত্য নাই বলিয়াই

আমরা যত দুঃখ ভোগ করি।...আমরা অশ্বের পুরোভাগে শকটটিকে জুড়িয়া দিতেছি। উদাহরণস্বরূপ সৎকর্মের কথা ধরা যাক।

আমরা ভাল কাজ করিতে চেষ্টা করিতেছি...দরিদ্রের সেবা করিতেছি। কিন্তু আমরা দুঃখের মূল কারণের দিকে দৃষ্টিপাত করি না। ইহা যেন একটি বালতি লইয়া সাগরের জল ছেঁচিতে যাওয়া—যেটুকু জল খালি করা গেল, তাহার চেয়ে অনেক বেশী জল সর্বক্ষণ হাজির হইতেছে! যোগী দেখেন, ইহা অর্থহীন প্রচেষ্টা। তিনি বলেন, দুঃখ হইতে পরিত্রাণের উপায় হইল—প্রথমে দুঃখের মূল অন্বেষণ।...ব্যাধি যদি দুশ্চিকিৎস্য হয়, তাহা হইলে উহা আরোগ্য করার চেষ্টা নিরর্থক। জগতে এত দুঃখ কেন? আমাদেরই নির্বুদ্ধিতার জন্য। আমরা আমাদের শরীরকে আয়ত্ত করি নাই। যদি নিজের দেহের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারো তো জগতের সকল দুঃখ দূর হইবে। প্রত্যেকটি হাসপাতাল চায়, বেশী বেশী রোগী যেন আসে। যতবার তুমি কিছু দান করিবার কথা ভাবিতেছ, ততবারই তোমাকে —তোমার দান যে গ্রহণ করিবে, সেই ভিক্ষুকের কথাও ভাবিতে হয়। যদি বলো, 'হে ভগবান্, পৃথিবী যেন দানশীল ব্যক্তিতে ভরিয়া যায়'—তোমার কথার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবী যেন ভিক্ষুকের দ্বারাও পরিপূর্ণ হয়। লোকহিতকর কাজে যদি জগৎ পরিব্যাপ্ত দেখিতে চাও তো জগৎকে দুঃখ-কষ্টে পরিপূর্ণ দেখিতেও প্রস্তুত থাকিও।

যোগী বলেন, দুঃখের কারণ কি—তাহা প্রথমে বুঝিলে ধর্মের ব্যাবহারিক উপযোগিতা হৃদয়ঙ্গম হয়। জগতের যাবতীয় দুঃখ আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত সংশ্লিষ্ট। সূর্য, চন্দ্র অথবা তারাসমূহের কি কোন ব্যাধি আছে? যে আগুন দিয়া ভাত রাঁধিতেছ, উহাই শিশুর হাত দগ্ধ করিতে পারে। উহা কি আগুনের দোষ? অগ্নি ধন্য, এই বিদ্যুৎ শক্তি ধন্য, ইহারা আলোক দিতেছে।...কোথাও তুমি দোষ চাপাইতে পার না। মূল ভূতগুলির উপরও না। জগৎ ভালও নয়, মন্দও নয়, জগৎ জগৎই। আগুন আগুনই, উহাতে যদি তুমি হাত পোড়াও, সে তোমারই বোকামি। যদি আগুনকে রন্ধন এবং ক্ষুন্নিবৃত্তির কাজে লাগাইতে পারো তো তুমি বিজ্ঞ। ইহাই পার্থক্য; কোন অবস্থা-বিশেষকে কখনও ভাল বা মন্দ বলা চলে না। ভাল বা মন্দ ব্যক্তি-মানবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। জগৎকে ভাল বা মন্দ

বলার কোন অর্থ আছে কি? ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তি-মানবই সুখ বা দুঃখের অধীন হয়।

যোগীরা বলেন: প্রকৃতি ভোগ্য, আত্মা ভোক্তা। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-গুলির স্পর্শ হইতেই সুখ বা দুঃখ, শীত বা উষ্ণের জ্ঞান হয়। আমরা যদি ইন্দ্রিয়গুলি আয়ত্ত করিতে পারি এবং এখন যেমন সেগুলি আমাদিগকে চালাইতেছে, সেইরূপ না হইয়া যদি আমরা তাহাদিগকে খুশীমতো চালাইতে পারি, আমাদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য করিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্যার সমাধান হইয়া যায়। বর্তমান অবস্থায় ইন্দ্রিয়গুলি আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে এবং আমাদিগকে খেলাইয়া বেড়াইতেছে, সর্বদাই বোকা বানাইতেছে।

ধরুন এখানে একটি দুর্গন্ধ রহিয়াছে। উহা আমার নাকের সংস্পর্শে আসিলেই আমি বিরক্তি বোধ করিব। আমি যেন আমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের গোলাম। তাহা যদি না হইতাম, তাহা হইলে আমি ঐ দুর্গন্ধের পরোয়া করিতে যাইব কেন? একজন আমাকে কটুকথা বলিল। উহা আমার কানে ঢুকিয়া আমার দেহ ও মনের মধ্যে রহিল। আমি যদি আমার দেহেন্দ্রিয়-মনের প্রভু হই, তাহা হইলে আমি বলিব, 'ঐ শব্দগুলি চুলোয় যাক, আমার কাছে ঐগুলি কিছুই নয়, আমার কোনও কষ্ট নাই, আমি গ্রাহ্য করি না।' ইহাই হইল পরিষ্কার সরল সহজ সত্য।

প্রশ্ন উঠিতে পারে: ইহা কি কাজে পরিণত করা যায়? মানুষ কি নিজের দেহমনকে এই ভাবে জয় করিতে পারে?···যোগবলে ইহা অবশ্যই সম্ভব।···যদি নাও হয়, যদি তোমার মনে সংশয় থাকে, তবু তোমাকে চেষ্টা করিতে হইবে। নিষ্কৃতির অন্য পথ নাই।···

তুমি সর্বদা সৎ কাজ করিয়া যাইতে পারো, তথাপি তোমার ইন্দ্রিয়সমূহের দাসত্ব ঘুচিবে না, তোমাকে সুখ-দুঃখের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে; হয়তো তুমি প্রত্যেক ধর্মের দর্শন অধ্যয়ন করিয়াছ। এদেশে তো লোকে গাদা গাদা বই লইয়া ফিরে। তাহারা পণ্ডিত মাত্র, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। সুখদুঃখ-বোধ তাহাদের অবশ্যম্ভাবী। তাহারা দুই-হাজার বই পড়িতে পারে, তাহাতে বলিবার কিছু নাই, কিন্তু যেই একটু কষ্ট আসিল,

তাহাদের দুর্ভাবনার আর অন্ত থাকে না।...ইহাকে কি মনুষ্যত্ব বলো? ইহা তো চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক।

মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কি?...আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবিস্তার তো সকল প্রাণীর সাধারণ ধর্ম। মানুষের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য এই যে, সে এগুলি আয়ত্ত করিতে পারে এবং এগুলির উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়া ঈশ্বরের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। পশুর পক্ষে ইহা সম্ভব নয়। পরোপকার-সাধনে মানুষের বিশেষ কি কৃতিত্ব? ইতরপ্রাণীও পরোপকার করিতে পারে। পিপীলিকা, কুকুর—ইহাদের মধ্যেও উহা দেখা গিয়াছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য হইল আত্মজয়ে। কোন কিছুর সংস্পর্শ-জনিত প্রতিক্রিয়াকে সে বাধা দিতে পারে। ইতরপ্রাণীর এই সামর্থ্য নাই। সর্বত্র সে প্রকৃতির রজ্জু দ্বারা বাঁধা। মানুষ প্রকৃতির অধীশ্বর, পশু প্রকৃতির ক্রীতদাস—ইহাই হইল একমাত্র প্রভেদ। প্রকৃতি কি?—পঞ্চেন্দ্রিয়...।

যোগমতে অন্তঃপ্রকৃতি-জয়ই নিষ্কৃতির পথ।...ভগবানের জন্য ব্যাকুলতাই ধর্ম।...সৎকর্ম প্রভৃতি মনকে একটু স্থির করে—এই মাত্র। যোগাভ্যাস—পূর্ণতার উপলব্ধি আমাদের পূর্বসংস্কারের উপর নির্ভর করে। আমি তো সারাজীবন ইহার অনুশীলন করিতেছি, তবু এখন পর্যন্ত সামান্যই আগাইতে পারিয়াছি। তবে ইহাই যে একমাত্র খাঁটি পথ, তাহা বিশ্বাস করিবার মতো সুফল আমি পাইয়াছি। এমন দিন আসিবে, যখন আমি আমার নিজের প্রভু হইতে পারিব। এ জন্মে না হয় তো অপর এক জন্মে নিশ্চয়ই ইহা ঘটিবে। চেষ্টা আমি কখনও ছাড়িব না। কিছুই নষ্ট হইবার নয়। এই মুহূর্তে যদি আমার মৃত্যু হয়, আমার সমুদয় অতীত সাধনা আমার সঙ্গে যাইবে। মানুষে মানুষে পার্থক্য কিসে হয়? তাহার পূর্বানুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা। অতীত অভ্যাস একজনকে করে মনস্বী এবং অপরকে করে নির্বোধ। অতীতের অর্জিত শক্তি থাকিলে তুমি পাঁচ মিনিটেই হয়তো কোন কাজ সিদ্ধ করিবে। শুধু বর্তমান দেখিয়া কোন কিছু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। আমাদের প্রত্যেককেই কোন না কোন সময়ে পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে।

যোগীরা ব্যাবহারিক যে-সব অভ্যাস শিক্ষা দেন, সেগুলির অধিকাংশই মনকে লইয়া—একাগ্রতা, ধ্যান ইত্যাদি। আমরা এত জড়ের অধীন হইয়া পড়িয়াছি যে, নিজেদের বিষয় চিন্তা করিলে আমরা কেবল আমাদের শরীরটিই

দেখি। দেহই আমাদের আদর্শ হইয়াছে, আর কিছু নয়। অতএব শারীরিক কিছু অবলম্বন দরকার।...

প্রথম, আসন। এমন একটি ভঙ্গীতে বসিতে হইবে, যে-অবস্থায় অনেকক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকা যায়। শরীরের স্নায়ুপ্রবাহগুলি মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। মেরুদণ্ড শরীরের ভার ধারণ করিবার জন্য নয়। অতএব এমন আসনে বসা প্রয়োজন, যাহাতে দেহের ওজন মেরুদণ্ডের উপর না পড়ে। মেরুদণ্ডকে সকল চাপ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে।

আরও...কয়েকটি প্রাথমিক বিষয় আছে। খাদ্য ও ব্যায়ামের গুরুতর প্রশ্নটি উল্লেখযোগ্য।...

খাদ্য খুব সাদাসিধা হওয়া উচিত। মাত্র একবার বা দুইবারে দিনের সমগ্র আহার্য উদরসাৎ না করিয়া অল্পমাত্রায় কয়েকবার খাওয়া ভাল। কখনও ক্ষুধা-পীড়িত হইও না। যিনি অত্যধিক ভোজন করেন, তিনি যোগী হইতে পারেন না। যিনি বেশী উপবাস করেন, তাঁহারও পক্ষে যোগ কঠিন। অতিমাত্রায় নিদ্রা বা অধিক রাত্রি জাগরণ, একেবারে কাজ না করা বা অত্যন্ত পরিশ্রম করা—এগুলিও যোগের অনুকূল নয়।[১] যোগে সাফল্যের জন্য নিয়মিত আহার ও পরিশ্রম, নিয়মিত নিদ্রা ও জাগরণ—এই-সব প্রয়োজন। যথাযোগ্য খাদ্য কি, তাহা নিজেদেরই স্থির করিতে হইবে। অপর কেহ উহা বলিয়া দিতে পারে না। একটি সাধারণ বিধি এই যে, উত্তেজক খাদ্য বা বেশী মশলা-দেওয়া রান্না বর্জনীয়।...আমাদের কাজের পরিবর্তনের সহিত খাদ্যেরও যে পরিবর্তন আবশ্যক, তাহা আমরা লক্ষ্য করি না। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে, আমাদের যত কিছু সামর্থ্য, তাহা আমরা খাদ্য হইতেই লাভ করিয়া থাকি।

অতএব যে পরিমাণে ও যে ধরনের শক্তি আমরা চাই, আমাদের আহার্যও তদনুযায়ী নিরূপণ করিয়া লইতে হইবে।...

প্রচণ্ড ব্যায়ামের কোন প্রয়োজন নাই।...মাংসল শরীর যদি চাও, যোগ তোমার জন্য নয়। বর্তমানে যে দেহ আছে, তাহা অপেক্ষা অনেক সূক্ষ্মতর একটি যন্ত্র নির্মাণ করিতে হইবে। গুরুতর কায়িক পরিশ্রম যোগের পক্ষে খুবই অনিষ্টকর। যাহাঁদিগকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এমন লোকের

১ গীতা, ৬।১৬

ভিতর বাস করিও। প্রচণ্ড মেহনত না করিলে দীর্ঘায়ু হইতে পারিবে। অপরিমিত-ভাবে জ্বালাইলে প্রদীপ যেমন পুড়িয়া যায়, সেইরূপ মাংসপেশীকে বেশী মাত্রায় খাটাইলে উহার ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। যাহারা মস্তিষ্কের কাজ করে, তাহারা অনেক কাল বাঁচে।...প্রদীপকে ধীরে ধীরে এবং মৃদুভাবে জ্বলিতে দাও। বেশী জ্বালাইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহা পুড়াইয়া ফেলিও না। প্রত্যেকটি উদ্বেগ, প্রত্যেকটি উদ্দাম লম্ফ-ঝম্প—শারীরিক অথবা মানসিক যাহাই হউক—তোমার আয়ুকে ক্ষয় করিতেছে, মনে রাখিও।

যোগীরা বলেন, প্রকৃতির তিনটি গুণ অনুযায়ী তিন প্রকারের মন আছে। প্রথম—তামস মন, উহা আত্মার আলো ঢাকিয়া রাখে। দ্বিতীয়—রাজসিক মন, যাহা মানুষকে খুব কর্মব্যস্ত রাখে। তৃতীয়—সাত্ত্বিক মন, উহার লক্ষণ হইল স্থিরতা ও শান্তি।

এমন লোক আছে, যাহাদের জন্ম হইতেই সর্বক্ষণ ঘুমাইবার ধাত; তাহাদের রুচি—পচা বাসী খাদ্যে। যাহারা রজোগুণী, তাহারা ঝাল ও ঝাঁজযুক্ত খাদ্য পছন্দ করে।...সাত্ত্বিক লোক খুব চিন্তাশীল, ধীর ও সহিষ্ণু প্রকৃতির হয়; তাহারা অল্পপরিমাণে খায় এবং কখনও উগ্র দ্রব্য খায় না।

লোকে আমাকে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করে, 'মাংস খাওয়া ছাড়িয়া দিব কি?' আমার গুরুদেব বলিতেন, 'তুমি কোন কিছু ছাড়িতে যাইবে কেন? উহাই তোমাকে ছাড়িয়া যাইবে। তুমি নিজে প্রকৃতির কিছুই বর্জন করিতে যাইও না, নিজেকে বরং এমন করিয়া গড়িয়া তোল, যাহাতে প্রকৃতি নিজেই তোমার নিকট হইতে সরিয়া যাইবে। এমন এক সময় আসিবে, যখন তোমার পক্ষে মাংস খাওয়া স্বভাবতই সম্ভব হইবে না। উহা দেখা মাত্রই তোমার ঘৃণার উদ্রেক হইবে। এমন দিন আসিবে, যখন এখন যে-সব জিনিস ছাড়িবার জন্য তীব্র চেষ্টা করিতেছ, সেগুলি আপনা হইতেই বিরস ও ন্যক্কারজনক মনে হইবে।

শ্বাস-নিয়ন্ত্রণের নানা প্রণালী আছে। একটি অভ্যাস করিতে হয় তিন ধাপে—নিঃশ্বাস টানিয়া লওয়া, নিঃশ্বাসকে রুদ্ধ রাখা এবং উহা ছাড়িয়া দেওয়া। কতকগুলি প্রণালী বেশ কঠিন। কতকগুলি জটিল প্রণালী যথাযোগ্য আহার্য বিনা অভ্যাস করিতে গেলে খুবই বিপজ্জনক হইতে পারে। যেগুলি খুব সরল, সেইগুলি ছাড়া অন্য প্রণালীগুলি তোমাদিগকে আমি অভ্যাস করিতে পরামর্শ দিব না।

একটি গভীর নিঃশ্বাস লইয়া ফুস্‌ফুস্‌ পরিপূর্ণ কর। ধীরে ধীরে উহা ছাড়িয়া দাও। এইবার এক নাকে শ্বাস টানিয়া ধীরে ধীরে অপর নাক দিয়া উহা বাহির করিয়া দাও। আমাদের কেহ কেহ পুরা শ্বাস লইতে পারি না, কেহ কেহ বা ফুস্‌ফুস্‌কে যথেষ্ট বাতাসে ভরিয়া দিতে সমর্থ নই। উপরি-উক্ত অভ্যাসগুলি এই ত্রুটি বেশ সংশোধন করিবে। সকালে ও সন্ধ্যায় আধঘণ্টা করিয়া অভ্যাস করিতে পারিলে তুমি নূতন মানুষ হইয়া যাইবে। এই ধরনের শ্বাস-নিয়ন্ত্রণ আদৌ বিপজ্জনক নয়। অন্যান্য অভ্যাসগুলি আস্তে আস্তে আয়ত্ত করিতে হয়। নিজের শক্তি আন্দাজ করিয়া চলিবে। দশ মিনিট যদি ক্লান্তিকর লাগে তো পাঁচ মিনিট করিয়া কর।

যোগীকে নিজের শরীর সুস্থ রাখিতে হইবে। এই-সব প্রাণায়াম শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিয়ন্ত্রণে প্রচুর সহায়তা করে। দেহের সর্বত্র বায়ুপ্রবাহে যেন ভরিয়া যায়। নিঃশ্বাস-গতি দ্বারা আমরা সকল অঙ্গের উপর প্রভুত্ব লাভ করি। শরীরের কোথাও অসাম্য ঘটিলে স্নায়ুপ্রবাহ ঐ দিকে চালিত করিয়া উহা আয়ত্তে আনিতে পারা যায়। যোগী বুঝিতে পারেন, শরীরের কোন্‌ স্থানে কখন প্রাণশক্তির ন্যূনতাবশতঃ যন্ত্রণা হইতেছে। তাঁহাকে তখন প্রাণসাম্য দ্বারা ঐ ন্যূনতা দূর করিয়া দিতে হয়।

যোগসিদ্ধির একটি অন্যতম শর্ত হইল পবিত্রতা। সকল সাধনের ইহাই মূল ভিত্তি। বিবাহিত বা অবিবাহিত সকলের পক্ষেই পূর্ণ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা প্রয়োজন। ইহা অবশ্য একটি দীর্ঘ আলোচনার বিষয়, তবে আমি তোমাদিগকে কয়েকটি কথা বলিতে চাই। সর্বসাধারণের কাছে এই বিষয়ের আলোচনা এদেশে রুচিসম্মত নয়। পাশ্চাত্যদেশগুলি লোক-শিক্ষকের ছদ্মবেশে একশ্রেণীর অতি হীন ব্যক্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। ইহারা নরনারীকে উপদেশ দেয় যে, যদি তাহারা যৌন-সংযম অভ্যাস করে তো তাহাদের সমূহ ক্ষতি হইবে। এই-সব তথ্য ইহারা কোথায় পাইল?··· আমার নিকট এই প্রশ্ন লইয়া বহু লোক আসে। তাহাদিগকে কেহ বলিয়াছে যে, পবিত্র জীবন যাপন করিলে তাহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে। ···এই-সব শিক্ষক ইহা জানিল কিরূপে? তাহারা নিজেরা ব্রহ্মচর্য পালন করিয়াছে কি? এই অপবিত্র নির্বোধ কামুক পশুরা সমগ্র জগৎকে তাহাদের পর্যায়ে টানিয়া আনিতে চায়!

আত্মত্যাগ বিনা কিছুই পাওয়া যায় না।…মানব-চেতনায় যাহা পবিত্রতম—মহত্তম বৃত্তি, তাহাকে কলুষিত করিও না।…পশুস্তরে উহাকে নামাইয়া আনিও না। নিজদিগকে ভদ্র করিয়া তোল।…হও শুচি, হও পবিত্র।…অন্য পথ নাই। যীশুখ্রীষ্ট কি অপর কোন পথের সন্ধান পাইয়াছিলেন?…যদি তোমরা যৌনশক্তিকে রক্ষা করিয়া যথাযথ প্রয়োগ করিতে পারো, তাহা হইলে উহা তোমাদিগকে ভগবানের নিকট লইয়া যাইবে। ইহার বিপরীত যাহা আসিবে, তাহা নরকতুল্য।

বাহিরের ব্যাপারে কিছু করা অনেক সহজ, কিন্তু পৃথিবীর যিনি শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, তিনিও যখন মনঃসংযম করিতে যান, তখন নিজেকে শিশুর ন্যায় অসহায় বোধ করেন। অন্তঃসাম্রাজ্য জয় করা আরও বেশী কঠিন। তবে নিরাশ হইও না। উঠ, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত চেষ্টা হইতে বিরত হইও না।

বিবিধ

আমার জীবন ও ব্রত

২৭শে জানুআরি ১৯০০ খৃঃ ক্যালিফর্নিয়া, প্যাসাডেনা সেক্সপিয়র ক্লাবে প্রদত্ত।

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আজ সকালে আলোচনার বিষয় ছিল 'বেদান্তদর্শন'। বিষয়টি হৃদয়গ্রাহী হইলেও একটু নীরস ও অতি বিরাট্।

ইতিমধ্যে আপনাদের সভাপতি এবং উপস্থিত কয়েকজন ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলা 'আমার কাজ ও এতদিনের কার্যক্রম' সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। বিষয়টি কাহারও কাহারও নিকট আকর্ষণীয় হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকটে নয়। বস্তুতঃ কেমন করিয়া যে আপনাদের নিকট এ-সম্বন্ধে বলিব, তাহা আমি জানি না। এ-বিষয়ে এই আমার প্রথম বলা।

আমার ক্ষুদ্র শক্তি দ্বারা এতদিন কি করিবার চেষ্টা করিয়াছি, তাহা বুঝাইবার জন্য আপনাদিগকে কল্পনায় ভারতবর্ষে লইয়া যাইতেছি। বিষয়-বস্তুর খুঁটিনাটি ও বৈচিত্র্য লইয়া আলোচনার সময় আমাদের নাই। একটি বৈদেশিক জাতির সর্বপ্রকার বৈচিত্র্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনাদের আয়ত্ত করাও সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের যথার্থ স্বরূপ কিছুটা আপনাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষ একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত বিশাল অট্টালিকার মতো। প্রথম দর্শনে কোন আশাই জাগে না। এ এক বিগতশ্রী বিধ্বস্ত জাতি। কিন্তু একটু অপেক্ষা করিয়া লক্ষ্য করুন, ইহা ছাড়াও অনেক কিছু দেখিতে পাইবেন। মানুষটি যে-আদর্শ ও মূলনীতির বহিঃপ্রকাশ, সে-আদর্শ ও মূলনীতি যতদিন ব্যাহত বা বিনষ্ট না হয়, ততদিন মানুষটি বাঁচিয়া থাকে, ততদিন তাহার আশা আছে। আপনার পরিধানের জামা কুড়িবার চুরি হইয়া গেলেও তাহা আপনার মৃত্যুর কারণ হয় না। আর একটি নূতন জামা আনিতে পারিবেন। জামা এ-ক্ষেত্রে অপ্রধান। ধনবানের ধনরাশি অপহৃত হইলে তাহার প্রাণ-শক্তি অপহৃত হয় না। মানুষটি বাঁচিয়া থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখিলে কি দেখিতে পাই? 'ভারতবর্ষ এখন আর একটি রাজনৈতিক শক্তি নয়, ভারতবর্ষ দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ একটি জাতি। নিজেদের শাসনকার্যে ভারতবাসীর কোন

হাত নাই। ত্রিশকোটি পরাধীন দাস ভিন্ন ভারতবাসী আর কিছুই নয়। ভারতবাসীর জনপ্রতি মাসিক আয় গড়ে দুই শিলিং মাত্র। বেশীর ভাগ জনসাধারণের অধিকাংশের পক্ষে উপবাসই স্বাভাবিক অবস্থা। ফলে আয়ের বিন্দুমাত্র স্বল্পতা ঘটিলে লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সামান্য দুর্ভিক্ষের অর্থ বহু লোকের মৃত্যু। এই দিক দিয়া দেখিলে শুধু ধ্বংসস্তূপ—আশাহীন ধ্বংসাবশেষই দেখিতে পাই।

কিন্তু আমরা জানি, ভারতবাসী কখনও ধনসম্পদের চেষ্টা করে নাই। পৃথিবীর যে-কোন জাতি অপেক্ষা বিপুলতর অর্থসম্পদের অধিকারী হইয়াও ভারতবাসী কোন দিন অর্থের জন্য লালায়িত হয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষ এক শক্তিমান্ জাতি ছিল, কিন্তু তাহার শক্তিমত্তার লোভ ছিল না। অন্য জাতিকে জয় করিবার জন্য ভারতবাসী কখনও বাহিরে যায় নাই। নিজেদের সীমার মধ্যেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। বাহিরের সহিত বিবাদে রত হয় নাই। সাম্রাজ্য-লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহারা করে নাই। শক্তি ও সম্পদ এ-জাতির আদর্শ ছিল না।

তবে? ভারতবাসী ভুল করিয়াছিল কি ঠিক পথে চলিয়াছিল, তাহা এখানে আলোচ্য নয়। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে এই একটি জাতিই গভীরভাবে বিশ্বাস করিত—এই জীবনই একমাত্র সত্য নয়। ঈশ্বরই সত্য। সুখে দুঃখে তিনিই তাহার আশ্রয়স্থল। ভারতবর্ষের অধঃপতনকালে এই জন্যই সর্বপ্রথম ধর্মের অবনতি ঘটিয়াছিল। হিন্দুগণ ধর্মের ভাবে পানাহার করে, ধর্মের ভাবে নিদ্রা যায়, ধর্মের ভাবে বিচরণ করে, ধর্মের ভাবে বিবাহাদি করে, ধর্মের ভাবে দস্যুবৃত্তি করে।

আপনারা কি কখনও এমন দেশ দেখিয়াছেন? সেখানে যদি আপনি দস্যুদল গঠন করিতে চান, তবে দলের নেতাকে কোনরূপ ধর্ম প্রচার করিতে হইবে, তারপর কতকগুলি অসার দার্শনিকতত্ত্ব সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে, 'এই দস্যুবৃত্তিই ভগবান্-লাভের সবচেয়ে সুগম ও সহজ পন্থা'। তবেই নেতা তাহার দল গঠন করিতে পারিবে। অন্যথা নয়। ইহাতেই প্রতিপন্ন হয়, এ-জাতির লক্ষ্য ও প্রাণশক্তি—ধর্ম। এই ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ হয় নাই বলিয়াই জাতি এখনও বাঁচিয়া আছে।

রোমের কথা মনে করুন। রোমের উদ্দেশ্য ছিল সাম্রাজ্য-বিস্তার ও

সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা। যে মুহূর্তে এই সাম্রাজ্যবাদে বাধা পড়িল, অমনি রোম চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া শূন্যে পরিণত হইল। গ্রীসের আদর্শ ছিল বুদ্ধিবৃত্তি। যে মুহূর্তে বুদ্ধির ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিল, গ্রীসও অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল। ঠিক এই অবস্থাই বর্তমান কালের স্পেন ও অন্যান্য নবীন দেশগুলির হইয়াছে। প্রত্যেক জাতিরই এ পৃথিবীতে একটি উদ্দেশ্য ও আদর্শ থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে সেই আদর্শটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতিরও মৃত্যু ঘটে।

ভারতে সেই প্রাণশক্তি আজিও অব্যাহত। এই শক্তি ভারতবাসী কখনও ত্যাগ করে নাই। ভারতীয়দের সর্বপ্রকার কুসংস্কার সত্ত্বেও সেই প্রাণশক্তি আজিও জাতির জীবনে সমভাবে প্রবাহিত। অতি ভয়ানক ঘৃণ্য কুসংস্কার-সকল ভারতবর্ষে বর্তমান। তাহাতে কিছুই আসে যায় না। জাতির জীবন-প্রবাহ ও জীবনোদ্দেশ্য আজিও তেমনি আছে।

ভারতবাসীরা কোনকালেই একটি শক্তিশালী বিজয়ী জাতি হইতে পারিবে না। কোনদিনই তাহারা রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হইবে না। এ-কাজ তাহাদের নয়। বিশ্বসভায় ইহা ভরেতবর্ষের ভূমিকা নয়। ভারতের ভূমিকা কি? ভারতবর্ষের আদর্শ—ভগবান্, একমাত্র ভগবান্। যতদিন ভারতবর্ষ মৃত্যুপণ করিয়াও ভগবান্‌কে ধরিয়া থাকিবে, ততদিন তাহার আশা আছে।

অতএব বিশ্লেষণান্তে আপনার সিদ্ধান্ত হইবে, বাহিরের এই দুঃখ-দারিদ্র্য অকিঞ্চিৎকর, ইহা অন্তরের মানুষটিকে মারিতে পারে নাই; সে মানুষটি আজিও বাঁচিয়া আছে, এখনও তাহার আশা আছে।

দেখিতে পাইবেন, সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়িয়া ধর্মবিষয়ক কার্যধারা চলিয়াছে। এমন একটি বৎসর আমার মনে পড়ে না—যে বৎসর কয়েকটি নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় নাই। স্রোত যত তীব্র হয়, ততই উহাতে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হইতে থাকে। সম্প্রদায়সমূহ অবনতির লক্ষণ নয়—জীবনের পরিচায়ক। সম্প্রদায়ের সংখ্যা আরও বাড়িতে থাকুক। এমন দিন আসুক, যখন প্রত্যেক মানুষ এক একটি সম্প্রদায় হইয়া দাঁড়াইবে। সম্প্রদায় লইয়া কলহের কোন কারণ নাই

এখন আপনারা নিজেদের দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। আমি কোনরূপ

সমালোচনা করিতেছি না। এদেশের সামাজিক বিধিবিধান, রাজনৈতিক সংগঠন প্রভৃতি সব কিছুই ইহজীবনের যাত্রাপথ সুগম করিবার জন্য রচিত হইয়াছে। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকে, ততদিন খুব সুখে থাকিতে পারে। আপনাদের রাস্তাঘাটের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন—কি পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন! কি সুন্দর নগররাজি! কত উপায়েই না মানুষ অর্থোপার্জন করিতে পারে! জীবনে সুখ-সম্ভোগের কত পথ! কিন্তু যদি কেহ এখানে বলে, 'আমি কোন কাজ করিতে চাই না, শুধু এই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া ধ্যানস্থ হইব', তৎক্ষণাৎ তাহাকে জেলে যাইতে হইবে। কোন সুযোগই তাহাকে দেওয়া হইবে না—কোন সুযোগই নয়। সকলের সহিত তাল মিলাইয়া চলিলেই এ-সমাজে মানুষের বাঁচিয়া থাকা সম্ভব। ইহলৌকিক সুখসম্ভোগের সংগ্রামে মানুষকে যোগদান করিতে হইবে, অন্যথা মৃত্যু অনিবার্য।

ভারতবর্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। সেখানে যদি কেহ বলে, 'পর্বত-শিখরে ধ্যানাসনে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আমি আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব', সকলেই তাহাকে বলিবে, 'যাও, ঈশ্বর তোমার সহায় হউন।' একটি কথাও তাহাকে বলিতে হইবে না। কেহ তাহাকে একখণ্ড পরিধেয় বস্ত্র দিবে, অনায়াসে তাহার অভাবপূরণ হইবে। কিন্তু যদি কেহ বলে, 'এ-জীবনটা আমি একটু উপভোগ করিতে চাই', অমনি সমস্ত দরজা তাহার নিকট বন্ধ হইয়া যাইবে।

আমি বলি, উভয় দেশের ধারণাই অযৌক্তিক। এদেশে যদি কেহ স্থির আসনে বসিয়া নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে চায়, তবে কেন সে সুযোগ পাইবে না, তাহা বুঝিতে পারি না। অধিকাংশ লোকে যাহা করে, প্রত্যেকের পক্ষেই এখানে কেন তাহাই কর্তব্য হইবে? আমি ইহার কোন কারণ দেখিতে পাই না। আবার ভারতবর্ষে কোন ব্যক্তি কেন ইহজীবনে সুখ-সম্ভোগ ও অর্থোপার্জন করিবে না, তাহারও কারণ খুঁজিয়া পাই না। কিন্তু দেখুন, জোর করিয়া কোটি কোটি লোককে তাহাদের বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। ইহা ঋষিমুনিদের অত্যাচার। এ-অত্যাচার জ্ঞানীর, এ-অত্যাচার মননশীলের, অধ্যাত্মবাদীর, মহামানবের। আর মনে রাখিবেন, অজ্ঞ জনের অত্যাচার অপেক্ষা জ্ঞানবানের অত্যাচার অনেক বেশী শক্তিশালী। নিজেদের মত অন্যের ঘাড়ে চাপাইবার জন্য জ্ঞানী ও বুদ্ধিমানেরা সহস্র বিধি-

নিষেধের প্রচলন করিয়াছেন। সে-সকল বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করা অজ্ঞ-জনের সাধ্য নয়।

আমি বলি, এ অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিবার জন্য কোটি কোটি মানুষকে বলি দিয়া লাভ নাই। যদি এমন কোন সমাজ গঠন করা সম্ভব হয়, যেখানে আধ্যাত্মিক মহামানবেরও আবির্ভাব হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অন্যান্য সকলেও সুখে থাকিবে, ভাল কথা; কিন্তু যদি কোটি কোটি মানুষকে নিষ্পেষিত করিয়া একজন আধ্যাত্মিক মহামানব সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা অন্যায়। বরং বিশ্ব-মানবের মুক্তির জন্য একজন আধ্যাত্মিক মহামানবের দুঃখভোগ শ্রেয়।

প্রত্যেক জাতির মধ্যে আপনাকে সেই জাতির বিশিষ্ট পন্থা অনুযায়ী কাজ করিতে হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত সেই ব্যক্তির নিজস্ব ভাষায় কথা বলিতে হইবে। ইংলণ্ড বা আমেরিকায় যদি ধর্মপ্রচার করিতে যান, তাহা হইলে রাজনৈতিক পন্থা অনুসারে আপনাকে কাজ করিতে হইবে। সেখানে পাশ্চাত্য রীতি-অনুযায়ী ভোট-ব্যালট, প্রেসিডেণ্ট-নির্বাচন প্রভৃতি দ্বারা সংস্থা ও সমিতি গঠন করিতে হইবে, কারণ উহাই পাশ্চাত্যজাতির ভাষা ও রীতি। পক্ষান্তরে আপনি যদি ভারতবর্ষে রাজনীতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চান, তাহা হইলে আপনাকে ধর্মের ভাষায় কথা বলিতে হইবে। অনেকটা এইভাবে বলিতে হইবে: যে-ব্যক্তি প্রত্যহ প্রাতে তাহার গৃহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহার অশেষ পুণ্য হইবে, সে স্বর্গে যাইবে অথবা ঈশ্বর লাভ করিবে। ঐভাবে না বলিলে তাহারা শুনিবে না। এ শুধু ভাষার ব্যাপার। বিষয়বস্তু কিন্তু একই। কিন্তু কোন জাতির হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইলে আপনাকে সেই জাতির ভাষায় কথা বলিতে হইবে। কথাটি খুবই ন্যায়সঙ্গত—এ বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করা আমাদের উচিত নয়।

আমি যে-সম্প্রদায়ভুক্ত, তাহাকে বলা হয় সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়। 'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ 'যে-ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়াছে।' ইহা অতি প্রাচীন সম্প্রদায়। যীশুর জন্মের ৫৬০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধও এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের অন্যতম সংস্কারক মাত্র। এত প্রাচীন এই সম্প্রদায়! পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদেও আপনি সন্ন্যাসীর উল্লেখ

পাইবেন। প্রাচীন ভারতে নিয়ম ছিল যে, প্রত্যেক নরনারীকে শেষ জীবনে সমাজ হইতে বিদায় লইয়া একমাত্র স্বীয় মুক্তি ও ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে হইবে। সেই মহাপ্রস্থান—মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রাচীনকালে বৃদ্ধগণ সন্ন্যাস অবলম্বন করিতেন। পরবর্তীকালে তরুণ যুবকগণ সংসার ত্যাগ করিতে লাগিল। যুবকগণ কর্মঠ। বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া সর্বক্ষণ মৃত্যুচিন্তা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব, সুতরাং তাহারা ধর্ম-প্রচার, বিভিন্ন সম্প্রদায়-গঠন প্রভৃতি কার্যে ব্রতী হইল। এইরূপে যুবক বুদ্ধ তাঁহার মহান্ সংস্কার কার্য আরম্ভ করেন। তিনি যদি বৃদ্ধ হইতেন, তবে অবশ্যই নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াই নীরবে নির্বাণ লাভ করিতেন।

সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বলিতে 'চার্চ' বুঝায় না এবং সেই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা পুরোহিত নন। পুরোহিত ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। ভারতবর্ষে সমাজিক জীবনের অন্যান্য কাজের মতো পুরোহিত-বৃত্তিও একটি জন্মগত পেশা। সূত্রধরের পুত্র যেমন সূত্রধর হয়, কর্মকারের পুত্র যেমন কর্মকার হয়, ঠিক সেইভাবে পুরোহিতের সন্তানও পুরোহিত হয়। পুরোহিতকে বিবাহ করিতে হয়। অবিবাহিতকে হিন্দুরা অসম্পূর্ণ মনে করে। তাই ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানে অবিবাহিতের অধিকার নাই।

সন্ন্যাসীদের সম্পত্তি থাকে না, তাঁহারা বিবাহ করেন না। তাঁহাদের কোন সংস্থা নাই। তাঁহাদের একমাত্র বন্ধন—গুরুশিষ্যের বন্ধন। এই বন্ধনটি ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য। শুধু শিক্ষাদানের জন্য যিনি আসেন এবং সেই শিক্ষার জন্য কিছু মূল্যদান করিয়াই যাঁহার সহিত সম্বন্ধ চুকিয়া যায়, তিনি প্রকৃত শিক্ষক নন। ভারতবর্ষে ইহা সত্যসত্যই দত্তক গ্রহণের মতো। শিক্ষাদাতা গুরু আমার পিতার অধিক, আমি তাঁহার সন্তান—সব দিক দিয়া আমি তাঁহার সন্তান। সর্বাগ্রে—পিতারও অগ্রে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিব এবং তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিব; কারণ ভারতবাসীরা বলে, পিতা আমার জন্মদান করিয়াছেন, কিন্তু গুরু আমাকে মুক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সুতরাং গুরু পিতা অপেক্ষা মহত্তর। আজীবন আমরা গুরুর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পোষণ করি। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এই সম্বন্ধই বর্তমান। আমি আমার শিষ্যদিগকে দত্তক্রূপে গ্রহণ করি। অনেক সময় গুরু হয়তো তরুণ, শিষ্য বয়োবৃদ্ধ। তাহাতে

কিছু আসে যায় না। শিশু সন্তান, সে আমাকে 'পিতা' বলিয়া সম্বোধন করিবে; তাহাকে পুত্র বা কন্যারূপে সম্বোধন করিতে হইবে।

এক বৃদ্ধকে আমি গুরুরূপে পাইয়াছিলাম, তিনি এক অদ্ভুত লোক। পাণ্ডিত্য তাঁহার কিছুই ছিল না, পড়াশুনাও বিশেষ করেন নাই। কিন্তু শৈশব হইতেই সত্যের প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। স্বধর্ম-চর্চার মধ্য দিয়া তাঁহার সাধনার আরম্ভ। পরে তিনি অন্যান্য ধর্মমতের মধ্য দিয়া সত্যলাভের আকাঙ্ক্ষায় একের পর এক সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ে যোগদান করিলেন। কিছুকাল তিনি সম্প্রদায়গুলির নির্দেশ অনুযায়ী সাধন করিতেন, সেই সেই সম্প্রদায়ের ভক্তদের সহিত বাস করিয়া তাহাদের ভাবাদর্শে তন্ময় হইয়া যাইতেন। কয়েক বৎসর পর আবার তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ে যাইতেন। এইভাবে সকল সাধনার অন্তে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন—সব মতই ভালো। কোন ধর্মমতেরই তিনি সমালোচনা করিতেন না; তিনি বলিতেন, বিভিন্ন ধর্মমতগুলি একই সত্যে পৌঁছিবার বিভিন্ন পথ মাত্র। আর তিনি বলিতেন: এতগুলি পথ থাকা তো খুবই গৌরবের বিষয়, কারণ, ঈশ্বরলাভের পথ যদি একটিমাত্র হইত, তবে হয়তো উহা একজন ব্যক্তির পক্ষেই উপযোগী হইত। পথের সংখ্যা যত বেশী থাকিবে, ততই আমাদের প্রত্যেকের পক্ষে সত্যলাভের সুযোগ ঘটিবে। যদি এক ভাষায় শিখিতে না পারি, তবে আর এক ভাষায় শিখিবার চেষ্টা করিব, সকল ধর্মমতের প্রতি তাঁহার এমনই শ্রদ্ধা ছিল।

যে-সকল ভাব আমি প্রচার করিতেছি, সকলই তাঁহার চিন্তারাশির প্রতিধ্বনি মাত্র। মন্দ গুলি ছাড়া ইহাদের একটিও আমার নিজস্ব নয়। আমার নিজের বলিতে যাহা কিছু, সবই মিথ্যা ও মন্দ। সত্য ও কল্যাণকর যে-সকল কথা আমি উচ্চারণ করিয়াছি, সবই তাঁহার বাণীর প্রতিধ্বনিমাত্র। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার রচিত তাঁহার জীবনচরিত[১] পড়িয়া দেখুন।

তাঁহারই চরণপ্রান্তে কয়েকজন যুবকের সহিত একত্র আমি এই ভাবধারা লাভ করিয়াছি। তখন আমি বালকমাত্র। ষোল বৎসর বয়সে আমি তাঁহার

[১] 'Ramakrishna : His Life and Sayings' by Prof. Max Muller. ১৮৯৬ খৃঃ প্রথমে লণ্ডনে প্রকাশিত। ১৯৫১ খৃঃ অদ্বৈত আশ্রম কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত।

নিকট গিয়াছিলাম। অন্যান্য সঙ্গীদের কেহ আরও ছোট, কেহ বা একটু বড়; সবসুদ্ধ বার জন বা ততোধিক। সকলে মিলিয়া এই আদর্শ-প্রচারের কথা ভাবিলাম। শুধু প্রচার নয়, এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করিতে চাহিলাম। ইহার অর্থ—আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্য দিয়া হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা, বৌদ্ধের করুণা, খ্রীষ্টানের কর্মপ্রবণতা ও ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ফুটাইয়া তোলা; প্রতিজ্ঞা করিলাম, 'এই মুহূর্তেই আমরা একটি বিশ্বজনীন ধর্ম প্রবর্তন করিব; আর বিলম্ব নয়।'

আমাদের বৃদ্ধ গুরুদেব কখনও মুদ্রাস্পর্শ করিতেন না। সামান্য খাদ্য, বস্ত্র যাহা দেওয়া হইত, তাহাই তিনি গ্রহণ করিতেন, বেশী কিছু গ্রহণ করিতেন না। অন্য কোনরূপ দান তিনি গ্রহণ করিতেন না। এই-সকল অপূর্বভাব সত্ত্বেও তিনি অতি কঠোর ছিলেন, এই কঠোরতার ফলে তাঁহার কোনরূপ বন্ধন ছিল না। ভারতীয় সন্ন্যাসী আজ হয়তো রাজবন্ধু, রাজ-অতিথি—কাল তিনি ভিখারী বৃক্ষতলশায়ী। সকলের সংস্পর্শে তাঁহাকে আসিতে হইবে। সর্বদা তাঁহাকে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। প্রবাদ আছে, 'গড়ানো পাথরে শেওলা জমে না।' গত চৌদ্দ বৎসরকাল আমি কোনস্থানে তিন মাসের বেশী থাকি নাই —সর্বদা ঘুরিয়াছি। আমরা সকলেই ঐরূপ করিয়া থাকি।

মুষ্টিমেয় ঐ কয়টি বালক এই মহান্ ভাবধারার প্রেরণায় নিজেদের জীবন গড়িয়া তুলিতে লাগিল। সর্বজনীন ধর্ম, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি প্রভৃতি তত্ত্বের দিক দিয়া খুবই ভালো—কিন্তু কাজে এগুলি ফুটাইয়া তোলা চাই।

তারপর একদিন গুরুদেবের প্রয়াণকাল উপস্থিত হইল। সকলে মিলিয়া যথাসাধ্য তাঁহার সেবা করিলাম। আমাদের বন্ধু-বান্ধব বিশেষ কেহ ছিল না। এই সব অদ্ভুত ধারণা-পোষণকারী তরুণদের কথা কেই বা শুনিবে? অন্ততঃ ভারতবর্ষে তরুণেরা কিছুই নয়। একবার ভাবিয়া দেখুন, বারোটি বালক মানুষের কাছে বড় বড় আদর্শের কথা বলিতেছে; সেই আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে দৃঢ়সংকল্প। সকলেই হাসিত। হাসি হইতে ক্রমে গুরুতর বিষয়ে পরিণতি ঘটিল। রীতিমত অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঠাট্টা-বিদ্রূপ যতই প্রবল হইয়া উঠিল, আমরাও তত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম।

তারপর আসিল দারুণ দুঃসময়—ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে এবং অন্যান্য ভ্রাতাদের পক্ষেও। কিন্তু আমার পক্ষে সে কি নিদারুণ দুর্ভাগ্য। একদিকে

মা ও ভাইএরা। পিতার মৃত্যুতে আমরা তখন চরম দারিদ্র্যে উপনীত। বেশির ভাগ দিন না খাইয়া থাকিতে হইত। পরিবারের একমাত্র আমিই আশা-ভরসা—সাহায্য করিবার উপযুক্ত ছিলাম। আমার সম্মুখে তখন দুইটি জগৎ। একদিকে মাতা ও ভ্রাতাদিগকে না খাইয়া মরিতে দেখিতে হইবে; অপর দিকে বিশ্বাস করিতাম যে, গুরুদেবের ভাবধারা ভারতের তথা জগতের পক্ষে কল্যাণকর, সুতরাং এই আদর্শ জগতে প্রচার করিয়া কার্যে পরিণত করিতেই হইবে। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই দ্বন্দ্ব চলিল। কখন কখন পাঁচ ছয় দিন ধরিয়া অবিরত প্রার্থনা করিতাম। সে কি হৃদয়-বেদনা! আমি তখন দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করিতেছিলাম! তরুণ হৃদয়ের স্বাভাবিক স্নেহ আত্মীয়গণের দিকে টানিতেছে—অতি প্রিয়জনদের দুরবস্থা সহ্য করিতে পারিতেছি না। অপর পক্ষে সহানুভূতি জানাইবার একটি লোকও নাই। বালকের কল্পনার প্রতি কে সহানুভূতি দেখাইবে? যে কল্পনার জন্য অপরকে এত কষ্ট পাইতে হয়, সেই কল্পনার প্রতি কেই বা সহানুভূতি জানাইবে? একজন ছাড়া কেহই সহানুভূতি জানাইল না।

সেই একজনের সহানুভূতিই আশা ও আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিল। তিনি এক নারী। আমাদের মহাযোগী গুরুদেব তাঁহাকে অতি অল্প বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। পতি যৌবনে ধর্মোন্মাদনায় মগ্ন থাকাকালে একবার পত্নী তাঁহার সহিত দেখা করেন। অতিশৈশবে বিবাহ হইলেও বড় না হওয়া অবধি পত্নী স্বামীকে বিশেষ দেখিতে পান নাই। পরবর্তী কালে পত্নীর সহিত দেখা হইলে পতি বলিলেন, 'দেখ, আমি তোমার স্বামী। এই দেহের উপর তোমার দাবি আছে। কিন্তু বিবাহিত হইলেও যৌন-জীবন যাপন করা আমার পক্ষে অসম্ভব। এ বিষয়ে বিচারের ভার তোমাকেই দিলাম।' পত্নী সাশ্রুনয়নে বলিলেন, 'ভগবান্ তোমার সহায় হউন, তোমায় আশীর্বাদ করুন। আমি কি তোমাকে অধঃপাতে লইয়া যাইব? যদি পারি, তোমাকে সাহায্যই করিব। তুমি তোমার সাধনা লইয়া থাকো।'

সেই নারী এরূপ প্রকৃতির ছিলেন। সাধনায় মগ্ন হইয়া স্বামী ক্রমে নিজের ভাবে সন্ন্যাসী হইয়া গেলেন। দূর হইতে পত্নী যথাশক্তি সাহায্য করিতে লাগিলেন। স্বামী যখন অধ্যাত্ম-জগতে এক বিরাট পুরুষ হইয়া দাঁড়াইলেন, স্ত্রী ফিরিয়া আসিলেন। বলিতে গেলে তিনিই তাঁহার প্রথম শিষ্যা। অবশিষ্ট

জীবন তিনি স্বামীর সেবায় অতিবাহিত করিলেন। বাঁচিয়া আছেন, কি মরিয়া গিয়াছেন—স্বামীর সে খেয়াল ছিল না। কথা বলিতে বলিতে স্বামী এত তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসিলেও তাঁহার হুঁশ হইত না। জ্বলন্ত অঙ্গার! সদাসর্বদা তিনি এমনি দেহজ্ঞান-রহিত থাকিতেন।

সেই নারী তাঁহারই সহধর্মিণী, তিনি ঐ বালকদের আদর্শের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতেন; কিন্তু তাঁহার কোন শক্তি ছিল না। আমাদের অপেক্ষা তিনি দরিদ্র ছিলেন। যাহা হউক আমরা সংগ্রামে ঝাঁপ দিলাম। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতাম যে, এই ভাবধারা একদিন সমগ্র ভারতবর্ষকে যুক্তি-পরায়ণ করিয়া তুলিবে এবং নানাদেশ ও নানা জাতির কল্যাণসাধন করিবে। এই বিশ্বাস হইতেই স্থির প্রতীতি জন্মিল যে, এই ভাবরাশি নষ্ট হওয়া অপেক্ষা কয়েকজন লোকের দুঃখ-বরণ করা ভালো। একজন মা ও দুইটি ভাই যদি মরে, কি আসে যায়? এও তো ত্যাগ। ত্যাগ করো—ত্যাগ ছাড়া কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। বক্ষ চিরিয়া হৃৎপিণ্ড বাহির করিতে হইবে এবং সেই রক্তসিক্ত হৃদয় বেদীমূলে উৎসর্গ দিতে হইবে। তবেই তো মহৎ কার্য সাধিত হয়। অন্য কোন পথ আছে কি? কেহই সেই পথ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আপনাদের মধ্যে যে-কেহ কোন মহৎ কার্য সাধন করিয়াছেন, তাঁহাকেই ভাবিয়া দেখিতে বলি। সে কী বিরাট মূল্য! সে কী বেদনা! কী নিদারুণ যন্ত্রণা! প্রতিটি জীবনে প্রতিটি সফলতার পিছনে কী ভয়ানক দুঃখভোগ! আপনারা সকলেই তাহা জানেন।

এইভাবেই আমাদের সেই তরুণ দলটির দিন কাটিতে লাগিল। চারি-পাশের সকলের নিকটে অপমান ও লাঞ্ছনাই পাইলাম। অবশ্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিতে হইত। এখানে ওখানে দু-এক টুকরা রুটি মিলিত। একটি অতি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ি বাসস্থান হিসাবে জুটিল, উহার তলায় গোখুরা সাপগুলি ফোঁস ফোঁস করিত। অল্প ভাড়ায় বাড়ি পাওয়ায় আমরা সেই গৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিলাম। উদ্দেশ্য—ক্রমশঃ এই ভাবধারা প্রচারের চেষ্টা। দশ বৎসর কাটিয়া গেল—কোন আলোকরেখাই দেখিতে পাইলাম না! দশটা বছর এভাবে কাটিয়া গেল! সহস্রবার হতাশা আসিল; কিন্তু একটি

জিনিস আমাদের সর্বদা আশান্বিত করিয়া রাখিয়াছিল—সেটি হইল আমাদের পরস্পরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও গভীর ভালবাসা। প্রায় একশত নরনারী আমার চারিপাশে রহিয়াছে; কাল যদি আমি সাক্ষাৎ শয়তান হইয়া যাই, তাহারা বলিবে, 'আমরা এখনও আছি! আমরা তোমাকে কখনই ত্যাগ করিব না!' এই ভালবাসাই পরম আশীর্বাদ।

সুখে দুঃখে, দুর্ভিক্ষে যাতনায়, শ্মশানে, স্বর্গে বা নরকে যে আমাকে কখনই ত্যাগ করে না, সেইতো বন্ধু। এ বন্ধুত্ব কি তামাসা? এমন বন্ধুত্বের দ্বারা মোক্ষ লাভও সম্ভব। আমরা যদি এমনভাবে ভালবাসিতে পারি, তবে এই ভালবাসাই আমাদের মুক্তি আনিয়া দিবে। এই বিশ্বস্ততার মধ্যেই একাগ্রতার সার নিহিত। যদি তোমার সেই বিশ্বাস, সেই শক্তি, সেই ভালবাসা থাকে, তবে জগতে তোমার কোন দেবার্চনার প্রয়োজন নাই। সেই দুঃখের দিনে এই ভালবাসাই আমাদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। সেই ভালবাসাই আমাদিগকে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা এবং সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত পরিচালিত করিয়াছিল।

সেই তরুণদলটি এইভাবে সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম। শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধাচরণ পাইলাম, সাহায্য আসিল অতি অল্পক্ষেত্রে। কারণ একটি দোষ আমাদের ছিল—আমরা ছিলাম দুঃখদারিদ্র্যে রুক্ষচিত্ত। জীবনে যাহাকে নিজের পথ নিজেই করিয়া লইতে হয়, সে একটু রুক্ষ হয়; শান্ত কোমল ও ভদ্র হইবার—'ভদ্র মহোদয় ও মহোদয়া' ইত্যাদি বলিবার বেশী সময় তাহার থাকে না। নিজেদের জীবনেই আপনারা উহা সর্বদা লক্ষ্য করিয়াছেন। এইরূপ ব্যক্তি যেন একটি আধারে অযত্নরক্ষিত অমসৃণ হীরকখণ্ড।

আমরা ঠিক সেইরূপ ছিলাম। 'কোন আপস চলিবে না'—এই ছিল আমাদের মূলমন্ত্র। 'ইহাই আদর্শ এবং এ আদর্শ কার্যে পরিণত করিতে হইবে। মরিয়াও—রাজার নিকট যেমন এ আদর্শ প্রচার করিব, চাষার নিকটও তেমনি এ আদর্শ তুলিয়া ধরিব।' স্বভাবতই আমরা বিরোধিতার সম্মুখীন হইলাম।

কিন্তু মনে রাখিবেন, ইহাই জীবনের অভিজ্ঞতা; যদি আপনি যথার্থই

পরের মঙ্গল কামনা করেন, বিশ্বজগৎ আপনার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াও কিছুই করিতে পারিবে না। আপনার শক্তির নিকট তাহারা পরাস্ত হইবেই। যদি আপনি আন্তরিক ও প্রকৃতই নিঃস্বার্থ হন, স্বয়ং ঈশ্বরের সমস্ত শক্তি আপনার মধ্যে জাগ্রত থাকিয়া সমস্ত বাধা-বিপত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবে। সেই বালকের দল এমনি ছিল। তাহারা ছিল শিশুর মতো প্রকৃতি-রাজ্যের সদ্যঃপ্রস্ফুটিত ও পবিত্র প্রাণ; গুরুদেব বলিতেন, 'ভগবানের বেদীমূলে আমি অনাঘ্রাত পুষ্প ও অস্পৃষ্ট ফলই নিবেদন করিতে চাই।' মহাপুরুষের সেই বাণী আমাদিগকে সঞ্জীবিত করিত। বলিতে গেলে কলিকাতার পথে তিনি যে-সব বালককে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, তাহাদের ভবিষ্যৎ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। 'এই বালকটি বা ঐ বালকটি ভবিষ্যতে কী হয়, দেখিও'—তাঁহার এই ধরনের কথা শুনিয়া লোকে ঠাট্টা করিত। অবিচলিত বিশ্বাসে তিনি বলিতেন, 'মা আমাকে ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমি নিজে দুর্বল হইতে পারি, কিন্তু মা যখন এরূপ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার ভুল হওয়া কখনও সম্ভব নয়। এইরূপ হইবেই।'

দশটি বৎসর কোন আশার আলো ছাড়াই কাটিয়া গেল। ইতিমধ্যে আমার শরীর ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। কখন রাত্রি নয়টায় একবেলা আহার কখন ভোরে আটটায় একবেলা আহার, তাও আবার তিনদিন পরে—এবং সর্বদাই অতি সামান্য কদর্য অন্ন। পরিণামে শরীরের উপর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ভিখারীকে কেই বা ভালো খাবার দেয়? আবার ভালো জিনিস দিবার সামর্থ্যও ভারতবাসীর নাই। শুধু একবেলা আহারের জন্য বেশির ভাগ সময় পায়ে হাঁটিয়া, তুষারশৃঙ্গ চড়াই করিয়া, কখন দশ মাইল পথ দুর্গম পর্বত চড়াই করিয়া চলিয়াছি। ভারতবর্ষে রুটিতে খামির দেয় না। কখন কখন এই খামির-না-দেওয়া রুটি বিশ-ত্রিশদিন ধরিয়া সঞ্চিত রাখা হয়, তখন ইহা ইটের চেয়েও শক্ত হয়। ভিখারীকে সেই রুটির অংশ দেওয়া হয়। একবেলা আহারের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আমাকে দ্বারে দ্বারে ফিরিতে হইত। তদুপরি এই ইটের মতো শক্ত রুটি চিবাইতে গিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িত। এই রুটি চিবাইতে সত্যসত্যই দাঁত ভাঙে। নদী হইতে জল আনিয়া একটি পাত্রে ঐ রুটি ভিজাইয়া রাখিতাম। মাসের পর মাস ঐভাবে থাকিতে হইয়াছে—ফলে শরীর অবশ্যই খারাপ হইতেছিল।

তারপর ভাবিলাম, ভারতবর্ষে চেষ্টা করিয়াছি, এবার অন্য দেশে করা যাক। এমনি সময় আপনাদের ধর্ম-মহাসভার অধিবেশন হইবার কথা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে একজনকে ঐ সভায় প্রেরণ করিতে হইবে। আমি তখন একজন ভবঘুরে। তবু বলিলাম, 'ভারতবাসী তোমরা আমাকে প্রেরণ করিলে আমি যাইব। আমার কোন ক্ষতির ভয় নাই, ক্ষতি যদি হয় তাহাও গ্রাহ্য করি না।' অর্থ সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। অনেকদিনের আপ্রাণ চেষ্টায় শুধু আসিবার খরচ যোগাড় হইল; এবং আমি এদেশে আসিলাম। ধর্ম-মহাসভার দুই-এক মাস পূর্বে আমি আসিলাম, এবং পরিচয়হীন অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইলাম।

তারপর ধর্ম-মহাসভা আরম্ভ হইল, সেইসময় কতিপয় সহৃদয় বন্ধুর সহিত আলাপ হইলে তাঁহারা আমাকে খুবই সাহায্য করিলেন। কিছু কিছু অর্থ-সংগ্রহ, দুইটি পত্রিকা প্রকাশ প্রভৃতি যৎসামান্য কাজ আরম্ভ করিলাম। তারপর ইংলণ্ডে গেলাম। সেখানেও কাজ চলিল। সেই সময় আমেরিকায় থাকিয়াও ভারতের জন্য কাজ চালাইলাম।

ভারতের জন্য যে পরিকল্পনা আমার মনে রূপ পাইয়াছে, তাহা এই: আমি আপনাদিগকে ভারতের সন্ন্যাসীদের কথা বলিয়াছি। কেমন করিয়া আমরা কোনরূপ মূল্য গ্রহণ না করিয়া অথবা একখণ্ড রুটির মূল্যে দ্বারে দ্বারে ধর্মপ্রচার করিয়া থাকি, তাহাও বলিয়াছি। সেইজন্যই ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তিও ধর্মের মহত্তম ভাবরাশি ধারণ করে। এ সকলই এই সন্ন্যাসীদের কাজ। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যায়—'ইংরেজ কাহারা?' সে উত্তর দিতে পারিবে না। হয়তো বলিবে, 'পুঁথিতে যে-সব দৈত্যদানবের কথা আছে—ইংরেজরা তাহাদেরই বংশধর—তাই না?' 'তোমাদের শাসনকর্তা কে?' 'জানি না।' 'শাসনতন্ত্র কি?'—তাহারা জানে না। কিন্তু দর্শনের মূলতত্ত্ব তাহারা জানে। যে ইহজগতে তাহারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে, সেই জগৎ সম্বন্ধে তাহাদের ব্যাবহারিক জ্ঞানেরই অভাব। এই-সব লক্ষ লক্ষ মানুষ পরলোকের জন্য প্রস্তুত—এই কি যথেষ্ট? কখনই নয়। একটুকরা ভাল রুটি এবং একখণ্ড ভাল কম্বল তাহাদের প্রয়োজন। বড় প্রশ্ন এই, এ-সকল লক্ষ লক্ষ পতিত জনগণের জন্য সেই ভালো রুটি আর ভালো কম্বল কোথা হইতে মিলিবে?

প্রথমেই আপনাদিগকে বলিব, তাহাদের বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে, কারণ পৃথিবীতে তাহারা সবচেয়ে শান্ত জাতি। তাহারা যে ভীরু, তা নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাহারা অসুর-পরাক্রমে যুদ্ধ করে। ইংরেজের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদল ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত। মৃত্যুকে তাহারা গ্রাহ্য করে না। তাহাদের মনোভাব এই : 'এ জন্মের পূর্বে অন্ততঃ বিশ বার মরিয়াছি, হয়তো তারপর আরও অসংখ্যবার মরিব। তাহাতে কী আসে যায়?' তাহারা কখনও পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। বিশেষ ভাবপ্রবণ না হইলেও যোদ্ধা হিসাবে তাহারা ভালো।

তাহাদের জন্মগত প্রবৃত্তি অবশ্য কৃষিকর্মে। আপনি তাহাদের সর্বস্ব কাড়িয়া লউন, তাহাদের হত্যা করুন, করভারে জর্জরিত করুন, যাহা ইচ্ছা করুন—যতক্ষণ তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে ধর্ম আচরণ করিতে দিতেছেন, তাহারা শান্ত ও নম্র থাকিবে। তাহারা কখনও অন্যের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না। 'আমাদের ভাবানুযায়ী ঈশ্বরের আরাধনা করিবার অধিকার আমাদের দাও আর সব কাড়িয়া লও'—ইহাই তাহাদের মনোভাব। ইংরেজরা যখনই ঐ জায়গায় হস্তক্ষেপ করে, অমনি গণ্ডগোল শুরু হয়। উহাই ১৮৫৭ খৃঃ সিপাহি বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ—ধর্ম লইয়া নির্যাতন ভারতবাসী সহ্য করিবে না। ভারতবাসীর ধর্মে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াই বিশাল মোগল সাম্রাজ্য এক কথায় শূন্যে মিলাইয়া গেল!

অধিকন্তু ভারতের জনসাধারণ শান্ত, নম্র, ভদ্র—সর্বোপরি তাহারা পাপাসক্ত নয়। কোনপ্রকার উত্তেজক মাদকদ্রব্য প্রচলিত না থাকায় তাহারা অন্য যে কোন দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। এখানকার বস্তি-জীবনের সহিত তুলনা করিয়া আপনারা ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের সুন্দর নৈতিক জীবন বুঝিতে পারিবেন না। এখানে বস্তি মানেই দারিদ্র্য! কিন্তু ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের অর্থ পাপ, নোংরামি ও অপরাধ-প্রবণতা নয়। এদেশে এমন ব্যবস্থা যে, নোংরা ও অলস ব্যক্তিরাই দরিদ্র হয়। নগর-জীবন ও উহার বিলাসব্যসন চায়, এমন মূর্খ বা বদমাস ব্যতীত আর কাহাকেও এ-সব দেশে দরিদ্র থাকিতে হয় না। তাহারা কিছুতেই গ্রামে যাইবে না। তাহারা বলে, 'আমরা এই শহরেই বেশ ফুর্তিতে আছি। তোমরা অবশ্যই আমাদের আহার যোগাইবে।' ভারতবর্ষের ব্যাপার এরূপ নয়,

সেখানে গরীবেরা উদয়াস্ত খাটিয়া মরে, আর একজন আসিয়া তাহাদের শ্রমের ফল কাড়িয়া লয়। তাহাদের সন্তানেরা উপবাসী থাকে। লক্ষ লক্ষ টন গম ভারতে উৎপন্ন হওয়া সত্ত্বেও ক্বচিৎ কখনও একটি কণা কৃষকের মুখে যায়। আপনারা পশু-পক্ষীকেও যে শস্য খাওয়াইতে চান না, ভারতের কৃষক সেই শস্যে প্রাণ ধারণ করে।

এই পবিত্র ও সরল কৃষককুল কেন দুঃখভোগ করিবে? ভারতের নিমজ্জমান জনসাধারণ ও অবনমিত নারীসমাজের কথা আপনারা এত শুনিতে পান, কিন্তু কেহই তো আমাদের সাহায্য করিতে অগ্রসর হন না। অনেকে বলেন: তোমরা যদি নিজেদের স্বভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তন কর, তবেই তোমরা ভাল হইবে, তবেই তোমাদের সাহায্য করা চলে। হিন্দুদের সাহায্য করা বৃথা। ইহারা বিভিন্ন জাতির ইতিহাস জানে না। ভারতবাসী যদি তাহাদের ধর্ম ও আনুষঙ্গিক রীতিনীতিগুলি পরিবর্তন করে, তবে আর ভারতবর্ষ থাকিবে না, কারণ ধর্মই ভারতবাসীর প্রাণশক্তি। ভারতীয় জাতিই লুপ্ত হইয়া গেলে আপনাদের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য সেখানে আর কেহই থাকিবে না।

আর, একটি মহৎ শিক্ষণীয় বিষয় আছে, বস্তুতঃ আপনারা কাহাকেও সাহায্য করিতে পারেন না। আমরা কে কাহার জন্য কি করিতে পারি? আপনি আপনার রীতি-অনুসারে গড়িয়া উঠিতেছেন, আর আমি আমার ভাবে। সকল পথই শেষ পর্যন্ত রোমে আসিয়া মিলিত হয়—এ কথাটি মনে রাখিয়া আমি হয়তো আপনাদের জীবনে, কিছুটা গতি সঞ্চার করিতে পারি। জাতীয় জীবন ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। এ পর্যন্ত কোন জাতিগত সভ্যতাই সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই। ঐ সভ্যতাকে কিছুটা আগাইয়া দাও, তবেই উহা স্বীয় লক্ষ্যে পৌছিবে। ঐ সভ্যতাকে আমূল পরিবর্তিত করিতে চেষ্টা করিবেন না। একটি জাতির প্রচলিত প্রথা, নিয়মকানুন, রীতিনীতি বাদ দিলে তাহার আর কী অবশিষ্ট থাকে? ঐগুলিই জাতিকে সংহত করিয়া রাখে।

কিন্তু অতি পণ্ডিত এক বিদেশী আসিয়া বলিলেন, 'দেখ তোমাদের সহস্র বৎসরের রীতিনীতি নিয়ম-কানুন ছাড়িয়া দিয়া আমাদের এই খালি পাত্রটি গ্রহণ কর।'—ইহা নিতান্ত মূর্খতা

পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে হইবে, কিন্তু এ-বিষয়ে আমাদের আর একটু অগ্রসর হইতে হইবে। সাহায্য করিতে গিয়া নিঃস্বার্থ হওয়া প্রয়োজন। 'আমি তোমাকে যেরূপ করিতে বলি, ঠিক সেরূপ করিলে তবে তোমায় সাহায্য করিব, নতুবা নয়।'—ইহার নাম কি সাহায্য ?

অতএব হিন্দু যদি তোমাদিগকে আধ্যাত্মিক সাহায্য করিতে চায়, যে সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের কোন প্রশ্ন থাকিবে না ; সাহায্য—সেবা, পূর্ণ নিঃস্বার্থতা। আমি দিলাম, এখানেই উহা শেষ। আমার নিকট হইতে উহা চলিয়া গেল। আমার মন, আমার শক্তি, আমার যাহা কিছু দিবার আছে, সব দিয়াছি, দেওয়ার ভাব লইয়াই দিয়াছি, আর কিছু নয়। অনেক সময় দেখিয়াছি, যাহারা অর্ধেক পৃথিবী শোষণ করিয়া ফিরিয়াছে, তাহারাই 'অসভ্য' হিদেনদিগের ধর্মান্তরিত করার জন্য কুড়ি হাজার ডলার দান করিয়াছে। কিসের জন্য ? ঐ হিদেনদের উপকারের জন্য, না তাহাদের নিজ নিজ আত্মার জন্য ? একবার ভাবিয়া দেখুন।

পাপের সমুচিত ফল ফলিতেছে। আমরা মানুষেরা নিজের চক্ষুকেই ফাঁকি দিতে চাই। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে স্বস্বরূপে তিনি সদা বিরাজিত। তিনি তো কোনদিন ভোলেন না। আমরা কোনদিনই তাঁহাকে প্রতারিত করিতে পারি না। তাঁহার চোখকে কখন ফাঁকি দিতে পারি না। যথার্থ উপকারের প্রেরণা সহস্র বৎসর পরেও ফলবতী হয়। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও সুযোগ পাইলেই তাহা আবার বজ্রের মতো ফাটিয়া পড়িতে চায়। আর যে ভাবাবেগের পশ্চাতে স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি থাকে—সংবাদপত্রে শিরোনামার সমারোহ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের করতালি লাভ করিলেও উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবেই।

আমি কোন প্রকার গর্ব করিয়া বলিতেছি না, কিন্তু মনে রাখিবেন—আমি আপনাদিগকে সেই মুষ্টিমেয় যুবকদের কথা বলিতেছি। আজ ভারতবর্ষে এমন একটি গ্রাম নাই, এমন নরনারী নাই, যাহারা তাহাদের কাজ জানে না এবং তাহাদের আন্তরিক আশীর্বাদ করে না। এমন একটি দুর্ভিক্ষ নাই, যেখানে এই যুবকদল ঝাঁপাইয়া পড়িয়া যতগুলি মানুষকে পারে বাঁচাইবার চেষ্টা করে না। এই সেবা হৃদয়কে স্পর্শ করিবেই। দেশবাসী তাহাদের কথা জানিতে পারিয়াছে। যখনই সম্ভব, তাহাদের সাহায্য করুন, কিন্তু সেই সাহায্যের

পিছনে কী উদ্দেশ্য কাজ করিতেছে, লক্ষ্য রাখিবেন। স্বার্থপূর্ণ হইলে সেই দান দাতা বা গ্রহীতা—কাহারও উপকারে আসিবে না। সাহায্য যদি নিঃস্বার্থ হয়, তবে উহা গ্রহীতার পক্ষে কল্যাণকর হইবে, এবং লক্ষগুণ কল্যাণকর হইবে আপনার নিজের পক্ষে; আপনার জীবন যেমন সত্য, এ-কথা তেমনি নিশ্চিত সত্য, জানিবেন। জগদীশ্বরকে কখনও ফাঁকি দেওয়া যায় না। কর্মফলকে ফাঁকি দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং ভারতের জনগণের কাছে পৌঁছানোই আমার পরিকল্পনা। ধরুন, আপনি সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্যালয় স্থাপন করিতে সুরু করিলেন, তথাপি আপনি তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিবেন না। কেমন করিয়া পারিবেন? চার বৎসরের একটি ছেলে বরং লাঙ্গল ধরিবে, অথবা অন্য কোন কাজ করিবে, তবু সে আপনার বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবে না। তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ে যাওয়া অসম্ভব। আত্মরক্ষাই মানুষের প্রথম প্রেরণা। কিন্তু যদি পর্বত মহম্মদের কাছে না আসে, মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। আমি বলি, শিক্ষা কেন দ্বারে দ্বারে যাইবে না? চাষার ছেলে যদি বিদ্যালয়ে আসিতে না পারে, তাহা হইলে কৃষিক্ষেত্রে অথবা কারখানায়—যেখানে সে আছে, সেখানেই তাহাকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে। ছায়ার মতো তাহার সঙ্গে সঙ্গে যাও। শত সহস্র সন্ন্যাসী জনসাধারণকে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিদ্যা দান করিতেছেন; কেন এই সন্ন্যাসীরাই জাগতিক ক্ষেত্রেও বিদ্যা-বুদ্ধি বিতরণ করিবেন না? জনসাধারণের কাছে তাহারা ইতিহাস বা অন্যান্য বহু বিষয়ের কথা বলিবেন না কেন? শ্রবণের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ হয়। যে শিক্ষা আমরা মায়েদের কাছ হইতে কানে শুনিয়া লাভ করিয়াছি, উহাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। গ্রন্থাদি অনেক পরে দেখা দিয়াছে। পুঁথিগত বিদ্যা কিছুই নয়। কানে শুনিয়া আমরাই চরিত্র-গঠনকারী শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহ পাই। তারপর জনসাধারণের আগ্রহ যখন বাড়িবে, তখন তাহারা আপনাদের বইও পড়িবে। প্রথমে কাজ সুরু করিয়া দেওয়া যাক—ইহাই আমার মনোভাব।

দেখুন, আপনাদিগকে অবশ্যই বলিব সন্ন্যাস-ব্যবস্থায় আমি খুব বেশী বিশ্বাসী নই। ঐ ব্যবস্থার অনেক গুণ আছে, অনেক দোষও আছে। সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য থাকা উচিত। কিন্তু ভারতে সন্ন্যাস-ভাবেই সমস্ত শক্তি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমরা সন্ন্যাসীরা শ্রেষ্ঠ শক্তির প্রতীক।

সন্ন্যাসী রাজার চেয়ে বড়। ভারতবর্ষে এমন কোন শাসক-নৃপতি নাই, যিনি 'গৈরিকবসন'-ধারীর সম্মুখে বসিয়া থাকিতে সাহস করেন। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান। যদিও এই সন্ন্যাসীরাই জনগণের আত্মরক্ষার অবলম্বন। তবুও ভাল লোকের হাতেও এত ক্ষমতা থাকা ঠিক নয়। সন্ন্যাসীরা পৌরোহিত্য ও অধ্যাত্মজ্ঞানের মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাঁহারা জ্ঞানবিস্তার ও সংস্কারের কেন্দ্র স্বরূপ! ইহারা ঠিক ইহুদীদের ভাববাদীদের (Prophets) মতো, এই মহাপুরুষগণ সর্বদা পৌরোহিত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীরাও এই ধরনের। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এতখানি ক্ষমতা সেখানে ভাল নয়। অন্য কোন উন্নততর পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। কিন্তু স্বল্পতম বাধার পথেই কাজ করা সম্ভব। সমগ্র জাতির আত্মা সন্ন্যাসের পক্ষপাতী। আপনি ভারতবর্ষে গৃহস্থরূপে কোন ধর্ম প্রচার করুন, হিন্দু জনসাধারণ বিমুখ হইয়া প্রস্থান করিবে। যদি আপনি সংসারত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে হিন্দুরা বলিবে, 'লোকটি ভাল, সংসার-ত্যাগী, খাঁটি লোক, মুখে যা বলে কাজেও তাই করে।' আমি যাহা বলিতে চাহিতেছি, তাহা এই যে, সন্ন্যাস একটি অসাধারণ শক্তির প্রতীক। আমরা এইটুকু করিতে পারি, ইহার রূপান্তর সাধন করিতে পারি, অন্য রূপ দিতে পারি—পরিব্রাজক সন্ন্যাসীদের হাতে অবস্থিত এই প্রচণ্ড শক্তির রূপান্তর ঘটাইতে হইবে, উহাই জনসাধারণকে উন্নত করিয়া তুলিবে।

পরিকল্পনাটি এতক্ষণে কাগজে কলমে সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলি, আমি আদর্শবাদের স্তর হইতেই এ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এ পর্যন্ত পরিকল্পনাটি শিথিল ও আদর্শবাদীই ছিল। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই উহা সংহত ও নিখুঁত হইতে লাগিল; প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আমি উহার ত্রুটি প্রভৃতি লক্ষ্য করিলাম।

বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ করিতে গিয়া আমি কী আবিষ্কার করিলাম? প্রথমতঃ এই সন্ন্যাসীদের শিক্ষাদান-পদ্ধতিতে শিক্ষিত করিয়া তুলিবার কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন। যেমন ধরুন, আমার একটি লোককে আমি ক্যামেরা দিয়া পাঠাইলাম; তাহাকে ঐ-সকল বিষয়ে সর্বপ্রথম শিক্ষিত হইতে হইবে। ভারতবর্ষে প্রায় সব লোকই অশিক্ষিত, সুতরাং শিক্ষার জন্য প্রচণ্ড শক্তিশালী

বহু কেন্দ্র প্রয়োজন। ইহার অর্থ কি দাঁড়ায়?—টাকা। আদর্শবাদের জগৎ হইতে আপনি প্রতিদিনের কর্মক্ষেত্রে নামিয়া আসিলেন।

আমি আপনাদের দেশে চার বৎসর ও ইংলণ্ডে দুই বৎসর কঠোর পরিশ্রম করিয়াছি। কয়েকজন বন্ধু আমাকে সাহায্য করিয়াছেন বলিয়া আমি কৃতজ্ঞ। তাঁহাদের একজন আজ আপনাদের মধ্যেই এখানে আছেন। আমেরিকান ও ইংরেজ বন্ধুরা আমার সঙ্গে ভারতে গিয়াছেন এবং অতি-সাধারণভাবে কাজের সূচনা হইয়াছে। কয়েকজন ইংরেজ সঙ্গে যোগদান করিয়াছেন। একজন হতভাগ্য দরিদ্র কর্মী অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। এক ইংরেজ দম্পতি অবসর গ্রহণ করিয়া, নিজেদের সামান্য যাহা কিছু সংস্থান আছে, তাহা দ্বারা হিমালয়ে একটি কেন্দ্রস্থাপন করিয়া শিক্ষা দিতেছেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার দ্বারা স্থাপিত একটি পত্রিকা—'প্রবুদ্ধ ভারত' (Awakened India) দিয়াছি। তাঁহারা জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাদান ও অন্যান্য কাজ করিতেছেন। আমার আর একটি কেন্দ্র আছে কলিকাতায়। সকল বৃহৎ আন্দোলনই রাজধানী হইতে আরম্ভ করা প্রয়োজন। রাজধানী কাহাকে বলে? রাজধানী একটি জাতির হৃৎপিণ্ড। সমুদয় রক্ত হৃৎপিণ্ডে আসিয়া জমা হয়, সেখান হইতে সর্বত্র সঞ্চারিত হয়; তেমনি সব সম্পদ্, সব ভাবাদর্শ, সব শিক্ষা, সব আধ্যাত্মিকতা প্রথমে রাজধানীর অভিমুখে গিয়া সে-স্থান হইতে অন্যত্র সঞ্চারিত হয়।

এ-কথা বলিতে আমি আনন্দ বোধ করিতেছি যে, অতি সাধারণভাবে আমি কাজ আরম্ভ করিয়াছি। কিন্তু ঠিক ঐরূপ কাজ আমি সমান্তরালভাবে মেয়েদের জন্যও করিতে চাই। আমার আদর্শ—প্রত্যেকে স্বাবলম্বী হইবে। আমার সাহায্য শুধু দূর হইতে। ভারতীয় নারী, ইংরেজ নারী—এবং আশা করি, আমেরিকান নারীরাও এই ব্রত গ্রহণ করিবে। যখনই তাহারা কাজে হাত দিবে, অমনি আমি হাত গুটাইয়া লইব। কোন পুরুষ নারীর উপর হুকুম চালাইবে না। কোন নারীও পুরুষের উপর হুকুম চালাইবে না। প্রত্যেকেই স্বাধীন। যদি কোন বন্ধন থাকে, তবে তাহা কেবল প্রীতির বন্ধন। পুরুষ নারীর জন্য যাহা করিয়া দিতে পারে, তাহা অপেক্ষা নারী অনেক ভালভাবে নিজের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে। পুরুষেরা মেয়েদের ভাগ্য গঠনের ভার গ্রহণ করাতেই নারীজাতির যত কিছু অনিষ্ট হইয়াছে। মূলে কোন ভুল করিয়া

আমি কাজ করিতে চাই না। একটি ক্ষুদ্র ভ্রান্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া চলিবে এবং শেষ অবধি এত বৃহৎ আকার ধারণ করিবে যে, উহাকে সংশোধন করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতরাং আমি যদি ভুল করিয়া পুরুষকে নারীর কর্মধারা নির্ণয় করিবার কাজে লাগাই, তাহা হইলে নারীরা কখনও ঐ নির্ভরতার ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে না—উহাই প্রথা হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু আমার একটি সুবিধা আছে। আপনাদিগকে আমার গুরুদেবের সহধর্মিণীর কথা বলিয়াছি। আমাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা বিদ্যমান। তিনি কখন আমাদের উপর হুকুম চালান না। সুতরাং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। কর্মের এই অংশটি নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

ভারতবন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার

৬ই জুন ১৮৯৬ খৃঃ লণ্ডন হইতে 'ব্রহ্মবাদিন্' পত্রিকার[১] জন্য লিখিত।

'ব্রহ্মবাদিন্'-সম্পাদক মহাশয়,

যদিও আমাদের 'ব্রহ্মবাদিনের' পক্ষে কর্মের আদর্শ চিরকালই থাকিবে— 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' কর্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই নয়—তথাপি কোন অকপট কর্মীই নিজেকে পরিচিত না করিয়া এবং অন্ততঃ কিছুটা প্রসিদ্ধি অর্জন না করিয়া কর্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন না।

আমাদের কার্যের আরম্ভ খুবই ভাল হইয়াছে, আর আমাদের বন্ধুগণ এই বিষয়ে যে দৃঢ় আন্তরিকতা দেখাইয়াছেন, শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেও পর্যাপ্ত বলা হইল বলিয়া বোধ হয় না। অকপট বিশ্বাস ও সৎ অভিসন্ধি নিশ্চয়ই জয়লাভ করিবে, আর এই দুই অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিও নিশ্চয়ই সর্ববিঘ্ন পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

কপট অলৌকিকজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ হইতে সর্বদা দূরে থাকিবে। অলৌকিক জ্ঞান হওয়া যে অসম্ভব—তাহা নয়, তবে এই জগতে যাহারা এরূপ জ্ঞানের দাবি করে, তাহাদের মধ্যে পনর-আনার কাম-কাঞ্চন-যশঃস্পৃহারূপ গুপ্ত অভিসন্ধি আছে, আর বাকি এক আনার মধ্যে তিন-পাই লোকের অবস্থা ডাক্তার-কবিরাজের সস্নেহ যত্নের বিষয় বটে, কিন্তু দার্শনিকগণের নয়।

আমাদের প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন—চরিত্রগঠন, যাহাকে 'প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞা' বলা যায়। ইহা যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির আবশ্যক, ব্যক্তির সমষ্টি সমাজেও তদ্রূপ। প্রত্যেক নূতন উদ্যম, এমন কি ধর্মপ্রচারের নূতন উদ্যমও জগৎ সন্দেহের চক্ষে দেখে বলিয়া বিরক্ত হইও না। তাহাদের অপরাধ কি? কতবার কত লোকে তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে! যতই সংসার কোন নূতন সম্প্রদায়কে সন্দেহের চোখে দেখে, অথবা উহার প্রতি কতকটা বৈরভাবাপন্ন হয়, ততই উহার পক্ষে মঙ্গল। যদি

১ মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত ইংরেজী পাক্ষিক পত্রিকা।

এই সম্প্রদায়ে প্রচারের উপযুক্ত কোন সত্য থাকে, যদি বাস্তবিক কোন অভাব-মোচনের জন্যই উহার জন্ম হইয়া থাকে, তবে শীঘ্রই নিন্দা প্রশংসায় এবং ঘৃণা প্রীতিতে পরিণত হয়। আজকাল লোকে ধর্মকে কোনরূপ সামাজিক বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়রূপে গ্রহণ করে। এই বিষয়ে সাবধান থাকিবে। ধর্মের উদ্দেশ্য ধর্ম। যে ধর্ম কেবল সাংসারিক সুখের উপায়স্বরূপ, তাহা আর যাহাই হউক, ধর্ম নয়। আর অবাধে ইন্দ্রিয়সুখভোগ ব্যতীত মনুষ্যজীবনের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই—এ-কথা বলিলে ধর্মের বিরুদ্ধে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এবং মনুষ্য-প্রকৃতির বিরুদ্ধে ঘোরতর অপরাধ করা হয়।

যে ব্যক্তিতে সত্য, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থপরতা বর্তমান, স্বর্গে মর্ত্যে পাতালে এমন কোন শক্তি নাই যে, তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে। এইগুলি সম্বল থাকিলে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড বিপক্ষে দাঁড়াইলেও একলা এক ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারে।

সর্বোপরি সাবধান হইতে হইবে, অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সহিত আপস করিতে যাইও না। আমার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, নিজের ভাব সর্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে, দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মতগুলি অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না। তোমার আত্মাই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, তোমার আবার অন্য আশ্রয়ের প্রয়োজন কি? সহিষ্ণুতা, প্রীতি ও দৃঢ়তার সহিত অপেক্ষা কর; যদি এখন কোন সাহায্যকারী না পাও, সময়ে পাইবে। তাড়াতাড়ির আবশ্যকতা কি? সমস্ত মহৎ কার্যের আরম্ভের সময় উহার অস্তিত্বই যেন বুঝা যায় না, কিন্তু তখনই বাস্তবিক উহাতে যথার্থ কার্যশক্তি সঞ্চিত থাকে।

কে ভাবিয়াছিল যে, সুদূর বঙ্গীয় পল্লীগ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের জীবন ও উপদেশ এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন দূরদেশের লোকে জানিতে পারিবে, যাহাদের কথা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বপ্নেও কখন ভাবেন নাই? আমি ভগবান্ রামকৃষ্ণের কথা বলিতেছি। শুনিয়াছ কি, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার 'নাইনটীন্থ সেঞ্চুরী'-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং যদি উপযুক্ত উপাদান পান, তবে আনন্দের সহিত তাঁহার জীবনী ও উপদেশের আরও বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণ-সম্বলিত একখানি গ্রন্থ লিখিতে

প্রস্তুত আছেন? অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। আমি দিন-কয়েক পূর্বে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। প্রকৃতপক্ষে বলা উচিত, আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম। কারণ যে-কোন ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন—তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে-কোন সম্প্রদায়-মত-বা জাতিভুক্ত হউন না কেন—তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি। 'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ'—আমার ভক্তের যাহারা ভক্ত, তাহারা আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। ইহা কি সত্য নয়?

স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের জীবনে হঠাৎ গুরুতর পরিবর্তন কি শক্তিতে সাধিত হইল, অধ্যাপক প্রথমে তাহাই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হন; তারপর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপদেশের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং ঐগুলির চর্চা আরম্ভ করেন। আমি বলিলাম, 'অধ্যাপক মহাশয়, আজকাল সহস্র সহস্র লোকে রামকৃষ্ণের পূজা করিতেছে।' অধ্যাপক বলিলেন, 'এরূপ ব্যক্তিকে লোকে পূজা করিবে না তো কাহাকে পূজা করিবে?' অধ্যাপক যেন সহৃদয়তার মূর্তিবিশেষ। তিনি স্টার্ডি সাহেব ও আমাকে তাঁহার সহিত জলযোগের নিমন্ত্রণ করিলেন এবং আমাদিগকে অক্সফোর্ডের কতকগুলি কলেজ ও বোড্‌লিয়ান পুস্তকাগার (Bodleian Library) দেখাইলেন। রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত আমাদিগকে পৌছাইয়া দিতে আসিলেন, আর আমাদিগকে এত যত্ন কেন করিতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, 'রামকৃষ্ণ পরমহংসের একজন শিষ্যের সহিত তো আর প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয় না।' বাস্তবিক আমি নূতন কথা শুনিলাম। সুন্দর-উদ্যানসমন্বিত সেই মনোরম ক্ষুদ্র গৃহ, সপ্ততিবর্ষবয়ঃক্রম সত্ত্বেও তাঁহার স্থির প্রসন্ন আনন, বালসুলভ মসৃণ ললাট, রজতশুভ্র কেশ, ঋষি-হৃদয়ের কোন নিভৃত অন্তরালে গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির অস্তিত্বসূচক সেই মুখের প্রত্যেক রেখা, তাঁহার সমগ্র জীবনের (যে-জীবন প্রাচীন ভারতের ঋষিগণের চিন্তারাশির প্রতি সহানুভূতি-আকর্ষণ, উহার প্রতি লোকের বিরোধ-ও ঘৃণা-অপনয়ন এবং অবশেষে শ্রদ্ধা-উৎপাদনরূপ দীর্ঘ-কালব্যাপী কঠোর কার্যে ব্যাপৃত ছিল) সঙ্গিনী সেই উচ্চাশয়া সহধর্মিণী, তাঁহার সেই উদ্যানের তরুরাজি, পুষ্পনিচয়, তথাকার নিস্তব্ধ ভাব ও নির্মল আকাশ—এই সমুদয় মিলিয়া কল্পনায় আমাকে প্রাচীন ভারতের সেই গৌরবের

যুগে লইয়া গেল—যখন ভারতে ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণ, উচ্চাশয় বানপ্রস্থগণ, অরুন্ধতী ও বশিষ্ঠগণ বাস করিতেন।

আমি তাঁহাকে ভাষাতত্ত্ববিদ্ বা পণ্ডিতরূপে দেখি নাই, দেখিলাম যেন কোন আত্মা দিন দিন ব্রহ্মের সহিত নিজের একত্ব অনুভব করিতেছে, যেন কোন হৃদয় অনন্তের সহিত এক হইবার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে অপরে শুষ্ক অপ্রয়োজনীয় তত্ত্বসমূহের বিচাররূপ মরুতে দিশাহারা হইয়াছে, সেখানে তিনি এক অমৃত কূপ খনন করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ধ্বনি যেন উপনিষদের সেই স্বরে, সেই তালে ধ্বনিত হইতেছে, 'তমেবৈকং জানথ আত্মানম্ অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ'—সেই এক আত্মাকে জানো, অন্য কথা ত্যাগ কর।

যদিও তিনি একজন পৃথিবী-আলোড়নকারী পণ্ডিত ও দার্শনিক, তথাপি তাঁহার পাণ্ডিত্য ও দর্শন তাঁহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চে লইয়া গিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকারে সমর্থ করিয়াছে, তাঁহার অপরা বিদ্যা বাস্তবিকই তাঁহাকে পরা-বিদ্যালাভে সহায়তা করিয়াছে। ইহাই প্রকৃত বিদ্যা—বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্। জ্ঞান যদি আমাদিগকে সেই পরাৎপরের নিকট না লইয়া যায়, তবে জ্ঞানের আবশ্যকতা কি?

আর ভারতের উপর তাঁহার কি অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিন্তারাজ্যে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ-সকল তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে উহার রঙ ধরাইয়া দিয়াছে।

ম্যাক্সমূলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিক বেদান্তেরও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সুরের ভিতর উহার প্রকৃত তানকে ধরিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, বেদান্ত সেই একমাত্র আলোক, যাহা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায় ও মতকে আলোকিত করিতেছে, উহা সেই এক তত্ত্ব, সমুদয় ধর্মই যাহার কার্যে পরিণত রূপমাত্র। আর রামকৃষ্ণ পরমহংস কি ছিলেন? তিনি এই প্রাচীন তত্ত্বের প্রত্যক্ষ উদাহরণ, প্রাচীন ভারতের সাকার বিগ্রহ ও ভবিষ্যৎ ভারতের পূর্বাভাস—তাহার ভিতর দিয়াই সকল জাতি আধ্যাত্মিক আলোক লাভ

করিতেছে। চলিত কথায় আছে, জহুরীই জহর চেনে। তাই বলি, ইহা কি বিস্ময়ের বিষয় যে, ভারতীয় চিন্তাগগনে কোন নূতন নক্ষত্র উদিত হইলেই, ভারতবাসিগণ উহার মহত্ত্ব বুঝিবার পূর্বেই এই পাশ্চাত্য ঋষি উহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উহার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন!

আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনি কবে ভারতে আসিতেছেন? ভারতবাসীর পূর্বপুরুষগণের চিন্তারাশি আপনি যথার্থভাবে লোকের সমক্ষে প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং ভারতের সকলেই আপনার শুভাগমনে আনন্দিত হইবে।' বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে এক বিন্দু অশ্রু নির্গতপ্রায় হইল, মৃদুভাবে শির সঞ্চালিত হইল, ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি স্ফুরিত হইল, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে সেখানেই সমাহিত করিতে হইবে।' আর অধিক প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের পবিত্র রহস্যপূর্ণ রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের ন্যায় বোধ হইল। কে জানে, হয়তো কবি যাহা বলিয়াছিলেন, ইহা তাহাই—

'তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বম্।
ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি॥'

—তিনি নিশ্চয়ই অজ্ঞাতসারে হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ পূর্বজন্মের বন্ধুত্বের কথা ভাবিতেছেন।

তাঁহার জীবন জগতের পক্ষে পরম মঙ্গলস্বরূপ হইয়াছে। ঈশ্বর করুন, যেন বর্তমান শরীর ত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার জীবনে বহু বর্ষ কাটিয়া যায়।

ডক্টর পল ডয়সেন

১৮৯৬ খৃঃ 'ব্রহ্মবাদিন্'-সম্পাদককে লিখিত।

দশ বৎসরের অধিক অতীত হইল, কোন অসচ্ছল অবস্থার পাদরির আটটি সন্তানের অন্যতম, জনৈক অল্পবয়স্ক জার্মান ছাত্র একদিন অধ্যাপক ল্যাসেনকে একটি নূতন ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ে—ইওরোপীয় পণ্ডিতবর্গের পক্ষে তখনকার কালেও সম্পূর্ণ নূতন ভাষা ও সাহিত্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে শুনিল। এই বক্তৃতাগুলি শুনিতে অবশ্য পয়সা লাগিত না, কারণ এমনকি এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন ইওরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিখাইয়া অর্থোপার্জন করা অসম্ভব—অবশ্য যদি বিশ্ববিদ্যালয় তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা।

অধ্যাপক ল্যাসেন জার্মানির সংস্কৃতবিদ্যা-আলোচনাকারিগণের অগ্রণীদের —সেই বীরহৃদয় জার্মান পণ্ডিতদলের একরূপ শেষ প্রতিনিধি। এই পণ্ডিত-কুল বাস্তবিকই বীরপুরুষ ছিলেন, কারণ বিদ্যার প্রতি পবিত্র ও নিঃস্বার্থ প্রেম ব্যতীত তখন জার্মান মনীষিগণের ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণের অন্য কি কারণ বিদ্যমান ছিল? সেই বহুদর্শী অধ্যাপক 'শকুন্তলা'র একটি অধ্যায় ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। আর সেদিন আমাদের এই যুবক ছাত্রটি যেরূপ আগ্রহ ও মনোযোগের সহিত ল্যাসেনের ব্যাখ্যা শুনিতেছিল, এরূপ আগ্রহবান্ শ্রোতা আর কেহই সেখানে উপস্থিত ছিল না। ব্যাখ্যাত বিষয়টি অবশ্য অতিশয় হৃদয়গ্রাহী ও অদ্ভুত বোধ হইতেছিল, কিন্তু আরও অদ্ভুত ছিল সেই অপরিচিত ভাষা; উহার অপরিচিত শব্দগুলি—অনভ্যস্ত ইওরোপীয় মুখ হইতে উচ্চারিত হইলে উহার ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যেরূপ কিম্ভূতকিমাকার শোনায়, সেরূপভাবে উচ্চারিত হইলেও তাহাকে অদ্ভুতভাবে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল। সে নিজ বাসস্থানে ফিরিল, কিন্তু যাহা শুনিয়াছিল, রাত্রির নিদ্রায় তাহা ভুলিতে পারিল না। সে যেন এতদিনের অজ্ঞাত অচেনা দেশের চকিত দর্শন পাইয়াছে, এই দেশ যেন তাহার দৃষ্ট অন্য সকল দেশ অপেক্ষা বর্ণে অধিকতর সমুজ্জ্বল; উহার যেমন মোহিনীশক্তি, এই উদ্দাম যুবক-হৃদয় আর কখনও তেমন অনুভব করে নাই।

তাহার বন্ধুবর্গ স্বভাবতই সাগ্রহে আশা করিতেছিলেন যে, কবে এই যুবকের স্বাভাবিক প্রবল শক্তিগুলি পরিস্ফুট হইবে—তাঁহারা সাগ্রহে সেই দিনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, যে দিন সে কোন উচ্চ অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইবে, সর্বোপরি উচ্চ বেতন ও পদমর্যাদার ভাগী হইবে। কিন্তু কোথা হইতে এই সংস্কৃত আসিয়া জুটিল! অধিকাংশ ইওরোপীয় পণ্ডিত তখন ইহার নামও শুনেন নাই। আর উপার্জনের দিক দিয়া দেখিতে গেলে—পূর্বেই বলিয়াছি, সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইয়া অর্থোপার্জন করা পাশ্চাত্য দেশে এখনও অসম্ভব ব্যাপার। তথাপি যুবকটির সংস্কৃত শিখিবার আগ্রহ অতি প্রবল হইল।

দুঃখের বিষয়, আধুনিক ভারতীয় আমাদের পক্ষে বিদ্যার জন্য বিদ্যা-শিক্ষার আগ্রহটা কিরূপ ব্যাপার, তাহা বুঝাই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি আমরা এখনও নবদ্বীপ, বারাণসী ও ভারতের অন্যান্য কোন কোন স্থানে পণ্ডিতগণের ভিতর, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের ভিতর বয়স্ক ও যুবক উভয় শ্রেণীর লোকই দেখিতে পাই, যাহারা এইরূপ জ্ঞান-তৃষ্ণায় উন্মত্ত। আধুনিক ইওরোপীয়ভাবাপন্ন হিন্দুদের বিলাসোপকরণশূন্য, তাহাদের অপেক্ষা সহস্রগুণে অধ্যয়নের অল্পসুযোগবিশিষ্ট, রাত্রির পর রাত্রি তৈল-প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে হস্তলিখিত-পুঁথির প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি (যাহাতে অন্য যে-কোন জাতির ছাত্রের দৃষ্টিশক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইত), কোন দুর্লভ পুঁথি বা বিখ্যাত অধ্যাপকের অনুসন্ধানে শত শত ক্রোশ ভিক্ষা-মাত্রোপজীবী হইয়া পদব্রজে ভ্রমণকারী, বৎসরের পর বৎসর যতদিন না কেশ শুভ্র হইতেছে এবং বয়সের ভারে শরীর অক্ষম হইয়া পড়িতেছে, ততদিন নিজ পঠিতব্য বিষয়ে অদ্ভুতভাবে দেহ-মনের সমুদয় শক্তি-প্রয়োগে নিযুক্ত—এইরূপ ছাত্র ঈশ্বরকৃপায় আমাদের দেশ হইতে এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। এখন ভারত যাহাকে নিজ মূল্যবান্ সম্পত্তি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে, তাহা নিশ্চয়ই অতীত কালে তাহার উপযুক্ত সন্তানগণের এরূপ পরিশ্রমের ফল এবং ভারতের প্রাচীন যুগের পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যের গভীরতা ও সারবত্তা এবং স্বার্থগন্ধহীনতা ও উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতার সহিত আধুনিক ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষায় যে-ফল লাভ হইতেছে, তাহার তুলনা করিলেই আমার উপর্যুক্ত মন্তব্যের সত্যতা সুস্পষ্ট হইবে। যদি

ভারতবাসিগণ তাহাদের ঐতিহাসিক অতীতযুগের মতো অন্যান্য জাতির মধ্যে নিজ পদগৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া আবার উঠিতে চায়, তবে আমাদের দেশবাসিগণের জীবনে যথার্থ পাণ্ডিত্যের জন্য স্বার্থহীন অকপট উৎসাহ ও সাগ্রহ চিন্তা আবার প্রবলভাবে জাগরিত হওয়া আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান-স্পৃহাই জার্মানিকে তাহার বর্তমান পদবীতে—জগতের সমুদয় জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হউক, শ্রেষ্ঠগণের অন্যতম পদবীতে—উন্নীত করিয়াছে।

এই জার্মান ছাত্রের হৃদয়ে সংস্কৃতশিক্ষার বাসনা প্রবল হইয়াছিল। অবশ্য এই সংস্কৃত শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যবসায়ের সহিত পর্বতারোহণের মতো কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আর এই পাশ্চাত্য বিদ্যার্থীর জীবনও অন্যান্য সফলকাম বিদ্যার্থিগণের চিরপরিচিত কাহিনীর মতো; তাহাদের ন্যায় এই যুবকও কঠোর পরিশ্রমে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়া, অদম্য উৎসাহের সহিত নিজব্রতে দৃঢ়ভাবে লাগিয়া থাকিয়া পরিণামে বাস্তবিকই যথার্থ বীরজনোচিত সাফল্যের গৌরবমুকুটে ভূষিত হইল। আর এখন শুধু ইওরোপ নয়, সমগ্র ভারতই এই কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পল ডয়সেনকে জানে। আমি আমেরিকা ও ইওরোপে অনেক সংস্কৃতশাস্ত্রের অধ্যাপক দেখিয়াছি, তাঁহাদের অনেকেই বৈদান্তিক ভাবের প্রতি অতিশয় সহানুভূতিসম্পন্ন। আমি তাঁহাদের মনীষা ও নিঃস্বার্থ কার্যে উৎসর্গীকৃত জীবন দেখিয়া মুগ্ধ। কিন্তু পল ডয়সেন (অথবা ইনি নিজে যেমন সংস্কৃতে 'দেবসেনা' বলিয়া অভিহিত হইতে পছন্দ করেন) এবং বৃদ্ধ ম্যাক্সমূলারকে আমার ভারতের ও ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীর সর্বাপেক্ষা অকৃত্রিম বন্ধু বলিয়া ধারণা হইয়াছে। কিয়েল নগরে এই উৎসাহী বৈদান্তিকের নিকট আমার প্রথম গমন, তাঁহার ভারতভ্রমণের সঙ্গিনী মধুরপ্রকৃতি সহধর্মিণী ও তাঁহার প্রাণপুত্তলী বালিকা কন্যা, জার্মানি ও হল্যাণ্ডের মধ্য দিয়া আমাদের একসঙ্গে লণ্ডনযাত্রা এবং লণ্ডনে ও উহার আশেপাশে আমাদের আনন্দপূর্ণ দেখা সাক্ষাৎ—আমার জীবনের অন্যান্য মধুর স্মৃতিগুলির অন্যতম বলিয়া চিরকাল হৃদয়ে গ্রথিত থাকিবে।

ইওরোপের প্রথম যুগের সংস্কৃতজ্ঞপণ্ডিতগণ সমালোচনাশক্তি অপেক্ষা অধিক কল্পনাশক্তি লইয়া সংস্কৃত-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা জানিতেন অল্প, সেই অল্প জ্ঞান হইতে আশা করিতেন অনেক, আর অনেক সময় তাঁহারা

অল্পস্বল্প যাহা জানিতেন, তাহা লইয়াই বাড়াবাড়ি করিবার চেষ্টা করিতেন। আবার সেই কালেও 'শকুন্তলা'কে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে করার পাগলামিও একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। ইহাদের পরে স্বভাবতই একদল প্রতিক্রিয়াশীল স্থূলদর্শী সমালোচকের অভ্যুদয় হইল, যাঁহাদিগকে প্রকৃত পণ্ডিতপদবাচ্যই বলা যাইতে পারে না। ইঁহারা সংস্কৃতের কিছু জানিতেন না বলিয়াই হয়তো সংস্কৃত-চর্চা হইতে কোন ফললাভের আশা করিতেন না, বরং প্রাচ্যদেশীয় যাহা কিছু তাহাই উপহাস করিতেন। প্রথমোক্ত দলের —যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যে কল্পনার চক্ষে কেবল নন্দনকাননই দর্শন করিতেন, তাঁহাদের বৃথা কল্পনাপ্রিয়তার ইঁহারা কঠোর সমালোচনা করিলেন বটে, কিন্তু নিজেরা আবার এমন সব সিদ্ধান্ত করিতে লাগিলেন যে, বেশী কিছু না বলিলেও ঐগুলিকে প্রথমোক্ত দলের সিদ্ধান্তের মতোই বিশেষ অসমীচীন ও অতিশয় দুঃসাহসিক বলা যাইতে পারে। আর এই বিষয়ে তাঁহাদের সাহস স্বভাবতই বাড়িয়া যাইবার কারণ—ভারতীয় ভাবের প্রতি সহানুভূতিশূন্য এবং চিন্তা না করিয়া অতি ক্ষিপ্র সিদ্ধান্তকারী এই-সকল পণ্ডিত ও সমালোচক এমন শ্রোতৃবর্গের নিকট তাঁহাদের বক্তব্য বিষয়গুলি বলিতেছিলেন, যাঁহাদের ঐ বিষয়ে কোন মতামত দিবার একমাত্র অধিকার ছিল—তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। এইরূপ সমালোচক পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক হইতে নানারূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রসূত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের কি আছে! হঠাৎ বেচারা হিন্দুরা একদিন প্রাতঃকালে জাগিয়া দেখিল, তাহাদের নিজস্ব বলিয়া যাহা ছিল, তাহার কিছুই নাই—এক অপরিচিত জাতি তাহাদের নিকট হইতে শিল্প কাড়িয়া লইয়াছে, আর একজাতি তাহাদের স্থাপত্য কাড়িয়া লইয়াছে, আর এক তৃতীয় জাতি তাহাদের প্রাচীন বিজ্ঞান সমুদয় কাড়িয়া লইয়াছে, এমন কি ধর্মও তাহাদের নিজস্ব নয়! হাঁ—ধর্মও পহ্লবজাতীয় প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে ভারতে আসিয়াছে! এইরূপ মৌলিকগবেষণা-পরম্পরারূপ উত্তেজনাপূর্ণ যুগের পর এখন অপেক্ষাকৃত ভাল সময় আসিয়াছে। এখন লোকে বুঝিয়াছে, বাস্তবিক কিছু সংস্কৃতগ্রন্থের সহিত কতকটা সাক্ষাৎ পরিচয় ও আলোচনা-জনিত গভীর জ্ঞানের মূলধন না লইয়া কেবল হঠকারিতাবশতঃ কতকগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত করিয়া বসা, প্রাচ্যতত্ত্বগবেষণা-ব্যাপারেও হাস্যোদ্দীপক অসাফল্যই প্রসব করে এবং ভারতে যে-সকল কিংবদন্তী বহুকাল হইতে

প্রচলিত আছে, সেগুলিও সদম্ভ অবজ্ঞাসহকারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। কারণ ঐগুলির মধ্যে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা লোকে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না।

সুখের বিষয়, ইওরোপে আজকাল একদল নূতন ধরনের সংস্কৃত পণ্ডিতের অভ্যুদয় হইতেছে, যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্, সহানুভূতিসম্পন্ন ও যথার্থ পণ্ডিত। ইঁহারা শ্রদ্ধাবান্—কারণ অপেক্ষাকৃত উচ্চদরের, এবং সহানুভূতিসম্পন্ন—কারণ বিদ্বান্। আর আমাদের ম্যাক্সমূলারই প্রাচীনদলরূপ শৃঙ্খলের সহিত নূতন দলের সংযোগগ্রন্থি। আমরা হিন্দুগণ পাশ্চাত্য অন্যান্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের অপেক্ষা ইঁহারই নিকট অধিক ঋণী। তিনি যৌবনে যুবকোচিত উৎসাহের সহিত যে সুবৃহৎ কার্য আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় সাফল্যে পরিণত করিয়াছিলেন, সেই কথা ভাবিতে গেলে আমার বিস্ময়ের অবধি থাকে না। ইঁহার সম্বন্ধে একবার ভাবিয়া দেখ—হিন্দুদের চক্ষেও অস্পষ্ট লেখা প্রাচীন হস্তলিখিত-পুঁথি লইয়া দিনরাত ঘাঁটিতেছেন—উহা আবার এমন ভাষায় রচিত, যাহা ভারতবাসীর পক্ষেও আয়ত্ত করিতে সারাজীবন লাগিয়া যায়; এমন কোন অভাবগ্রস্ত পণ্ডিতের সাহায্যও পান নাই, যাঁহাকে মাসে মাসে কিছু দিলে তাঁহার মস্তিষ্ক কিনিয়া লইতে পারা যায়—আর 'অতি নূতন গবেষণাপূর্ণ' কোন পুস্তকের ভূমিকায় তাঁহার নামটির উল্লেখ মাত্র করিলে ইহার কদর বাড়িয়া যায়। এই ব্যক্তির কথা ভাবিয়া দেখ—সময়ে সময়ে সায়ণ-ভাষ্যের অন্তর্গত কোন শব্দ বা বাক্যের যথার্থ পাঠোদ্ধারে ও অর্থ-আবিষ্কারে দিনের পর দিন এবং কখন কখন মাসের পর মাস কাটাইয়া দিতেছেন (তিনি আমাকে স্বয়ং এই কথা বলিয়াছেন), এবং এই দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যবসায়ের ফলে পরিশেষে বৈদিক সাহিত্যরূপ অরণ্যের মধ্য দিয়া অপরের পক্ষে চলিবার সহজ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিতে কৃতকার্য হইয়াছেন; এই ব্যক্তি ও তাঁহার কার্য সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, তারপর বলো—তিনি আমাদের জন্য বাস্তবিক কি করিয়াছেন! অবশ্য তিনি তাঁহার বহু রচনার মধ্যে যাহা কিছু বলিয়াছেন, সেইসবের সহিত আমরা সকলে একমত না হইতে পারি; এরূপ সম্পূর্ণ একমত হওয়া অবশ্যই অসম্ভব। কিন্তু ঐকমত্য হউক বা নাই হউক, এই সত্যটির কখনও অপলাপ করা যাইতে পারে না যে, আমাদের পূর্বপুরুষগণের সাহিত্য রক্ষা ও বিস্তার করিবার জন্য এবং উহার প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্য আমাদের মধ্যে

যে-কেহ যতদূর সম্ভব আশা করিতে পারি, এই এক ব্যক্তি তাহার সহস্রগুণ অধিক করিয়াছেন, আর তিনি এই কার্য অতি শ্রদ্ধা- ও প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে করিয়াছেন।

যদি ম্যাক্সমূলারকে এই নূতন আন্দোলনের প্রাচীন অগ্রদূত বলা যায়, তবে ডয়সেন নিশ্চয়ই উহার একজন নবীন অগ্রগামী রক্ষিপদবাচ্য, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রখনিতে যে-সকল ভাব ও আধ্যাত্মিকতার অমূল্য রত্নসমূহ নিহিত আছে, ভাষাতত্ত্বের আলোচনার আগ্রহ অনেক দিন ধরিয়া সেগুলিকে আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়াছিল। ম্যাক্সমূলার সেগুলির কয়েকটি সম্মুখে আনিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর করিলেন এবং শ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ববিৎ বলিয়া তাঁহার কথার প্রামাণ্য, তাহারই বলে তিনি ঐ বিষয়ে সাধারণের মনোযোগ বলপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। ডয়সেনের ভাষাতত্ত্ব-আলোচনার দিকে সেরূপ কোন ঝোঁক ছিল না। বরং তিনি দার্শনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ছিলেন—তাঁহার প্রাচীন গ্রীস ও বর্তমান জার্মান তত্ত্বালোচনাপ্রণালী ও সিদ্ধান্তসমূহ বিশেষ জানা ছিল—তিনি ম্যাক্সমূলারের পথ অনুসরণ করেন এবং অতি সাহসের সহিত উপনিষদের গভীর দার্শনিক তত্ত্বসাগরে ডুব দিলেন; তিনি দেখিলেন, ঐগুলি সম্পূর্ণ নিরাপদ এবং বুদ্ধিবৃত্তি তৃপ্ত করে—তখন তিনি পূর্ববৎ সাহসের সহিত ঐ তথ্য সমগ্র জগতের সমক্ষে ঘোষণা করিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের মধ্যে একমাত্র ডয়সেনই বেদান্তসম্বন্ধে তাঁহার মত খুব স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিকাংশ পণ্ডিত—যেমন অপরে কি বলিবে, এই ভয়ে জড়সড়, ডয়সেন কখনও সেরূপ মনে করেন নাই। বাস্তবিক এই জগতে এমন সাহসী লোকের আবশ্যক হইয়াছে, যাঁহারা সাহসের সহিত প্রকৃত সত্য-সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে পারেন! ইওরোপ সম্বন্ধে এ-কথা আবার বিশেষভাবে সত্য—সে দেশের পণ্ডিতবর্গ সমাজের ভয়ে বা অনুরূপ কারণে এমন সব বিভিন্ন ধর্মমত ও আচার-ব্যবহার দুর্বলভাবে সমর্থন করেন এবং সেগুলির দোষ চাপা দিবার চেষ্টা করেন, যেগুলিতে সম্ভবতঃ তাঁহাদের অনেকে যথার্থভাবে বিশ্বাসী নন। সুতরাং ম্যাক্সমূলার ও ডয়সেনের এইরূপ সাহসের সহিত খোলাখুলিভাবে সত্যের সমর্থনের জন্য বাস্তবিক তাঁহারা বিশেষ প্রশংসার ভাগী। তাঁহারা আমাদের শাস্ত্রসমূহের গুণ-ভাগ-প্রদর্শনে

যেরূপ সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ সাহসের সহিত উহার দোষভাগ—পরবর্তী কালে ভারতীয় চিন্তাপ্রণালীতে যে-সকল গলদ প্রবেশ করিয়াছে, বিশেষতঃ আমাদের সামাজিক প্রয়োজনে উহাদের প্রয়োগ-সম্বন্ধে যে-সকল ত্রুটি হইয়াছে—তাহাও যেন সাহসের সহিত প্রদর্শন করেন। বর্তমান কালে আমাদের এইরূপ খাঁটি বন্ধুর সাহায্য বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে,—যাঁহারা ভারতে যে রোগ দিন দিন বিশেষ প্রবল হইয়া উঠিতেছে অর্থাৎ একদিকে দাসবৎ প্রাচীন প্রথার অতি-চাটুকার দল—যাহারা প্রত্যেক গ্রাম্য কুসংস্কারকে আমাদের শাস্ত্রের সার সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, আবার অপরদিকে পৈশাচিক নিন্দাকারিগণ—যাহারা আমাদের মধ্যে ও আমাদের ইতিহাসের মধ্যে ভাল কিছুই দেখিতে পায় না এবং পারে তো এই ধর্ম ও দর্শনের লীলাভূমি আমাদের প্রাচীন জন্মভূমির সমুদয় আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখনই ভাঙিয়া চুরিয়া ধূলিসাৎ করিতে চায়; সেই বন্ধুগণই এই উভয় দলের চূড়ান্ত একদেশী ভাবের গতিরোধ করিতে পারেন।

অধিকারিবাদের দোষ

বেলুড় মঠে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যদের নিকট কথিত।

প্রাচীন ঋষিগণের উপর আমি অসীম শ্রদ্ধাভক্তি-সম্পন্ন, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁহাদের দোহাই দিয়া যেভাবে জনসমাজে লোকশিক্ষা প্রবর্তিত হইয়াছে, সেই শিক্ষাপ্রণালী আমি বিশেষ আপত্তিকর মনে করি। ঐ সময় হইতে স্মৃতিকারেরা. সর্বদাই 'ইহা কর, উহা করিও না' ইত্যাদি-রূপে লোককে বিধি-নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু 'কেন এই কাজ করিতে হইবে? কেন ইহা করিব না?'—বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য বা যুক্তি তাঁহারা কখনই দেন নাই। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী আগাগোড়া বড়ই অনিষ্টকর—ইহাতে যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইয়া লোকের ঘাড়ে কতকগুলি অনর্থের বোঝা চাপানো হয় মাত্র। এই বিধিনিষেধগুলির উদ্দেশ্য সাধারণ লোকের নিকট গোপন করিয়া রাখিবার এই কারণ প্রদর্শিত হইয়া থাকে যে, তাহারা ঐ উদ্দেশ্য বুঝিবার যথার্থ অধিকারী নয়—সেই জন্য তাহাদের নিকট বলিলেও তাহারা উহা বুঝিবে না। এই অধিকারিবাদের অনেকটা খাঁটি স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহারা ভাবিতেন, তাঁহারা যে-বিষয়ে বিশেষ চর্চা করিয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, লোককে যদি তাহা জানাইয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা আর তাঁহাদিগকে আচার্যের উচ্চ আসনে বসাইবে না। এই কারণেই তাঁহারা অধিকারিবাদের মতটা বিশেষভাবে সমর্থন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। সামর্থ্যরহিত বলিয়া যদি কোন লোককে তোমরা উচ্চ বিষয় জানিবার অনধিকারী বা অনুপযুক্ত মনে কর, তবে তো তোমাদের তাহাকে অধিক পরিমাণে শিক্ষা দিয়া যাহাতে সে ঐ তত্ত্বসকল বুঝিবার শক্তি-লাভ করিয়া উপযুক্ত হয়, সেজন্য চেষ্টা করা উচিত; তাহার বুদ্ধি যাহাতে মার্জিত ও সবল হয়, সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ সে যাহাতে ধারণা করিতে পারে, সেজন্য তাহাকে অল্প শিক্ষা না দিয়া বরং বেশী শিক্ষা দেওয়াই তো উচিত। এই অধিকারিবাদ-মতাবলম্বিগণ—মানবাত্মার মধ্যে যে গূঢ়ভাবে সমুদয় শক্তি রহিয়াছে—এ কথাটা যেন একেবারে ভুলিয়া যান কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ব্যক্তিই জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে, যদি

তাহাকে তাহার ভাষায়, তাহার উপযোগিভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়। যে আচার্য অপরকে জ্ঞানদানে অসমর্থ, তিনি তাঁহার শিষ্যগণের নিন্দা না করিয়া এবং উচ্চতর জ্ঞান তাহাদের জন্য নয়, এই বৃথা হেতুবাদে তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য অজ্ঞান ও কুসংস্কারে ফেলিয়া না রাখিয়া তিনি যে তাহাদিগকে তাহাদের ভাষায়, তাহাদের উপযোগিভাবে শিক্ষা দিয়া তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ করিয়া দিতে পারিতেছেন না, সেজন্য তাঁহার নিজেরই বিরলে অশ্রুবিসর্জন করা কর্তব্য। সত্য যাহা, তাহা নির্ভয়ে সকলের সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে প্রকাশ করিয়া বলো—দুর্বল অধিকারিগণের ইহাতে বুদ্ধিভেদ হইবে, এ আশঙ্কা করিও না, মানুষ নিজে ঘোর স্বার্থপর, তাই সে চায় না যে, সে যতদূর জ্ঞানলাভ করিয়াছে, অপরেও তাহা লাভ করুক —তাহার আশঙ্কা হয়, তাহা হইলে লোকে তাহাকে মানিবে না, সে অপরের নিকট হইতে যে-সকল সুযোগ-সুবিধা পাইতেছে, অন্যের নিকট হইতে যে বিশেষ সম্মান পাইতেছে, তাহা আর পাইবে না। সেইজন্যই সে তর্ক করিয়া থাকে যে, দুর্বলচিত্ত লোকের নিকট উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলিলে তাহাদের বুদ্ধি গুলাইয়া যাইবে। কর্মাসক্ত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে জ্ঞানের উপদেশ দিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না। কিন্তু জ্ঞানী যুক্তভাবে কর্মসমুদয় স্বয়ং আচরণ করিয়া তাহাদিগকে কর্মে নিযুক্ত রাখিবেন।

আলোকের দ্বারা অন্ধকার দূর না হইয়া পূর্বাপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারের সৃষ্টি হইয়া থাকে—এই স্ববিরোধী বাক্যে আমার বিশ্বাস হয় না। অমৃতস্বরূপ সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিলে মানুষ মরে—এ কথা যেমন, পূর্বোক্ত কথাটিও তদ্রূপ। কি অসম্ভব কথা! জ্ঞানের অর্থ—অজ্ঞানজ ভ্রমসমূহ হইতে মুক্ত হওয়া। সেই জ্ঞানের দ্বারা ভ্রম আসিবে—জ্ঞানালোক আসিলে মাথা গুলাইয়া যাইবে!! ইহা কি কখন সম্ভব! এইরূপ মতবাদের উৎপত্তির প্রকৃত কারণ এই যে, মানুষ সাধারণ লোকের নিকট হইতে সম্মান হারাইবার ভয়ে খাঁটি সত্য যাহা, তাহা প্রচার করিতে সাহসী হয় না। তাহারা সনাতন সত্যের সহিত ভ্রমপূর্ণ কুসংস্কারগুলির একটা আপস করিতে চেষ্টা করে এবং সেইজন্য এই মতবাদের পোষকতা করে যে, লোকাচার ও দেশাচার মানিতেই হইবে। সাবধান, তোমরা কখনও এইরূপ আপস

করিতে যাইও না; সাবধান, এইরূপে পুরাতন ভাঙাঘরের উপর এক পোঁচ চুণকাম করিয়া উহাকে নূতন করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিও না। মড়াটার উপর কতকগুলো ফুলচাপা দিয়া উহার বীভৎস দৃশ্য ঢাকিতে যাইও না। 'তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ'—তথাপি মনে মনেও লোকাচার লঙ্ঘন করিবে না—এইসব বাক্য গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দাও। এইরূপ আপস করিতে গেলে ফল এই হয় যে, মহান্ সত্যগুলি অতি শীঘ্রই নানা কুসংস্কাররূপ আবর্জনাস্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া যায়, আর মানুষ ঐগুলিকে পরম আগ্রহে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

এই আপসের চেষ্টা আসে ঘোর কাপুরুষতা হইতে, লোকভয় হইতে। তোমরা নির্ভীক হও। আমার শিষ্যগণের সর্বোপরি খুব নির্ভীক হওয়া চাই। কোন কারণে কাহারও সহিত কোনরূপ আপস করা চলিবে না। উচ্চতম সত্যসমূহ অধিকারিনির্বিশেষে প্রচার করিতে থাকো। লোকে তোমাকে মানিবে না অথবা লোকের সঙ্গে অনর্থক বিবাদ বাধিবে—এ ভয় করিও না। এইটি নিশ্চয় জানিও যে, সত্যকে পরিত্যাগ করিবার শত শত প্রলোভন সত্ত্বেও যদি তোমরা সত্যকে ধরিয়া থাকিতে পারো, তোমাদের ভিতর এমন এক দৈব বল আসিবে, যাহার সম্মুখে মানুষ—তোমরা যাহা বিশ্বাস কর না, তাহা বলিতে সাহসী হইবে না। যদি তোমরা চতুর্দশ বৎসর ধরিয়া সত্য পথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ক্রমাগত সত্যের যথার্থ সেবা করিতে পারো, তবে তোমরা লোককে যাহা বলিবে, তাহাকে তাহার সত্যতা বুঝিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপে তোমরা সর্বসাধারণের মহা কল্যাণ করিতে পারিবে, তোমাদের দ্বারা লোকের বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে, তোমরা সমুদয় জাতিকে উন্নত করিতে পারিবে।

সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ

বেলুড় মঠে স্বামীজী তদীয় সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী শিষ্যগণের নিকট কথাপ্রসঙ্গে বলেন :

সন্ন্যাসীদের কার্যে—যথা মঠ ও মণ্ডলী পরিচালনা, জনসমাজে ধর্মপ্রচার ও অনুষ্ঠানপ্রণালীর প্রবর্তন, ত্যাগ ও ধর্মমতামত-সম্বন্ধীয় স্বাধীন চিন্তার সীমানিরূপণ ইত্যাদিতে সংসারী বা কামকাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মতামত দেবার কিছুমাত্র অবসর থাকা উচিত নয়। সন্ন্যাসী ধনী লোকের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখবে না—তার কাজ গরিবকে নিয়ে। সন্ন্যাসীর কর্তব্য খুব যত্নের সঙ্গে প্রাণপণে গরিবদের সেবা করা এবং এরূপ সেবা করতে পারলে পরমানন্দ অনুভব করা। আমাদের দেশের সকল সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ভিতর ধনী লোকের তোষামোদ করা এবং তাদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করার ভাব প্রবেশ করাতে সেগুলি উৎসন্ন যেতে বসেছে। যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি, তাঁর কায়মনোবাক্যে এটা ত্যাগ করা উচিত। এভাবে ধনী লোকের পেছনে ঘোরা বেশ্যারই উপযুক্ত, সংসারত্যাগীর পক্ষে নয়। কামকাঞ্চনত্যাগই ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূলমন্ত্র, সুতরাং ঘোর কামকাঞ্চনে মগ্ন ব্যক্তি কি ক'রে তাঁর শিষ্য বা ভক্তরূপে পরিগণিত হ'তে পারে? তিনি ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করতেন, 'মা, কথা কইবার জন্যে আমার কাছে এমন একজন লোক এনে দে, যার ভেতর কামকাঞ্চনের লেশমাত্র নেই, সংসারী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ জ্বলে গেল।' তিনি আরও বলতেন, 'সংসারী এবং অপবিত্র লোকের স্পর্শ আমি সহ্য করতে পারি না।' তিনি 'ত্যাগীর বাদশা' ছিলেন—সংসারী লোক কখনও তাঁকে প্রচার করতে পারে না। সংসারী গৃহস্থ লোক কখনও সম্পূর্ণ অকপট হ'তে পারে না, কারণ তার কিছু না কিছু স্বার্থপর উদ্দেশ্য থাকবেই। ভগবান্ স্বয়ং যদি গৃহস্থরূপে অবতীর্ণ হন, আমি তাঁকে কখনও অকপট ব'লে বিশ্বাস করতে পারি না। গৃহস্থলোক যদি কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের নেতা হয়, তবে সে ধর্মের নামে নিজেরই স্বার্থসিদ্ধি করতে থাকে, আর তার ফল এই হয় যে, সম্প্রদায়টি একেবারে আগাগোড়া গলদে পূর্ণ হয়ে যায়। গৃহস্থগণ যে-সকল ধর্মান্দোলনের নেতা হয়েছেন, সব গুলিরই ঐ এক দশা হয়েছে। ত্যাগ ব্যতীত ধর্ম দাঁড়াতে পারে না।

একজন সন্ন্যাসী-শিষ্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্বামীজী, কাঞ্চনত্যাগ কাকে বলা যায়?' স্বামীজী হেসে বললেন: হাঁ, তোর প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝেছি। সংসার ত্যাগ ক'রে এসেই আমার এবং মঠের টাকাকড়ি রাখবার ভার তোর ওপর পড়েছে কিনা, তাই তোর মনে এই সন্দেহ হয়েছে। এখন এর মধ্যে বুঝতে হবে এইটুকু যে, উপায় আর উদ্দেশ্য। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্যে বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায়, উদ্দেশ্য একই, কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন দেশকালপাত্রে বিভিন্ন উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য—নিজের মুক্তি সাধন এবং জগতের হিত করা— 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। আর ঐ উদ্দেশ্য-সাধনের প্রধান উপায়— কামকাঞ্চনত্যাগ। কিন্তু এটি বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, 'ত্যাগ' অর্থে মনের আসক্তি-ত্যাগ—সর্বপ্রকার স্বার্থের ভাব ত্যাগ। তা না হ'লে আমি অপরের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখলাম—হাতে টাকা ছুঁলাম না, কিন্তু টাকা দ্বারা যে-সব স্থবিধে হয়, সব ভোগ করতে লাগলাম—তাকে কি আর ত্যাগ বলা যায়? যে সময়ে গৃহস্থেরা মনু ও অন্যান্য স্মৃতিকারগণের উপদেশ মেনে সন্ন্যাসী অতিথিদের জন্য তাদের খাদ্যের কিয়দংশ পৃথক্ ক'রে রেখে দিত, সে সময় সন্ন্যাসীর পক্ষে কাছে পয়সা-কড়ি কিছু না রেখে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করলে কাঞ্চনত্যাগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'ত। এখন কিন্তু কাল-ধর্মে গৃহস্থের সে ভাব বড়ই কম—বিশেষতঃ বাঙলাদেশে তো মাধুকরী ভিক্ষের প্রথাই নেই। এখন মাধুকরী ভিক্ষের ওপর নির্ভর ক'রে থাকবার চেষ্টা করলে অনর্থক শক্তিক্ষয়ই হবে,[১] কিছু লাভ হবে না। ভিক্ষের বিধান কেবল সন্ন্যাসীর পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যদ্বয়ের সিদ্ধির জন্যে, কিন্তু ঐ উপায়ে এখন আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। স্থতরাং এ অবস্থায় যদি কোন সন্ন্যাসী নিজের জীবনযাত্রার উপযোগী মাত্র অর্থ সংগ্রহ ক'রে যে উদ্দেশ্যে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, তার সিদ্ধির জন্যে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করেন, তা হ'লে তাতে সন্ন্যাসধর্মের মূল উদ্দেশ্যের বিপরীতাচরণ হয় না। অনেক সময় লোকে অজ্ঞতাবশতঃ উপায়কেই উদ্দেশ্য ক'রে তোলে। দু-একটা দৃষ্টান্ত ভেবে

[১] অবশ্য ইহাতে এইরূপ বুঝায় না যে, স্বামীজী মাধুকরী ভিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি অনেক সন্ন্যাসী শিষ্যকে মাধুকরী ভিক্ষা করাইয়াছেন।

দেখ। অনেক লোকের জীবনের উদ্দেশ্য—ইন্দ্রিয়সুখভোগ। তার উপায়রূপে সে টাকা রোজগার করতে আরম্ভ করে। কিন্তু এখানেও উদ্দেশ্য ভুলে উপায়ের প্রতি এতদূর আসক্ত হয় যে, টাকা-সঞ্চয়ই করতে থাকে, তা ব্যয় ক'রে যে ভোগ করবে, তার ক্ষমতা পর্যন্ত তার থাকে না। আরও দেখ, কাপড়-চোপড় কাচবার উদ্দেশ্য—শুচি ও শুদ্ধ হওয়া। কিন্তু আমরা অনেক সময়ে কাপড়-চোপড় শুধু একবার জলে ফেলে নিংড়িয়ে নিলেই শুচি হলাম মনে করি। এই-সব জায়গায় আমরা উপায়কে উদ্দেশ্যের আসনে বসিয়ে গোলমাল ক'রে ফেলি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কখনই ভুল করা উচিত নয়।

মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা

ধর্মালোচনা-প্রসঙ্গে কথিত

দক্ষিণ ভারতে অত্যন্ত প্রতাপশালী এক রাজবংশ ছিল। বিভিন্ন কালের প্রধান ব্যক্তিদের জন্ম হইতে গণনা করিয়া কোষ্ঠী রাখার পদ্ধতি তাঁহারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঐ-সব কোষ্ঠীতে ভবিষ্যদ্বাণীর প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং পরে সংঘটিত ঘটনার সঙ্গে তুলনা করিতেন। প্রায় সহস্র বৎসর এইরূপ করার ফলে তাঁহারা কতকগুলি ঐক্য খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। সেইগুলি হইতে সাধারণ সূত্র নির্ণয় করিয়া এক বিরাট গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করা হইল। কালক্রমে সেই রাজবংশ লুপ্ত হইল, কিন্তু জ্যোতিষীদের বংশ বাঁচিয়া রহিল এবং সেই গ্রন্থটি তাহাদের অধিকারে আসিল। সম্ভবতঃ এইভাবেই ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল। যে-সকল কুসংস্কার হিন্দুদের প্রভূত অনিষ্ট-সাধন করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি হইল এই জ্যোতিষের খুঁটিনাটির প্রতি অত্যধিক মনোযোগ।

আমার ধারণা ভারতে ফলিত জ্যোতিষ-বিদ্যা গ্রীকগণই প্রথম প্রবর্তন করে এবং তাহারা হিন্দুগণের নিকট হইতে জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রহণ করিয়া ইওরোপে লইয়া যায়। ভারতে বিশেষ জ্যামিতিক পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুত অনেক পুরাতন বেদী দেখিতে পাওয়া যায় এবং নক্ষত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থান কালে কতকগুলি ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠিত হইত, সেজন্য আমার মনে হয়, গ্রীকগণ হিন্দুদের ফলিত জ্যোতিষ বিদ্যা দিয়াছে এবং হিন্দুরা তাহাদের দিয়াছে জ্যোতির্বিজ্ঞান।

কয়েকজন জ্যোতিষীকে আমি অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহারা যে কেবল নক্ষত্র বা সেই জাতীয় কোন ব্যাপার হইতে ঐ-সব উক্তি করিতেন, এইরূপ বিশ্বাসের কারণ আমি পাই নাই। অনেক ক্ষেত্রে তাহা নিছক অপরের মনকে বুঝিবার ক্ষমতা। কখন কখন অপূর্ব ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে-সব সম্পূর্ণ বাজে কথা।

লণ্ডনে আমার কাছে এক যুবক প্রায়ই আসিত এবং জিজ্ঞাসা করিত, 'আগামী বছর আমার অদৃষ্টে কী আছে?' আমি তাহার ঐরূপ প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। সে বলে, 'আমার সব টাকাপয়সা নষ্ট হয়ে গেছে,

আমি এখন খুবই গরিব।' অনেকের কাছে টাকাই একমাত্র ভগবান্। দুর্বল লোকগুলি যখন সব কিছু খোয়াইয়া আরও দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা যত অপ্রাকৃত উপায়ে টাকা রোজগার করিবার ধান্ধায় থাকে এবং ফলিত জ্যোতিষ বা ঐ ধরনের জিনিসের আশ্রয় নেয়। 'কাপুরুষ ও মূর্খরাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়—সংস্কৃত প্রবচনে এইরূপ আছে।' কিন্তু বীর পুরুষরাই মাথা উঁচু করিয়া বলে, 'আমিই আমার অদৃষ্ট গড়িব।' যাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহারাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়। যুবকেরা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে ঘেঁষে না। গ্রহবৈগুণ্যের প্রভাবে আমরা হয়তো আছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের বেশি কিছু আসে যায় না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহারা নক্ষত্র গণনা, এরূপ অন্য বিদ্যা বা মিথ্যা চালাকি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের সর্বদা বর্জন করিবে।' তিনি ইহা জানিতেন, তাঁহার মতো শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ পর্যন্ত কেহ জন্মান নাই। নক্ষত্রগুলি আসুক, তাহাতে ক্ষতি কি? একটি নক্ষত্র যদিই বা আমার জীবনে বিঘ্ন ঘটায়, তাহার মূল্য এক কানাকড়িও নয়। জ্যোতিষ বিদ্যায় বা ঐ ধরনের রহস্যপূর্ণ ব্যাপারে বিশ্বাস সাধারণতঃ দুর্বল চিত্তের লক্ষণ; অতএব যখনই আমাদের মনে সে-সব জিনিস প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে, তখনই আমাদের উচিত চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া, উত্তম খাদ্য খাওয়া ও উপযুক্ত বিশ্রাম গ্রহণ করা।

কোন ঘটনার ব্যাখ্যা যদি তাহার অন্তঃপ্রকৃতির মধ্য হইতে খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে বাহিরে তাহার কারণ সন্ধানের মতো আহাম্মকি আর কিছু নাই। জগৎটা যদি নিজেই নিজেকে ব্যাখ্যা করে, তাহা হইলে বাহিরে ব্যাখ্যা খুঁজিতে যাওয়া নির্বোধের কাজ। মানুষের জীবনে এমন কিছু কি তোমরা কখনও দেখিয়াছ, যাহা তাহার নিজের শক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না? সুতরাং নক্ষত্র বা জগতের অন্য কিছুর নিকট যাইবার কি প্রয়োজন? আমার নিজের কর্মই আমার বর্তমান অবস্থার যথোচিত ব্যাখ্যা। স্বয়ং যীশুর বেলায়ও এই একই কথা। আমরা জানি, তাঁহার পিতা ছিলেন সামান্য একজন ছুতার মিস্ত্রী। তাঁহার শক্তির ব্যাখ্যা খুঁজিবার জন্য আমাদের অন্য কাহারও কাছে যাইবার প্রয়োজন নাই। যীশু তাঁহার নিজ অতীতেরই ফল, যে অতীতের সবটুকুই ছিল তাঁহার আবির্ভাবের প্রস্তুতিপর্ব। বুদ্ধ বারবার জীবদেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিভাবে ঐ-সকল জন্মের মধ্য দিয়া তিনি পরিণামে বুদ্ধত্ব

লাভ করিয়াছিলেন তাহারও বিবরণ তিনি দিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ব্যাখ্যা করিবার জন্য নক্ষত্রের দ্বারস্থ হইবার প্রয়োজন আছে কি? নক্ষত্রগুলির সামান্য প্রভাব হয়তো থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনোযোগ না দিয়া এবং না ঘাবড়াইয়া আমাদের কর্তব্য হইল ঐগুলিকে উপেক্ষা করা। আমার সমস্ত শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কথা এই : যাহা কিছু তোমার আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক দুর্বলতা আনে, তাহা পায়ের আঙুল দিয়াও স্পর্শ করিবে না। মানুষের মধ্যে যে স্বাভাবিক শক্তি রহিয়াছে, তাহার বিকাশই ধর্ম। অনন্ত শক্তির উৎস কুণ্ডলীবদ্ধ হইয়া এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে রহিয়াছে এবং সেই উৎস ক্রমে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে। যতই প্রসারিত হয়, ততই ইহা দেহের পর দেহ ধারণ করিবার অনুপযুক্ত দেখা যায়; সেই শক্তি দেহগুলিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উন্নততর দেহ গ্রহণ করে। ইহাই মানুষের ইতিহাস—ধর্ম, সভ্যতা বা প্রগতির ইতিহাস। সেই সুবিশাল শৃঙ্খলিত প্রমিথিয়ুসের বন্ধন ছিঁড়িয়া যাইতেছে। সর্বত্রই এই শক্তির বিকাশ। জ্যোতিষ প্রভৃতি অনুরূপ ভাবের মধ্যে কণামাত্র সত্য থাকিলেও সেগুলি বর্জন করা উচিত।

একটি পুরানো গল্পে আছে, জনৈক জ্যোতিষী রাজার নিকট আসিয়া বলিল, 'আপনি ছয় মাসের মধ্যেই মারা যাইবেন।' রাজা ভয়ে জ্ঞানবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিলেন এবং তখনই তাঁহার মরিবার উপক্রম হইল। কিন্তু মন্ত্রী ছিলেন চতুর ব্যক্তি; তিনি রাজাকে বলিলেন যে, ঐ জ্যোতিষীরা নেহাতই মূর্খ। রাজা তাঁহার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। সুতরাং জ্যোতিষীরা যে নির্বোধ, তাহা রাজাকে দেখাইয়া দিবার জন্য জ্যোতিষীকে আর একবার রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করা ছাড়া মন্ত্রী অন্য কোন উপায় দেখিলেন না। জ্যোতিষী আসিলে তাহার গণনা নির্ভুল কিনা মন্ত্রী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যোতিষী বলিল, তাহার গণনা ভুল হইতে পারে না, কিন্তু মন্ত্রীর সন্তুষ্টির জন্য সে আবার আদ্যোপান্ত গণনা করিয়া অবশেষে জানাইল যে, তাহা একেবারে নির্ভুল। রাজার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মন্ত্রী জ্যোতিষীকে বলিলেন, 'আপনি কখন মরবেন, মনে করেন?' উত্তরে সে বলিল, 'বার বছরের মধ্যে,' মন্ত্রী তাড়াতাড়ি তাঁহার তরবারিখানি বাহির করিয়া জ্যোতিষীর মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন; তারপর রাজাকে বলিলেন 'দেখছেন, কত বড় মিথ্যাবাদী! এই মুহূর্তেই ইহার পরমায়ু শেষ হ'য়ে গেল।'

যদি তোমাদের জাতিকে বাঁচাইতে চাও, তবে ঐ-সব জিনিস হইতে দূরে থাকো। ভালোর একমাত্র পরীক্ষা হইল—উহা আমাদের বলবান্ করে। ভালোর মধ্যেই জীবন, মন্দের মধ্যে মৃত্যু। এই-সব কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজাইতেছে এবং সব-কিছুর যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণে অসমর্থ মেয়েরাই ঐগুলি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ—মেয়েরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, তাহারা এখনও বোধশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন উপন্যাসের গোড়া হইতে কয়েক লাইনের একটি কবিতার উদ্ধৃতি মুখস্থ করিয়া কোন মহিলা বলে, সে গোটা ব্রাউনিং জানে। আর একজন খানতিনেক বক্তৃতা শুনিয়াই ভাবে, সে জগতের সব কিছু জানিয়া ফেলিয়াছে। মুশকিল এই, তাহারা নারীর সহজাত কুসংস্কারগুলি ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহাদের প্রচুর অর্থ আর কিছু বিদ্যা আছে; কিন্তু তাহারা যখন পরিবর্তনের এই মধ্যবর্তী অবস্থা অতিক্রম করিয়া শক্ত হইয়া দাঁড়াইবে, তখনই সব ঠিক হইয়া যাইবে। এখন তাহারা কতকগুলি বচনবাগীশের হাতের পুতুল। দুঃখিত হইও না, কাহাকেও আঘাত করার ইচ্ছা আমার নাই, কিন্তু আমাকে সত্য বলিতেই হইবে। দেখিতে পাইতেছ না কি, তোমরা কিভাবে এ-সবের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হইতেছ? তোমরা দেখিতেছ না কি, এই-সব মেয়েরা কতখানি ঐকান্তিক? অন্তর্নিহিত দেবত্ব কখনও মরে না। সেই দিব্য ভাবকে আহ্বান করিতে জানাই সাধনা।

যতই দিন যাইতেছে, প্রতিদিন ততই আমার ধারণা দৃঢ়তর হইতেছে যে, প্রত্যেক মানুষ দিব্যস্বভাব। পুরুষ বা স্ত্রী যতই জঘন্য চরিত্রের হউক না কেন, তাহার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিনাশ নাই। শুধু সে জানে না, কিভাবে সেই দেবত্বে পৌঁছিতে হয় এবং সেই সত্যের প্রতীক্ষায় আছে। দুষ্ট লোকেরা সর্বপ্রকার বুজরুকির সাহায্যে সেই পুরুষ বা স্ত্রীকে প্রতারিত করার চেষ্টা করিতেছে। যদি একজন অপরকে অর্থের জন্য প্রতারণা করে, তোমরা বলো—সে নির্বোধ ও বদমাস। আর যে অন্যকে অধ্যাত্ম-পথে প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করে, তাহার অন্যায় আরও কত বেশী! কী জঘন্য! সত্যের একমাত্র পরীক্ষা এই যে, ইহা তোমাকে সবল করিবে এবং কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে লইয়া যাইবে। দার্শনিকের কর্তব্য কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে লইয়া যাওয়া। এমন কি এই জগৎ, এই দেহ ও মন

কুসংস্কার-রাশি মাত্র; তোমরা অনন্ত আত্মা! আকাশের মিটমিট-করা তারাগুলি দ্বারা তুমি প্রতারিত হইবে! সেটা লজ্জার কথা। দিব্যাত্মা তোমরা—মিটমিট-করা ক্ষীণালোক নক্ষত্রগুলি তাহাদের অস্তিত্বের জন্য তোমারই কাছে ঋণী।

একদা হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম, আমাদের সম্মুখে ছিল সুদীর্ঘ পথ। কপর্দকহীন সন্ন্যাসী আমরা; কে আমাদের বহন করিয়া লইয়া যাইবে? সুতরাং সমস্ত পথ আমাদের পায়ে হাঁটিতে হইল। আমাদের সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ সাধু। কয়েকশত মাইল চড়াই উৎরাইয়ের পথ তখনও পড়িয়া আছে—সেই দিকে চাহিয়া বৃদ্ধ সাধু বলিলেন, 'কিভাবে আমি এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করিব? আমি আর হাঁটিতে পারিতেছি না; আমার বুক ভাঙিয়া যাইবে।' আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'আপনার পায়ের দিকে তাকান।' তিনি তাকাইলে আমি বলিলাম, 'আপনার পায়ের নীচে যে-পথ পড়িয়া আছে, তাহা আপনিই অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন এবং সামনে যে-পথ দেখিতেছেন, তাহাও সেই একই পথ। শীঘ্রই সেই পথই আপনার পায়ের নীচে আসিবে।' উচ্চতম বস্তুগুলি তোমাদের পায়ের তলায়, কারণ তোমরা দিব্য নক্ষত্র। এ-সব বস্তুই তোমাদের পায়ের তলায়। ইচ্ছা করিলে তোমরা নক্ষত্রগুলি মুঠিতে ধরিয়া গিলিয়া ফেলিতে পারো, তোমাদের যথার্থ স্বরূপের এমনই শক্তি! বলীয়ান্ হও, সমস্ত কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠ এবং মুক্ত হও।

ঐক্য

১৯০০ খৃঃ জুন মাসে নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে প্রদত্ত একটি বক্তৃতার স্মারকলিপি।

ভারতে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতবাদ ঐক্যের একটি মূল ভাব অথবা দ্বৈতভাব থেকে বিকাশ লাভ করেছে।

মতবাদগুলি সবই বেদান্তের অন্তর্গত এবং বেদান্তের সাহায্যে ব্যাখ্যাত। তাদের শেষ সারকথা হ'ল ঐক্যের শিক্ষা। যাঁকে আমরা বহুরূপে দেখছি, তিনিই ঈশ্বর। বস্তুজাত পৃথিবী এবং বহুবিধ ইন্দ্রিয়জাত ভাবাবেগ আমরা অনুভব করি, তবু মাত্র একটি সত্তাই বিদ্যমান।

এই-সমস্ত বিভিন্ন নাম কেবল সেই 'এক'-এর প্রকাশের মাত্রাগত পার্থক্যকে দেখিয়ে দেয়। আজ যে কীট, কাল সে ঈশ্বর। এই যে-সকল স্বাতন্ত্র্যকে আমরা এত ভালবাসি, সে-সবই এক অনন্ত সত্তার অংশমাত্র, এবং সেগুলির ভেদ কেবল প্রকাশের মাত্রায়। সেই অনন্তই মুক্তিলাভ।

উপাসনার প্রণালী সম্পর্কে আমাদের যতই বিভ্রান্তি ঘটুক না কেন, বস্তুতঃ মুক্তির জন্যই আমাদের সকল চেষ্টা। আমরা সুখও চাই না, দুঃখও চাই না; চাই মুক্তি। এই একটি লক্ষ্যের মধ্যেই আছে মানুষের সকল অতৃপ্ত তৃষ্ণার মূল রহস্য। হিন্দুও বলে, বৌদ্ধও বলে—মানুষের তৃষ্ণা জ্বলন্ত, অতৃপ্ত ও ক্রমবর্ধমান।

তোমরা আমেরিকানরা সর্বদা আরও সুখ আর সম্ভোগের সন্ধান ক'রছ। এ-কথা সত্য যে বাইরে তোমরা পরিতৃপ্ত হবে না, কিন্তু ভিতরে—গভীরে তোমরা যা খুঁজছ, তা হ'ল মুক্তি।

এই বাসনার বিশালতা যথার্থ মানুষের নিজের অনন্তত্বের লক্ষণ। যেহেতু মানুষ অনন্ত, তাই বাসনা এবং বাসনাপূর্তি অনন্ত আকার ধারণ করলেই সে পরিতৃপ্ত হ'তে পারে।

তা হ'লে কোন্ বস্তু মানুষকে তৃপ্ত করতে পারে? কাঞ্চন নয়, সম্ভোগ নয়, সৌন্দর্য নয়। শুধু এক অনন্তই তাকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, এবং সেই অনন্ত সে নিজেই। এ-কথা যখন সে উপলব্ধি করে, কেবল তখনই মুক্তি আসে।

'এই বাঁশিটি তার রন্ধ্ররূপী সকল ইন্দ্রিয়, সকল চেতনা, অনুভূতি ও সঙ্গীত নিয়ে শুধু একটি রাগিণীই গাইছে। যে-বন থেকে তাকে ছেদন করা হয়েছিল, সেখানেই ফিরে যাবার সে প্রত্যাশী।

—নিজেকে উদ্ধার কর নিজের দ্বারা,
নিজেকে ডুবতে দিও না কখনো,
কারণ তুমিই তোমার পরম বন্ধু,
আবার তুমিই তোমার চরম শত্রু।'

অনন্তকে সাহায্য করতে পারে কে? অন্ধকারের মধ্য দিয়ে যে হাতখানা তোমার কাছে আসছে, তাকেও তোমার নিজেরই হ'তে হবে।

ভীতি ও বাসনা—এই দুটি কারণই এ-সবের মূল। কে তাদের সৃষ্টি করে? আমরা নিজেরাই। আমাদের জীবন যেন স্বপ্ন থেকে স্বপ্নান্তরে যাত্রা। মানুষ অনন্ত স্বপ্নবিলাসী সীমার স্বপ্ন দেখবে!

আহা! বাইরের কোন বস্তুই যে নিত্য বস্তু নয়—এ যে কী অপূর্ব, আশীর্বাদ! এই আপেক্ষিক জগতে কিছুই চিরন্তন নয়—এ-কথা শুনে যাদের বুক কেঁপে ওঠে, তারা ঐ কথাগুলির অর্থ জানে না।

আমি যেন অনন্ত নীলাকাশ। আমার উপর দিয়ে এই নানা রঙের মেঘ ভেসে চলে যায়, কখন বা এক মুহূর্ত থাকে, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়। আমি সেই চিরন্তন নীলই থেকে যাই। আমি সব কিছুর সাক্ষী, সেই চিরন্তন সাক্ষী। আমি দেখি বলেই প্রকৃতি আছে। আমি না দেখলে প্রকৃতি থাকে না। আমাদের কেউই কিছু দেখতে বা কিছু বলতে পারতাম না, যদি এই অনন্ত ঐক্য এক মুহূর্তের জন্যও ভেঙে যেত।

হিন্দু ও গ্রীকজাতি

তিনটি পর্বতশ্রেণী তিনটি সভ্যতার উন্নতির স্মারকরূপে দণ্ডায়মান: হিমালয়—ভারতীয় আর্য-সভ্যতার, সিনাই—হিব্রু-সভ্যতার, অলিম্পাস—গ্রীক সভ্যতার। আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহারা চিন্তাশীল ও অন্তর্মুখ হইয়া ধর্মের উন্নতি সাধন করিল। তাহারাই আবিষ্কার করিল যে, মানব-মনের শক্তি সীমাহীন; অতএব তাহারা মানসিক ক্ষমতা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিল। ইহার মাধ্যমে তাহারা শিখিল যে, মানুষের মধ্যে এক অনন্ত সত্তা লুক্কায়িত আছে, এবং ঐ সত্তা শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিতেছে। এই সত্তার বিকাশ-সাধনই তাহাদের চরম উদ্দেশ্য হইল।

আর্যজাতির অপর একটি শাখা ক্ষুদ্রতর ও অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত গ্রীস দেশে প্রবেশ করিল। গ্রীসের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা অনুকূল হাওয়ায় তাহাদের কার্যকলাপ বহির্মুখ হইয়া পড়িল এবং এইরূপে তাহারা বাহ্যশিল্প ও বাহিরের স্বাধীনতার বিকাশ সাধন করিল। গ্রীকজাতি রাজনৈতিক স্বাধীনতা অনুসন্ধান করিয়াছিল। হিন্দুগণ সর্বদাই আধ্যাত্মিক মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। উভয় পক্ষই একদেশদর্শী। জাতীয় সংরক্ষণ অথবা স্বাদেশিকতার প্রতি ভারতীয়গণের তত মনোযোগ নাই, তাহারা কেবল ধর্মরক্ষায় তৎপর; অপর পক্ষে গ্রীকজাতির নিকট এবং ইওরোপে (যেখানে গ্রীক সভ্যতার ধারা অনুসৃত হইয়াছে) স্বদেশের স্থান অগ্রে। সামাজিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য প্রযত্ন ত্রুটিবিশেষ, কিন্তু উহার বিপরীত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক মুক্তি উপেক্ষা করিয়া কেবল সামাজিক মুক্তির জন্য যত্নবান্ হওয়া আরও দোষাবহ। আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক—উভয়বিধ মুক্তির জন্যই চেষ্টা প্রয়োজন।

মানুষ ও খ্রীষ্টের মধ্যে প্রভেদ

অভিব্যক্ত হয়ে গেলে জীবে জীবে অনেক প্রভেদ। অভিব্যক্ত জীবরূপে তুমি কখনও খ্রীষ্ট হ'তে পারবে না। মাটি দিয়ে একটি হাতি গড়. আবার সেই মাটি থেকেই একটি ইঁদুর গড়। তাদের জলে ডোবাও—দুটিই একাকার হয়ে যাবে। মৃত্তিকারূপে তাদের চিরন্তন ঐক্য, নির্মিত বস্তু হিসাবে তাদের চিরন্তন পার্থক্য। ঈশ্বর ও মানুষ—নিত্যই হ'ল উভয়ের উপাদান। নিত্যরূপে সর্বব্যাপী সত্তারূপে আমরা সকলে এক; বিশেষ জীবরূপে ঈশ্বর চিরন্তন প্রভু এবং আমরা চিরন্তন ভৃত্য।

তোমাদের মধ্যে তিনটি জিনিস আছে: দেহ, মন, ও আত্মা। আত্মা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, মনের জন্ম-মৃত্যু আছে, এবং দেহেরও আছে। তুমি সেই আত্মা, কিন্তু সচরাচর তোমার ধারণা শরীরটাই বুঝি তুমি। কোন মানুষ যখন বলে, 'আমি এখানে' তখন সে শরীরটার কথাই ভাবে। তারপর আসে আর একটি মুহূর্ত, যখন তুমি সর্বোচ্চ স্তরে বিরাজ ক'রছ; তুমি তখন বলো না, 'আমি এখানে।' তখন যদি কোন ব্যক্তি তোমাকে গালাগাল করে বা অভিশাপ দেয়, তোমার কোন ক্রোধ বা বিরক্তি হয় না, কারণ তুমি হ'লে আত্মা। 'যখন নিজেকে মন ব'লে ভাবি, তখন হে চিরন্তন অগ্নি, আমি তোমার স্ফুলিঙ্গমাত্র। আর নিজেকে যখন আত্মা ব'লে অনুভব করি, তখন তুমি ও আমি অভেদ—এক ভক্ত বলেছিলেন ঈশ্বরকে উদ্দেশ ক'রে। তা হ'লে মন আত্মার অগ্রবর্তী হয় কি ক'রে?

ঈশ্বর যুক্তিবিচার করেন না; যদি সত্যই জানো, তবে যুক্তিবিচার করবে কেন? গোটাকতক তথ্যকে জানবার জন্য এবং তার ভিত্তিতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম দাঁড় করাবার জন্য আমরা যে কীটের মতো সন্ধান ক'রে ফিরছি, সেই চেষ্টায় গড়ে ওঠা সমস্ত জিনিসগুলি আবার ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, এ-সবই আমাদের দুর্বলতার চিহ্ন।

মন ও যাবতীয় বস্তুর উপর আত্মা প্রতিফলিত হয়। আত্মার আলোকই মনকে চেতনায় স্পন্দিত করে। সব কিছুই আত্মার প্রকাশ; মনগুলি অসংখ্য দর্পণের মতো। যাকে তোমরা ভালবাসা, ভয়, ঘৃণা, পুণ্য বা পাপ বলো, সব কিছুই আত্মার প্রতিফলন; প্রতিফলকটি নিম্নস্তরের হ'লে প্রতি-ফলনও ভাল হয় না।

খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ কি অভিন্ন?

আমার একটা বিশেষ ধারণা হ'ল, বুদ্ধই খ্রীষ্ট হয়েছিলেন। বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'পাঁচ-শ বছর পরে আবার আমি আসব' এবং পাঁচ-শ বছর পরে খ্রীষ্ট এসেছিলেন। এঁরা সমগ্র মানব-প্রকৃতির দুই আলোকস্তম্ভ। দুটি মানুষ আবির্ভূত হয়েছিলেন—বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট; এঁরা দুটি বিরাট শক্তি—দুটি প্রচণ্ড বিশাল ব্যক্তিত্ব, দুটি ঈশ্বর। জগৎটাকে তাঁরা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছিলেন। পৃথিবীর যেখানেই সামান্য জ্ঞান আছে, সেখানেই মানুষ বুদ্ধ কিংবা খ্রীষ্টের নামে মাথা নোয়ায়। তাদের মতো আর হওয়া খুবই কঠিন, তবে আশা করি, আরও হবে। পাঁচ-শ বছর পরে এলেন মহম্মদ, আরও পাঁচ-শ বছর পরে প্রোটেস্ট্যাণ্ট তরঙ্গ নিয়ে এলেন লুথার, এবং তারপরে আবার পাঁচ-শ বছর কেটে গেছে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যে যীশু ও বুদ্ধের মতো দু-জন মানুষ জন্মানো একটা বিরাট ব্যাপার। এমন দু-জন মানুষই কি যথেষ্ট নয়? খ্রীষ্ট ও বুদ্ধ ঈশ্বর ছিলেন, অন্যেরা হলেন ধর্মাচার্য। এই দু-জনের জীবন অনুশীলন কর এবং তাঁদের মধ্যে শক্তির বিকাশ লক্ষ্য কর—দেখ কী শান্ত, অপ্রতিরোধের জীবন—ঝুলিতে একটি কপর্দকও নেই, এমন দরিদ্র ভিক্ষুকের মতো, সারা জীবনে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, ধর্মদ্রোহী ও নির্বোধ ব'লে কথিত—আর ভেবে দেখ, সমগ্র মানবজাতির উপর কী বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি তাঁরা মুক্ত ক'রে দিয়েছিলেন।

পাপ থেকে পরিত্রাণ

অজ্ঞান থেকে মুক্তি পেলে তবেই আমরা পাপ থেকে নিস্তার পাব। অজ্ঞতাই কারণ, পাপ হ'ল তার ফল।

জগজ্জননীর কাছে প্রত্যাবর্তন

ধাত্রী যখন কোন শিশুকে উদ্যানে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে খেলা করতে থাকে, মা হয়তো তখন শিশুকে ঘরে ডেকে পাঠায়। শিশু তখন খেলায় মত্ত, সে বলে, 'যাব না; আমি খেতে চাই না।' খানিক বাদেই খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে শিশু বলে, 'আমি মার কাছে যাব।' ধাত্রী বলে, 'এই দেখ নতুন পুতুল,' কিন্তু শিশুটি বলে, 'না, না, পুতুল চাই না, আমি মার কাছে যাব' এবং যতক্ষণ না যেতে পারে কাঁদতে থাকে। আমরা সবাই এক একটি শিশু। ঈশ্বর হলেন জননী। আমরা টাকাকড়ি, ধনদৌলত, ইহজগতের এই সব জিনিষ খুঁজে বেড়াচ্ছি; কিন্তু সময় আসবেই, যখন আমাদের ঘুম ভাঙবে; এবং তখন এই প্রকৃতিরূপ ধাত্রী আমাদের আরও পুতুল দিতে চাইবে, আর আমরা ব'লব, 'না, ঢের হয়েছে; এবার ঈশ্বরের কাছে যাব।'

ঈশ্বর থেকে স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তি-সত্তা নেই

আমরা যদি ঈশ্বর থেকে অবিচ্ছিন্ন এবং তাঁর সঙ্গে সর্বদাই একসত্তা হই তা হ'লে, আমাদের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ব'লে কি কিছু নেই? হ্যাঁ, আছে; তা হ'ল ঈশ্বর। আমাদের ব্যক্তিসত্তা হ'ল ঈশ্বর। তুমি এখন যা, সেটা যথার্থ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নয়। সেই এক সত্যের দিকে তুমি এগিয়ে চলেছ। স্বাতন্ত্র্য কথাটার অর্থ হ'ল যাকে ভাগ করা যায় না। আমরা এখন যে-অবস্থায় আছি, তাকে কেমন ক'রে স্বাতন্ত্র্যের অবস্থা বলবে? এখন এক ঘণ্টা তুমি এক-রকম চিন্তা ক'রছ, আবার পরের ঘণ্টায় অন্যরকম এবং দু-ঘণ্টা পরে আর এক-রকম। স্বাতন্ত্র্য হ'ল তাই, যা অপরিবর্তনীয়। বর্তমান অবস্থা চিরকাল বজায় থাকলে ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যাপার হবে, তা হ'লে চোর চিরকাল চোরই থেকে যাবে, বদমাশ লোক চিরকাল থাকবে বদমাশ। শিশু অবস্থায় যে মরবে তাকে চিরদিন শিশুই থাকতে হবে। প্রকৃত স্বাতন্ত্র্য হ'ল তাই, যার কখনও পরিবর্তন হয় না এবং কখনও হবে না; এবং তা হ'ল আমাদের অন্তরে সমাসীন ঈশ্বর।

রামায়ণ-প্রসঙ্গে

(আলোচনামুখে ছোট ছোট মন্তব্য)

তাঁহাকেই পূজা কর, যিনি সর্বদা আমাদের নিকট রহিয়াছেন, আমরা ভাল অথবা মন্দ যাহাই করি না কেন, 'যিনি কখনও আমাদের পরিত্যাগ করেন না; কারণ ভালবাসা কখনও হীন করে না, ভালবাসায় বিনিময় নাই, স্বার্থপরতা নাই।

রাম ছিলেন বৃদ্ধ নৃপতির জীবনস্বরূপ; কিন্তু তিনি রাজা, সুতরাং তাঁহাকে অঙ্গীকার পালন করিতেই হইয়াছিল।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, 'রাম যেখানে গমন করিবেন, আমি সেইখানেই যাইব।'

হিন্দুগণের নিকট জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃবধূ মাতৃসমা।

অবশেষে তিনি দিগন্তরেখার শেষ প্রান্তে অবস্থিত ক্ষীণ শশিকলার ন্যায় ম্লান ও কৃশ সীতাকে দেখিতে পাইলেন।

সীতা সতীত্বের প্রতিমূর্তি; স্বীয় পতি ব্যতীত অপর কোন পুরুষের অঙ্গ তিনি কদাচ স্পর্শ করেন নাই।

রাম বলিয়াছিলেন, 'পবিত্র? সীতা পবিত্রতা স্বয়ং।'

নাটক ও সঙ্গীতমাত্রই ধর্ম। সঙ্গীতমাত্রেই—তাহা প্রেমের অথবা অন্য যে-কোন সঙ্গীত হউক না কেন—যদি কেহ তাহার সমগ্র হৃদয় সেই সঙ্গীতে ঢালিয়া দিতে পারে, তবে তাহাতেই তাহার মুক্তিলাভ। আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই। যদি কাহারও আত্মা সঙ্গীতে মগ্ন হয়, তবে তাহাতেই তাহার মুক্তি। লোকে বলে, সঙ্গীত একই লক্ষ্যে লইয়া যায়।

পত্নী সহধর্মিণী। হিন্দুকে শত শত ধর্মানুষ্ঠান করিতে হয়। পত্নী না থাকিলে একটি অনুষ্ঠানেও তাহার অধিকার নাই। পুরোহিত পতি ও পত্নীকে একত্র আবদ্ধ করিয়া দেন এবং তাঁহারা উভয়ে একসঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করে, ও শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ পরিক্রমা করিয়া থাকে।

রাম দেহ বিসর্জন করিয়া পরলোকে সীতার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন।

সীতা পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত।

ভারতবর্ষে যাহা কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলিতে তাহাই বুঝায়; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলিতে যাহা বুঝায়—সীতা তাহাই।

সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চির-বিশ্বস্তা, চির-বিশুদ্ধা পত্নী। তাঁহার আজীবন দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে একটিও কর্কশ বাক্য উচ্চারিত হয় নাই। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত দেন নাই। 'সীতা ভব!'—সীতা হও।

খ্রীষ্ট আবার কবে অবতীর্ণ হবেন?

এ-সব ব্যাপারেও আমি বিশেষ মাথা ঘামাই না। আমার কাজ হ'ল মূলনীতি নিয়ে। ভগবান্ বার বার আবির্ভূত হন, আমি শুধু এ-কথাই প্রচার করি; রাম, কৃষ্ণ ও বুদ্ধরূপে তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং আবার তিনি আসবেন। এ-কথা প্রায় স্পষ্টভাবেই দেখানো যেতে পারে যে, প্রতি পাঁচশত বৎসর অন্তর পৃথিবী নিমজ্জমান হয় এবং তখন প্রচণ্ড একটা আধ্যাত্মিক তরঙ্গ আসে, আর সেই তরঙ্গের শীর্ষে থাকেন একজন খ্রীষ্ট।

সারা জগতে এখন এক বিরাট পরিবর্তন আসছে এবং সেটি একই চক্র-পথে ঘটছে। মানুষ দেখছে, সে জীবনের উপর আধিপত্য হারিয়ে ফেলছে; তাদের গতি কোন্ দিকে? নিম্নে না ঊর্ধ্বে? ঊর্ধ্বে নিশ্চয়ই। নিম্নে কিরূপে হবে? ভাঙনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়; নিজের দেহ দিয়ে, জীবন দিয়ে সেই ফাটল ভরাট কর। তোমরা বেঁচে থাকতে কি ক'রে দুনিয়াকে তলিয়ে যেতে দেবে?

১৮৯২-৯৩ খৃঃ মাদ্রাজে গৃহীত স্মারকলিপি হইতে

হিন্দুধর্মের তিনটি মূল তত্ত্ব: ঈশ্বর, আপ্তবাক্যস্বরূপ বেদ, কর্ম ও পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস। যদি কেহ ঠিক ঠিক মর্ম গ্রহণপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করে, তবে উহার মধ্যে সে সমন্বয়ের ধর্ম দেখিতে পাইবে।

অন্যান্য ধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের পার্থক্য এই যে, হিন্দুধর্মে আমরা সত্য হইতে সত্যে উপনীত হই—সত্য হইতে অধিকতর সত্যে, কখনও মিথ্যা হইতে সত্যে নয়।

ক্রমবিকাশের দৃষ্টিতে বেদ অনুশীলন করা উচিত। ধর্মের পূর্ণতা-প্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত ধর্ম-চেতনার অগ্রগতির ইতিহাস উহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

বেদ অনাদি শাশ্বত। ইহার অর্থ এরূপ নয়—যেমন কেহ কেহ ভ্রমবশতঃ মনে করেন যে, উহার বাক্য (শব্দ)-সমূহই অনাদি, শাশ্বত; কিন্তু উহার আধ্যাত্মিক নিয়মসমূহই অনাদি। এই অপরিবর্তনীয় শাশ্বত নিয়মগুলি বিভিন্ন সময়ে মহাপুরুষ বা ঋষিগণ কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐগুলির মধ্যে কতকগুলি বিস্মৃত ও কতকগুলি রক্ষিত হইয়াছে।

যখন বহু লোক বিভিন্ন কোণ ও দূরত্ব হইতে সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, তখন নিজ নিজ দৃষ্টি অনুযায়ী সমুদ্রের এক একটি অংশ প্রত্যেকের দৃষ্টিগোচর হয়। প্রত্যেকে বলিয়া থাকে, সে যাহা দেখিতেছে, তাহাই প্রকৃত সমুদ্র; তাহাদের সকলের কথাই সত্য, কারণ তাহারা সকলেই সেই এক বিশাল বিস্তৃত সমুদ্রের বিভিন্ন অংশ দেখিয়া থাকে। সেইরূপ যদিও বিভিন্ন শাস্ত্রে উক্তিসকল পৃথক্ ও পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয়, সেগুলি সবই সত্য প্রকাশ করিয়া থাকে, কারণ ঐ-সকল উক্তি এক অনন্ত সত্তার বিভিন্ন বর্ণনা।

যখন কেহ সর্বপ্রথম মরীচিকা দেখে, তখন উহা তাহার নিকট সত্য বলিয়াই প্রতীত হয়, পরে তৃষ্ণা-নিবারণের বৃথা চেষ্টা করিয়া সে হৃদয়ঙ্গম করে যে, উহা মরীচিকা। কিন্তু ভবিষ্যতে যখনই ঐ দৃশ্য তাহার নয়নগোচর হয়, তখন উহা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হওয়া সত্ত্বেও সে যে মরীচিকা দেখিতেছে, এ-ধারণা তাহার মনে সর্বক্ষণ বিরাজ করে। জীবন্মুক্তের নিকট মায়ার জগৎ এইরূপ।

যেমন কতকগুলি ক্ষমতা কোন বিশেষ পরিবারের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বর্তমান থাকে, তেমনি বৈদিক রহস্যের কতকগুলি কোন কোন পরিবারের মধ্যেই কেবল জানা ছিল। এই পরিবারগুলির বিলোপ-সাধনের সহিত ঐ-সকল রহস্যও অন্তর্হিত হইয়াছে।

বৈদিক শব-ব্যবচ্ছেদ-বিদ্যা আয়ুর্বেদীয় বিদ্যা অপেক্ষা কম পূর্ণাঙ্গ ছিল না। শরীরের বহু অংশের বিভিন্ন নাম ছিল, যেহেতু যজ্ঞের জন্য তাহাদের পশু-ব্যবচ্ছেদ করিতে হইত। সমুদ্র অর্ণবপোতে পূর্ণ বলিয়া বর্ণিত হয়। সমুদ্র-যাত্রার ফলে সাধারণ লোক বৌদ্ধ হইয়া যাইবে, কতকটা এই আশঙ্কাহেতু পরবর্তী কালে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়।

বৌদ্ধধর্ম বৈদিক পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে নব-গঠিত ক্ষত্রিয়-সম্প্রদায়ের বিদ্রোহ। বৌদ্ধধর্ম হইতে উহার সার গ্রহণ করিয়া লইয়া হিন্দুধর্ম উহা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের সকল আচার্যের প্রচেষ্টা ছিল, হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়ের মধ্যে মিলন-স্থাপন। শঙ্করাচার্যের উপদেশের মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব দেখা যায়। তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার উপদেশ এতদূর বিকৃত করিয়াছিলেন যে, পরবর্তী কালের কোন কোন সংস্কারক আচার্যের অনুগামিগণকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—ইহা ঠিকই হইয়াছে।

স্পেন্সারের 'অজ্ঞেয়' কি বস্তু? উহা আমাদের মায়া। পাশ্চাত্য দার্শনিক-গণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর চরম সত্য সম্বন্ধে ভীত, কিন্তু আমাদের দার্শনিকগণ উহা জানিবার জন্য—অজানাকে জানিবার জন্য বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাঁহারা জয়লাভ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ শকুনির ন্যায় ঊর্ধ্বে বিচরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে নিম্নে গলিত মাংসখণ্ডের প্রতি। অজানাকে তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না, অতএব পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক সর্বশক্তিমান্ ডলারকেই পূজা করিয়া থাকেন।

জগতে উন্নতির দুইটি ধারা আছে—রাজনৈতিক ও ধর্মভিত্তিক। প্রথমটিতে গ্রীকরাই সব—আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রীসের প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণ মাত্র; শেষেরটিতে অর্থাৎ ধর্মের উন্নতির ব্যাপারে হিন্দুদের একচেটিয়া অধিকার।

আমার ধর্ম এরূপ একটি ধর্ম—খ্রীষ্টধর্ম যাহার শাখা ও বৌদ্ধধর্ম যাহার বিদ্রোহী সন্তান।

যখন একটি মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়—যাহা হইতে অপর পদার্থ-গুলির উপাদান সিদ্ধ হয়, তখনই রসায়নবিদ্যা উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হয়। অন্যান্য শক্তিসমূহ যে-শক্তির বিভিন্ন অভিব্যক্তি, সেই মূল শক্তি প্রাপ্ত হইলে শারীর-বিদ্যার উন্নতির অবসান ঘটে। সেইরূপ ঐক্যপ্রাপ্তির সহিত ধর্ম-জগতে উন্নতি করিবার আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। হিন্দুধর্মে তাহাই ঘটিয়াছে।

বেদে নাই—এরূপ কোন ধর্ম-সম্বন্ধীয় নূতন ধারণা কোথাও প্রচারিত হয় নাই।

প্রত্যেক বিষয়ে দুই-জাতীয় বিকাশ বর্তমান—বিশ্লেষণমূলক (analytical) ও সমন্বয়মূলক (synthetical)। প্রথমটিতে হিন্দুগণ অন্যান্য জাতিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। শেষেরটিতে তাঁহাদের স্থান শূন্য।[১]

হিন্দুগণ বিশ্লেষণ ও সূক্ষ্ম বিষয় অনুধাবন করিবার ক্ষমতা অনুশীলন করিয়াছেন। এ পর্যন্ত কোন জাতি পাণিনির ন্যায় ব্যাকরণ উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হন নাই।

রামানুজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাজ হইতেছে জৈন ও বৌদ্ধদের হিন্দুধর্মে পরিবর্তিত করা। রামানুজ মূর্তিপূজার একজন শ্রেষ্ঠ সমর্থক। তিনি প্রেম ও বিশ্বাসকে মুক্তিলাভের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন।

এমন কি ভাগবতে জৈনদের চব্বিশ তীর্থঙ্করের অনুরূপ চব্বিশ অবতারের উল্লেখ আছে। ঋষভদেবের নাম উভয়ের মধ্যে বর্তমান।

যোগাভ্যাস করিলে সূক্ষ্ম বস্তু ধারণা করিবার ক্ষমতা হয়। সিদ্ধপুরুষ বিষয় হইতে গুণসমূহকে পৃথক্ করিয়া এবং বস্তুসত্তা প্রদানপূর্বক তাহাদের

১ Synthesis এখানে বৈজ্ঞানিক সামান্যীকরণ।

স্বতন্ত্রভাবে চিন্তা করিতে সমর্থ। অন্যান্য ব্যক্তিগণ হইতে এখানেই সিদ্ধপুরুষের শ্রেষ্ঠতা।

দুইটি বিপরীত চরম সীমা সর্বদা মিলিত হয় এবং একরূপ দেখায়। শ্রেষ্ঠ আত্মবিস্মৃত ভক্ত, যাঁহার মন অনন্ত পরব্রহ্মের ধ্যানে মগ্ন এবং অত্যন্ত হীন মদ্যপায়ী উন্মাদ—এই দুইজনকে বাহ্যতঃ একরূপ দেখায়। সময় সময় উহাদের সাদৃশ্যহেতু একটিকে অপরটিতে পরিবর্তিত হইতে দেখিয়া আমরা আশ্চর্য হইয়া যাই।

অত্যন্ত দুর্বল-স্নায়ুবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ধার্মিক হিসাবে কৃতকার্য হয়। তাহাদের মাথায় কিছু ঢুকিলে ঐ-বিষয়ে তাহারা অত্যধিক উৎসাহী হইয়া উঠে।

এক ভক্তকে উন্মাদ বলিয়া অভিযোগ করিলে সে উত্তর দিয়াছিল, 'এ-জগতে সকলেই উন্মাদ—কেহ কাঞ্চনের জন্য, কেহ কামিনীর জন্য এবং কেহ ঈশ্বরের জন্য। ডুবিয়া মরাই যদি মানুষের অদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পঙ্কিল জলাশয়ে ডুবিয়া মরা অপেক্ষা দুগ্ধ-সাগরে ডুবিয়া মরাই শ্রেয়ঃ।'

অনন্ত প্রেমময় ঈশ্বর এবং মহৎ ও অনন্ত প্রেমের পাত্রকে নীলবর্ণরূপে চিত্রিত করা হয়। কৃষ্ণের রঙ নীল, সলোমনের[১] প্রেমের ঈশ্বরের রঙও নীল। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে যাহা কিছু মহৎ ও অনন্ত, তাহাই নীল রঙের সহিত যুক্ত। এক অঞ্জলি জল গ্রহণ কর, উহার কোন রঙ নাই। কিন্তু গভীর বিশাল সমুদ্রের দিকে তাকাও, দেখিবে উহা নীল। তোমার কাছে শূন্যস্থান পরীক্ষা করিলেও দেখিবে, উহার কোন বর্ণ নাই। কিন্তু অসীম অনন্ত আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে উহা নীল।

আদর্শবাদী হিন্দুদের মধ্যে যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল, ইহাই তাহার প্রমাণ। চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের কথাই ধর। হিন্দুর চিত্রকলায় কি দেখিতে পাও? সর্বপ্রকার হাস্যোদ্দীপক ও অস্বাভাবিক মূর্তি। হিন্দু মন্দিরে কি

[১] O. T., The Song of Solomon, I, 5, 7, 14

দেখিয়া থাকো? 'চতুর্ভঙ্গ' নারায়ণ বা ঐজাতীয় কোন মূর্তি। কিন্তু কোন ইতালীয় অথবা গ্রীসদেশীয় মূর্তি সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখ, ইহার মধ্যে প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের কি অপূর্ব প্রকাশ! প্রদীপ হস্তে একটি নারীর চিত্র অঙ্কনের জন্য হয়তো একজন বিশ বৎসর ধরিয়া নিজ হাতে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়াছিল।

হিন্দুগণ অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে উন্নতি করিয়াছিলেন। বিভিন্ন-প্রকৃতি মানুষের জন্য বেদে বিভিন্ন প্রকারের বিধান দেওয়া হইয়াছে। বয়স্ককে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা শিশুকে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না।

গুরু হইবেন মানুষের চিকিৎসক। তিনি শিষ্যের প্রকৃতি অবগত হইয়া তাহার পক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা উপযোগী, সেই প্রণালী শিক্ষা দিবেন।

যোগাভ্যাসের অসংখ্য প্রণালী বা পদ্ধতি আছে। কোন কোন প্রণালী কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে উৎকৃষ্ট ফল প্রদান করিয়াছে। কিন্তু ঐগুলির মধ্যে সাধারণভাবে সকলের পক্ষে দুইটির গুরুত্ব অধিক—(১) জাগতিক সকল জ্ঞাত বস্তুকে অস্বীকার করিয়া চরম সত্যে পৌছানো, (২) তুমিই সব, তুমিই সমগ্র বিশ্ব, এইরূপ চিন্তা করা। দ্বিতীয় পদ্ধতি সাধককে প্রথমটি অপেক্ষা দ্রুততর লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিলেও উহা সর্বাপেক্ষা নিরাপদ নয়। সাধারণতঃ ঐ প্রণালী-অবলম্বনে মহা বিপদের আশঙ্কা আছে এবং ইহা সাধককে বিপথে পরিচালিত করিয়া উদ্দেশ্য-লাভে বিঘ্ন জন্মায়।

খ্রীষ্টধর্মে ও হিন্দুধর্মে উপদিষ্ট প্রেমের মধ্যে পার্থক্য এই যে, খ্রীষ্টধর্ম প্রতিবেশীকে ভালবাসিতে শিক্ষা দেয়, কারণ আমরা ইচ্ছা করি যে, প্রতিবেশীরাও আমাদিগকে ভালবাসুক। হিন্দুধর্ম প্রতিবেশীদিগকে আত্মবৎ ভালবাসিতে—বস্তুতঃ তাহাদের মধ্যে আমাদের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে বলে।

সচরাচর একটি বেজিকে লম্বা শিকলে বাঁধিয়া কাঁচের আলমারিতে রাখা হয়, যাহাতে সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে। এরূপে ঘুরিয়া বেড়াইবার সময় কোন বিপদের আভাস পাইলেই সে একলাফে কাঁচের আলমারীতে ঢুকিয়া পড়ে। যোগী এই পৃথিবীতে এভাবেই বিচরণ করেন।

সমগ্র বিশ্ব এক অবিচ্ছিন্ন সত্তা; ইহার একপ্রান্তে জড় জগৎ ও অপর প্রান্তে ঈশ্বর—কতকটা এইরূপ ভাবদ্বারা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের নীতি ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

বেদের বহু সূক্ত সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছে। দীর্ঘকাল উপাসনার ফলে ঋষিগণ ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন এবং অজ্ঞাত রাজ্যের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া জগৎকে ইহা যাচাই করিতে আহ্বান করিয়াছেন। দাম্ভিক লোকেরাই ঋষি-নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করিয়া এবং তাহাদের উপদেশ পালন না করিয়া সমালোচনা ও বিরুদ্ধাচরণ করে। এমন কেহ সাহস পূর্বক বলিতে পারে না যে, ঋষিদের নির্দেশ যথাযথ পালন করিয়াও তাহার কোন প্রকার দর্শন হয় নাই এবং ঋষিগণ মিথ্যাবাদী। এরূপ বহু লোক আছে, যাহারা বিভিন্ন সময়ে নানাবিধ পরীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়া উপলব্ধি করিয়াছে যে, তাহারা ঈশ্বর কর্তৃক পরিত্যক্ত হয় নাই। জগৎ এরূপ যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস যদি আমাদিগকে কোন সান্ত্বনা না দেয়, তবে আত্মহত্যাই শ্রেয়ঃ।

একজন ধার্মিক প্রচারক প্রচারকার্যে বাহিরে গিয়াছিলেন। অকস্মাৎ কলেরায় আক্রান্ত হইয়া তাঁহার তিনটি পুত্র মারা যায়। ঐ ব্যক্তির পত্নী প্রিয় পুত্র তিনটির মৃতদেহ একখণ্ড বস্ত্রে আবৃত করিয়া গৃহের ফটকে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বামী প্রত্যাবর্তন করিলে তিনি তাঁহাকে ঐ স্থানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'স্বামিন্, আপনার নিকট কেহ কোন দ্রব্য গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন এবং আপনার অনুপস্থিতিকালে আসিয়া হঠাৎ উহা ফেরৎ লইয়া গিয়াছেন। আপনি কি সেজন্য দুঃখিত হইবেন?' স্বামী উত্তর দিলেন, 'নিশ্চয়ই নয়।' তখন পত্নী তাঁহাকে গৃহের মধ্যে লইয়া গিয়া বস্ত্রখণ্ড সরাইয়া মৃতদেহ তিনটি তাঁহাকে দেখাইলেন। স্বামী শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া শবদেহগুলি যথোচিত সৎকার করিলেন। বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের ভাগ্যনিয়ন্তা করুণাময় ঈশ্বরের অস্তিত্বে যাঁহাদের বিশ্বাস দৃঢ়, তাঁহারা ঐরূপ মনোবলের অধিকারী হন।

অখণ্ডকে কখনও চিন্তা করা যায় না। সীমাবিশিষ্ট নয়, এরূপ কোন

বস্তুর ধারণা করিতে আমরা সমর্থ নই। অনন্ত ঈশ্বরকে শান্তরূপেই ধারণা ও পূজা করা সম্ভব।

জন ব্যাপটিস্ট ছিলেন একজন 'এসেনি' (Essene)—এক বৌদ্ধসম্প্রদায়-ভুক্ত। দুইটি শিবলিঙ্গকে আড়া-আড়িভাবে স্থাপন করিলেই উহা খ্রীষ্টধর্মের ক্রুশে পরিণত হয়। প্রাচীন রোমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখনও বৌদ্ধপূজার চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

দক্ষিণ ভারতে কতকগুলি 'রাগের' বা স্বরের প্রচলন আছে। ঐ রাগগুলিকে স্বতন্ত্র মনে করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে প্রধান ষড়্‌রাগ হইতেই ঐগুলির উৎপত্তি। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা বা শব্দের দোদুল্যমান স্পন্দনের অতি অল্পই আছে। সেখানে পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীতযন্ত্রের ব্যবহারও দুর্লভ। দক্ষিণদেশের বীণাযন্ত্র প্রকৃত বীণা নয়। আমাদের সামরিক সঙ্গীত বা সামরিক কবিতা—কোনটাই নাই। ভবভূতিকে কিয়ৎপরিমাণে সমরপ্রিয় কবি বলা যাইতে পারে।

যীশুখ্রীষ্ট ছিলেন সন্ন্যাসী। তাঁহার ধর্ম মূলতঃ কেবল সন্ন্যাসীদের উপযোগী। তাঁহার শিক্ষার সারমর্ম—'ত্যাগ কর' আর অধিক কিছু নাই। এই শিক্ষা কয়েকজন অধিকারী ব্যক্তিরই উপযোগী।

'অপর গাল ফিরাইয়া দাও'—এই শিক্ষা অসম্ভব, অসাধ্য। পাশ্চাত্যগণ ইহা জানে। যাহারা ধর্মলাভের আকাঙ্ক্ষা করে, যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণত্ব-লাভ, তাহাদের জন্যই ঐ উপদেশ। সাধারণ লোকের ধর্ম হইল—'নিজ অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হও।' সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ—সকলের নিকট একই প্রকার নৈতিক উপদেশ প্রচার করা যাইতে পারে না।

সকল সাম্প্রদায়িক ধর্মই মনে করে যে, সব মানুষই সমান। বিজ্ঞান কিন্তু উহা সমর্থন করে না। শারীরিক পার্থক্য অপেক্ষা মানসিক পার্থক্য অধিক। হিন্দুধর্মের একটি মূল নীতি হইল প্রত্যেক মানুষই পৃথক্—বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। এমন কি, সুরাসক্ত ও বেশ্যালয়ে গমনকারীর জন্যও হিন্দুধর্মে কিছু মন্ত্রের বিধান রহিয়াছে।

নীতি একটি আপেক্ষিক শব্দ। জগতে বিশুদ্ধ নীতি বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি? ঐ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে একই আদর্শের দ্বারা বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই। দেশের প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক ব্যক্তি বিশেষ অবস্থার অধীন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও অপরিহার্য। এক সময়ে গোমাংস-ভক্ষণ নীতি-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। তখন জলবায়ু শীতল ছিল এবং খাদ্য-শস্যের ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত ছিল না। খাদ্যের মধ্যে মাংসই ছিল প্রধান, সুতরাং সেই যুগে ও সেই সময়ে মাংস একরূপ অপরিহার্য ছিল। কিন্তু বর্তমানে গোমাংস-ভক্ষণ নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গণ্য হয়।

•

ঈশ্বরই একমাত্র অপরিবর্তনীয়। সমাজ চলমান। জগৎ-অর্থে যাহা চলমান, তাহাই বুঝায়। ঈশ্বর অচল। আমার কথা হইতেছে—'সংস্কার' নয়, কিন্তু 'অগ্রসর হও—চরৈবেতি।' জগতে এমন কোন মন্দ বস্তু নাই, যাহার সংস্কার হইতে পারে না। নিজেকে বিভিন্ন অবস্থার সহিত খাপ খাওয়াইয়া চলার মধ্যেই জীবনের সকল রহস্য নিহিত। উহাই জীবন-বিকাশের অন্তর্নিহিত মূলনীতি। বহিঃপ্রকৃতি আমাদিগকে দাবাইয়া রাখিতে চায়, উহাঁর বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই নিজদিগকে বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলার অথবা সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিবার ক্ষমতা। পরিবর্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলার ক্ষমতা যাহার মধ্যে বেশী, সেই দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। আমি এই তত্ত্ব প্রচার না করিলেও সমাজ পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবেই। মানুষকে হয় বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, নতুবা অনাহারী থাকিতে হইবে—এই প্রয়োজনই জগতে কার্য করিতেছে, খ্রীষ্টান ধর্ম অথবা বিজ্ঞান নয়।

•

হিমালয়ের মহোচ্চ শিখরেই জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যদি কেহ সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে, তবে পূর্বে সে যতই অস্থির-চিত্ত থাকুক না কেন, অবশ্যই মানসিক শান্তি লাভ করিবে।

• প্রাকৃতিক নিয়মগুলির মধ্যে ভগবান্‌ই সর্বোচ্চ নিয়ম। এই নিয়মটি একবার জানিতে পারিলে অন্যান্য নিয়মগুলিকে ইহার অধীন বলিয়া ব্যাখ্যা

করা যাইতে পারে। পতনশীল বস্তুগুলির কাছে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-নিয়মের যে স্থান, ধর্মের কাছে ঈশ্বরেরও সেই স্থান।

প্রত্যেক পূজাই উচ্চস্তরের প্রার্থনা। যে-ব্যক্তি ধ্যান অথবা মানস-পূজা করিতে অক্ষম, তাহার পক্ষেই পূজা বা আনুষ্ঠানিক অর্চনার প্রয়োজন। তাহার পক্ষে কোন স্থূল বস্তু প্রয়োজন।

•

সাহসী ব্যক্তিরাই অকপট হইতে পারে। সিংহের সহিত শৃগালের তুলনা কর।

ঈশ্বর ও প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু ভাল, তাহাকে ভালবাসা শিশুর পক্ষেও সম্ভব। কিন্তু ভয়ঙ্কর ও দুঃখজনক বস্তুকেও ভালবাসিতে হইবে। সন্তান যখন দুঃখ দেয়, তখনও পিতা তাহার প্রতি স্নেহ পোষণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তিনি মানবজাতির উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গোপীলীলা প্রেমধর্মের পরাকাষ্ঠা, এই প্রেমে সকল ব্যক্তিত্ব লোপ পায় এবং পরম মিলন ঘটে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ প্রচার করিয়াছেন, 'আমার জন্য সকল আসক্তি ত্যাগ কর'—গোপীলীলায় এই তত্ত্ব অভিব্যক্ত হইয়াছে। ভক্তি হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য বৃন্দাবন-লীলার শরণ লও। এ-বিষয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক আছে। ইহাই ভারতবর্ষের ধর্ম। হিন্দুজাতির বৃহত্তর অংশ শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী।

দরিদ্র, ভিক্ষুক, পাপী, পুত্র, পিতা, পত্নী—শ্রীকৃষ্ণ সকলেরই ঈশ্বর। আমাদের সর্বপ্রকার মায়িক সম্বন্ধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইয়া তিনি এগুলিকে পবিত্র করিয়াছেন এবং পরিণামে মুক্তি প্রদান করেন। দার্শনিক ও পণ্ডিতের নিকট তিনি নিজেকে গোপনে রাখেন, অজ্ঞ ও শিশুর নিকট প্রকট হন। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস ও প্রেমের দেবতা—পাণ্ডিত্যের দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। গোপীদিগের নিকট প্রেম ও ঈশ্বর এক বস্তু। তাহারা জানিত শ্রীকৃষ্ণ প্রেমের অবতার।

দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তব্য শিক্ষা দিতেছেন, বৃন্দাবনে প্রেম। তাঁহার বংশধরগণ দুর্বৃত্ত ছিল বলিয়া তিনি তাহাদের পরস্পরকে বিনাশ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ঈশ্বর সম্বন্ধে ইহুদী ও মুসলমানগণের ধারণা যে, তিনি একজন আদালতের বড় বিচারক। আমাদের ঈশ্বর বাহিরে কঠোর, কিন্তু অন্তরে প্রেম ও করুণায় পূর্ণ।

অদ্বৈতবাদ কি, তাহা না বুঝিয়া কেহ কেহ উহার উলটা অর্থ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, শুদ্ধ ও অশুদ্ধের অর্থ কি, পাপ-পুণ্যের কি প্রভেদ—এগুলি মানুষের কুসংস্কার মাত্র। ফলে তাঁহাদের কাজে তাঁহারা কোন নৈতিক সংযম পালন করেন না। ইহা নিছক বদমাশি। এই ধরনের প্রচারের দ্বারা সর্বপ্রকার ক্ষতি সাধিত হয়।

পাপ ও পুণ্য—অনিষ্টকর পাপ ও হিতকর পুণ্য—এই দুই প্রকার কর্মের দ্বারা দেহ গঠিত। শরীরে কণ্টক বিদ্ধ হইলে ঐ কণ্টকটি তুলিয়া ফেলিবার জন্য অপর একটি কণ্টকের প্রয়োজন, পরে দুইটিই ফেলিয়া দিতে হয়। সিদ্ধি-লাভের নিমিত্ত কেহ পুণ্যরূপ কণ্টকের দ্বারা পাপরূপ কণ্টক দূর করেন। ইহার পরও তিনি জীবনধারণ করিতে পারেন এবং শুধু পুণ্য অবশিষ্ট থাকায় তাঁহার দ্বারা পুণ্যকর্মই অনুষ্ঠিত হয়। জীবন্মুক্তের মধ্যে কিঞ্চিন্মাত্র পুণ্য অবশিষ্ট থাকায় তিনি জীবিত থাকেন, কিন্তু তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই শুদ্ধ।

যাহা কিছু উন্নতির দিকে লইয়া যায়, তাহাই পুণ্য; যাহা হইতে আমাদের অবনতি, তাহাই পাপ। মানুষের মধ্যে তিন প্রকার গুণ আছে—পশুত্ব, মনুষ্যত্ব ও দেবত্ব। যাহা দেবত্বের উৎকর্ষ সাধন করে, তাহাই পুণ্য। যাহা দ্বারা পশুভাব বৃদ্ধি পায়, তাহাই পাপ। পাশব প্রকৃতি নাশ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইবে—অর্থাৎ প্রেমিক ও দয়ালু হইতে হইবে। এই অবস্থাও অতিক্রম করিয়া তোমাদিগকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইতে হইবে—অনির্বাণ অগ্নির ন্যায়, অপূর্ব প্রেমিক, জাগতিক প্রেমের দুর্বলতাশূন্য, দুঃখবোধ-বর্জিত হইতে হইবে।

ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। শাস্ত্রের অনুশাসনে দৃঢ় বিশ্বাসকে 'বৈধী ভক্তি' বলে। রাগানুগা ভক্তি পাঁচ প্রকার—(১) শান্ত—খ্রীষ্টধর্মে ইহা

রূপায়িত হইয়াছে। (২) দাস্য—রামের প্রতি হনুমানের আচরণে উহা পরিস্ফুট। (৩) সখ্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের ভাবের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশিত। (৪) বাৎসল্য—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বসুদেবাদির যে-ভাব, তাহাই বাৎসল্য। (৫) মধুরভাব—শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীগণের জীবনে মধুরভাবের (পতি-পত্নীর সম্বন্ধ) বিকাশ দেখা যায়।

কেশবচন্দ্র সেন সমাজকে একটি ডিম্বাকার (elliptic) ক্ষেত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঈশ্বর কেন্দ্রগত সূর্য। গ্রহকক্ষে অবস্থিত যে-বিন্দুটি সূর্যের নিকটতম, সমাজ কখন সেই বিন্দুটির মতো ঈশ্বরের সমীপবর্তী হয়, আবার কখন সূর্য হইতে সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত বিন্দুটির ন্যায় ঈশ্বর হইতে দূরে সরিয়া যায়। অবতার আসিয়া ইহাকে ঈশ্বরের সমীপবর্তী করেন। পরে আবার ইহা দূরে সরিয়া যায়। কেন ঐরূপ হইবে? বলিতে পারি না। অবতারের প্রয়োজন কি? সৃষ্টির কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর কেন আমাদের সকলকে পূর্ণ করিয়া সৃষ্টি করেন নাই? ইহাই লীলা, ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর।

মানুষ ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে পারে না। যদি কেহ ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার রচিত সৃষ্টি দেখাও। বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি তাঁহার নিজের কল্পনামাত্র। ঐ সৃষ্টিকে বিশ্বামিত্রের নিয়মে চলিতে হইত। যদি যে-কেহ স্রষ্টা হইতে পারেন, তবে বহু নিয়মের সংঘর্ষের ফলে এই জগতের অবসান ঘটিবে। জগতের ভারসাম্য এরূপ সুন্দর যে, যদি একটি পরমাণুরও সাম্যাবস্থা ভঙ্গ কর, তবে সমগ্র জগৎ লয়প্রাপ্ত হইবে।

মহাপুরুষগণ এত বিরাট ছিলেন যে, কোন সংখ্যা বা পরিমাণ দ্বারা তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ঈশ্বরের সহিত তুলনায় তাঁহারা জ্যামিতিক বিন্দুমাত্র। অনন্তের সহিত তুলনায় সবই অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বরের সহিত তুলনা করিলে বিশ্বামিত্র একটি ক্ষুদ্র মনুষ্য-পতঙ্গ ব্যতীত আর কি? আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ক্ষেত্রে পতঞ্জলি ক্রমবিকাশ-নীতির প্রবর্তক।

জীব সাধারণতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা অপেক্ষা দুর্বল, নিজেকে ঐ অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছে। কখন কখন তাহার সংগ্রাম সেই উপযুক্ততাকেও অতিক্রম করে। উহার ফলে তাহার সমগ্র শরীরের রূপান্তর ঘটে। নন্দী একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পবিত্রতা এত বেশী হইয়াছিল যে, মানব-শরীরের পক্ষে উহা ধারণ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তাহার দেহকোষস্থিত পরমাণুগুলি দেব-দেহে পরিণত হইয়াছিল।

প্রতিযোগিতারূপ ভয়ঙ্কর যন্ত্রই সমুদয় ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাও তো নিজেকে যুগোপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা কর। আমরা যদি আদৌ বাঁচিয়া থাকিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে বৈজ্ঞানিক জাতিতে পরিণত হইতে হইবে। মানসিক শক্তিই প্রকৃত বল। ইওরোপীয়দিগের সংগঠন-ক্ষমতা তোমাদের শিক্ষা করা আবশ্যক। তোমাদের নিজেদের শিক্ষিত হওয়া এবং মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বাল্য-বিবাহ প্রথা রহিত করিতেই হইবে।

এই-সকল চিন্তা সমাজে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। তোমরা সকলেই ইহা জানো, কিন্তু তোমরা কেহই ইহা কার্যে পরিণত করিতে সাহস কর না। বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? উপযুক্ত সময়ে এক অদ্ভুত মহাপুরুষের আগমন হইবে। তখন সকল ইঁদুরই সাহস লাভ করিবে।

যখনই কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, তখন সমুদয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাঁহার জন্য প্রস্তুত থাকে। তিনি যেন উটের পিঠের শেষ তৃণখণ্ডের মতো। তিনি যেন কামানের গোলার স্ফুলিঙ্গ। তাঁহার কথায় কিছু একটা আছে—আমরা তাঁহার জন্য পথ প্রস্তুত করিতেছি।

কৃষ্ণ কি চতুর ছিলেন? না, চতুর ছিলেন না। যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। দুর্যোধনই যুদ্ধ বাধাইয়াছিল। কিন্তু একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া উচিত নয়—কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ইহাই ধর্ম। পশ্চাৎপদ হইও না, উহা কাপুরুষতার পরিচায়ক। একবার কার্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা অবশ্যই সম্পন্ন করিতে হইবে,

এক ইঞ্চিও আর নড়া উচিত নয় —অবশ্য ইহা কোন অন্যায় কার্যের জন্য নয়। এই যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ।

শয়তান নানা ছদ্মবেশে আসে—ক্রোধও ন্যায়ের বেশে, কামনা ও কর্তব্যের আকারে। শয়তানের প্রথম আবির্ভাব লোকে জানিতে পারিলেও পরে ভুলিয়া যায়। যেমন উকিলদের বিবেকবুদ্ধি—প্রথমে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে যে, সমস্তই দুষ্টামি (বদমাশি)—তারপর মক্কেলের প্রতি তাহাদের কর্তব্য-বুদ্ধি আসে। অবশেষে তাহারা কঠোর হয়।

যোগিগণ নর্মদার তীরে বাস করেন, সেখানকার জলবায়ু সমভাবাপন্ন বলিয়া তাঁহাদের বাসের পক্ষে উত্তম। ভক্তগণ অবস্থান করেন বৃন্দাবনে।

সিপাহীরা শীঘ্র মারা যায়; প্রকৃতি ত্রুটিপূর্ণ; মল্লবীরগণের শীঘ্র শীঘ্র মৃত্যু ঘটে। ভদ্রশ্রেণী সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী, আর দরিদ্রেরা সবচেয়ে কষ্টসহিষ্ণু। কোষ্ঠবদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে ফলাহারই উপযুক্ত হইতে পারে। মস্তিষ্কের কাজ করিতে হয় বলিয়া সভ্য মানুষের বিশ্রাম প্রয়োজন এবং খাদ্যের সহিত তাহাকে মশলা ও চাটনি গ্রহণ করিতে হয়। অসভ্য লোকেরা প্রতিদিন চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল হাঁটে, সবচেয়ে স্নিগ্ধ খাদ্যই তাহার রুচিকর। আমাদের ফলগুলি সবই কৃত্রিম এবং স্বাভাবিক আম অতি সামান্য ফল। গমও কৃত্রিম।

ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া দেহে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় কর।

গৃহস্থের আয় অনুযায়ী ব্যয় করিবার নিয়ম আছে। সে আয়ের এক চতুর্থাংশ পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণে, এক চতুর্থাংশ দানকার্যে, এক চতুর্থাংশ নিজের জন্য ব্যয় করিবে এবং এক চতুর্থাংশ সঞ্চয় করিবে।

বহুত্বে একত্ব, সমষ্টিতে ব্যষ্টি—ইহাই সৃষ্টির রীতি।

শুধু কারণকে অস্বীকার করিতেছ কেন? কার্যকেও 'অস্বীকার কর।' কার্যের মধ্যে যাহা কিছু আছে, কারণের মধ্যে তাহাই রহিয়াছে।

খ্রীষ্টের জীবন মাত্র আঠারো মাস সাধারণের নিকট প্রকাশিত ছিল। ইহার জন্য তিনি বত্রিশ বৎসর ধরিয়া নীরবে নিজেকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

প্রকাশ্য জীবন যাপনের পূর্বে মহম্মদের চল্লিশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছিল।

ইহা সত্য যে, স্বাভাবিক অবস্থায় জাতিবৈষম্য-প্রথা আবশ্যক হয়। যাহাদের কোন বিশেষ কার্যের প্রবণতা আছে, তাহারা এক শ্রেণীভুক্ত হয়। কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তির শ্রেণী নির্ণয় করিবে কে? ব্রাহ্মণ যদি মনে করেন, অধ্যাত্মবিদ্যা-চর্চায় তাঁহার বিশেষ প্রবণতা আছে, তাহা হইলে প্রকাশ্য সভায় শূদ্রের সহিত মিলিত হইতে তিনি ভয় পান কেন? কোন বলবান্ অশ্ব কি নিস্তেজ অশ্বের সহিত দৌড়ের প্রতিযোগিতা করিতে ভয় পায়?

'কৃষ্ণ-কর্ণামৃতের' রচয়িতা ভক্ত বিল্বমঙ্গলের জীবনী উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারেন নাই বলিয়া তিনি নিজের দুইটি চোখ উৎপাটন করিয়াছিলেন। বিপথগামী ভালবাসাও যে পরিণামে প্রকৃত প্রেমে পরিণত হয়, এই তত্ত্বের দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন।

আধ্যাত্মিকতা ও সর্ববিষয়ে সূক্ষ্ম অতি দ্রুত উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উচ্চতর তত্ত্ব লইয়া হিন্দুগণ সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন। ইহার ফলে তাহারা ঐহিক বিষয়ে বর্তমান অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। হিন্দুগণকে পাশ্চাত্যের নিকট কিঞ্চিৎ বস্তুতন্ত্রবাদ শিক্ষা করিতে হইবে এবং ইহার পরিবর্তে পাশ্চাত্যকে কিছু আধ্যাত্মিকতা শিখাইতে হইবে।

তোমাদের নারীগণকে শিক্ষা দিয়া ছাড়িয়া দাও। তারপর তাহারাই বলিবে, কোন্ জাতীয় সংস্কার তাহাদের পক্ষে আবশ্যক। তাহাদের সম্পর্কে কথা বলিবার তুমি কে?

ভাঙ্গী ও পারিয়াগণের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য দায়ী কাহারা? আমাদের হৃদয়হীন ব্যবহার ও সেই সঙ্গে অদ্ভুত অদ্বৈতবাদ-প্রচার—ইহা কি অনিষ্ট করিয়া তারপর অপমান চাপাইয়া দেওয়া নয়?

এই জগতে সাকার ও নিরাকার পরস্পর সম্বদ্ধ। নিরাকারকে সাকারের মধ্য দিয়াই প্রকাশ করা যাইতে পারে, আবার নিরাকারের সহিতই সাকার চিন্তা করা যাইতে পারে। আমাদের চিন্তারই বাহ্যরূপ জগৎ। প্রতিমার মধ্যেই ধর্মের অভিব্যক্তি।

ঈশ্বরে সর্বপ্রকার প্রকৃতি সম্ভব। কিন্তু কেবল মানব-প্রকৃতির মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারি। যেমন পিতা বা পুত্ররূপে আমরা মানুষকে ভালবাসি, তেমনি ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারি। নর ও নারীর মধ্যে যে প্রেম, তাহাই দৃঢ়তম প্রেম, উহাও আবার যত গোপনীয় হইবে ততই দৃঢ়তর হইবে। এই প্রেম রাধাকৃষ্ণের প্রেমের মধ্য দিয়াই ব্যক্ত হইয়াছে।

মানুষ পাপী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে—এ-কথা বেদে কোথাও উক্ত হয় নাই। মানুষকে পাপী বলা মানবচরিত্রে এক জঘন্য অমর্যাদা আরোপ করা।

সত্যকে প্রত্যক্ষ করার অবস্থায় উপনীত হওয়া সহজ নয়। সে-দিন সমগ্র চিত্রের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত বিড়ালটিকে কেহ খুঁজিয়া পায় নাই, যদিও চিত্রের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াই বিড়ালটি ছিল।

কাহাকেও আঘাত করিয়া তুমি স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পার না। সৃষ্টি এক অদ্ভুত যন্ত্র। ঈশ্বরের প্রতিশোধ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নাই।

কাম অন্ধ, মানুষকে নরকে লইয়া যায়। ভালবাসাই প্রেম, ইহা স্বর্গে লইয়া যায়।

কৃষ্ণ-রাধার প্রেমে কামের লেশ নাই। রাধা কৃষ্ণকে বলেন, 'তুমি যদি আমার হৃদয়ে পদার্পণ কর, তাহা হইলে আমার সকল কাম দূরীভূত হইবে।' ভগবানের প্রতি অনুরাগ হইলে কাম চলিয়া যায়, তখন থাকে শুধু প্রেম।

এক কবি এক রজকিনীর প্রেমে পড়িয়াছিল। স্ত্রীলোকটির পায়ে গরম ডাল পড়িয়াছিল, তাহার ফলে কবির চরণ পুড়িয়া যায়।

শিব ঈশ্বরের অত্যুচ্চ প্রকাশ, কৃষ্ণ ঈশ্বরের মাধুর্যময় প্রকাশ। প্রেম ঘনীভূত হইয়া নীলরঙে পরিণত হয়। নীলরঙ প্রগাঢ় প্রেমের দ্যোতক।

সলোমন 'কৃষ্ণ'কে দর্শন করিয়াছিলেন। এখানে (ভারতে) অনেকেই কৃষ্ণকে দর্শন করিয়াছে।

এখনও তোমার প্রেম হইলে তুমি রাধাকে দর্শন কর। রাধা হইয়া যাও এবং মুক্ত হও। নান্যঃ পন্থাঃ। খ্রীষ্টানরা সলোমনের সঙ্গীতের মর্মগ্রহণ করিতে পারে না। তাহাদের মতে—ইহা চার্চের প্রতি খ্রীষ্টের গভীর অনুরাগের প্রতীক—ভবিষ্যদ্বাণী। তাহাদের নিকট ঐ সঙ্গীত অর্থহীন এবং সেজন্য সঙ্গীত সম্বন্ধে অনেক কাহিনী সৃষ্টি করে।

হিন্দুগণ বুদ্ধকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। ঈশ্বরের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস আস্তিক্যবুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ আছেন কি নাই, বৌদ্ধেরা তাহা জানিবার চেষ্টা করে না। কশাঘাত করিয়া আমাদিগকে কর্মে তৎপর করিবার জন্যই বুদ্ধের আবির্ভাব—সৎ হও, রিপুগুলি দমন কর। তখন নিজেই জানিতে পারিবে, দ্বৈত অদ্বৈত দর্শনের কোন্‌টি সত্য—ঈশ্বর এক অথবা একের অধিক। বুদ্ধ হিন্দুধর্মের সংস্কারক ছিলেন।

একই ব্যক্তির মধ্যে মাতা দেখেন সন্তানকে, আবার একই সময়ে পত্নী সেই ব্যক্তিকে দেখে অন্যভাবে। ইহার ফলও বিভিন্ন। মন্দ ব্যক্তি ঈশ্বরের মধ্যে দেখে মন্দ, ধার্মিক তাঁহার মধ্যে দেখেন পুণ্য। ঈশ্বরকে সকল রূপেই চিন্তা করা যায়। প্রত্যেকের ভাব অনুযায়ী তিনি রূপ পরিগ্রহ করেন। বিভিন্ন পাত্রে জল বিভিন্ন আকার ধারণ করে, কিন্তু সকল পাত্রেই জল আছে। অতএব সকল ধর্মই সত্য।

ঈশ্বর নিষ্ঠুর, আবার নিষ্ঠুর নন। তিনি সর্বভূতে আছেন আবার নাই। অতএব তিনি পরস্পরবিরুদ্ধ-ভাবময়। প্রকৃতিও পরস্পর-বিরোধী ভাবরাশি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ভাবী সভ্যতার দিঙ্‌নির্ণয়

শুধু আধ্যাত্মিক জ্ঞানই আমাদের দুঃখরাশির আত্যন্তিক নিবৃত্তি করিতে পারে। অন্য যে-কোন জ্ঞান কিছু সময়ের জন্য মাত্র আমাদের অভাব মিটাইতে পারে। আত্মজ্ঞানের উন্মেষ হইলেই অভাববোধ চিরতরে বিদূরিত হয়।

দৈহিক শক্তির বিকাশ অবশ্যই বড় কথা; বৈজ্ঞানিক তথ্যানুসন্ধী যন্ত্রসমূহের মধ্য দিয়া মনীষার যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহাও অদ্ভুত বটে; তবুও আত্মিকশক্তি জগতের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, তাহার তুলনায় এই সব শক্তি নগণ্য।

যন্ত্র কখনও মানুষকে সুখী করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। যাহারা যন্ত্রসভ্যতার মাহাত্ম্য প্রচার করে, তাহাদের মতে যন্ত্রের মধ্যেই সুখ নিহিত। বাস্তবিকপক্ষে সুখের উদ্ভব ও স্থিতি মনেই। মন যাহার বশে, সে-ই কেবল সুখী, অপর কেহ নয়। সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিও যদি পাও, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পরমাণুকে যদি করতলগত করিতে পারো, তাহাতেই বা তোমার কি লাভ? বস্তুতঃ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই মানুষের জন্ম; পাশ্চাত্য জনগণ 'প্রকৃতি' বলিতে স্থূল অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতিকেই বুঝিয়া থাকে। অশেষ শক্তির আধার নদী, পর্বত, সাগর প্রভৃতি অসংখ্য বৈচিত্র্যের সমাবেশে এই বহিঃপ্রকৃতি সত্যই বিরাট! কিন্তু ইহা অপেক্ষাও এক মহত্তর প্রকৃতি—মানুষের অন্তর্জগৎ। এই অন্তর্জগতের সমীক্ষাতেই প্রাচ্য-প্রতিভা সম্যক্ বিকশিত হইয়াছে, যেমন বহির্জগতের ক্ষেত্রে প্রতীচ্য প্রতিভা।

পাশ্চাত্য দেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্যে অতীন্দ্রিয় জগৎ সেইরূপ। মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের মতো প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন রহিয়াছে; বোধহয় সে প্রয়োজন আরও বেশী।

পার্থিব ক্ষমতায় শক্তিশালী জাতিগুলি মনে করে যে, ঐ শক্তিই একমাত্র কাম্য, উহাই প্রগতি ও সংস্কৃতি; যাহাদের বিত্ত-লালসা নাই, ঐহিক প্রতাপ নাই—তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার অযোগ্য। পক্ষান্তরে অন্য কোন জাতি মনে করিতে পারে—নিছক জড়বাদী সভ্যতা একান্ত নিরর্থক! প্রত্যেকটিরই নিজস্ব গুরুত্ব ও মহিমা আছে। এই দুইটি আদর্শের মিলন ও সামঞ্জস্যই হইবে বর্তমানকালের মীমাংসা।

পত্রালাপে প্রশ্নোত্তর

[ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি প্রশ্ন ও স্বামীজীর সংক্ষিপ্ত উত্তর :
১৯০০ খৃঃ ২৪শে মে, স্যান ফ্র্যান্সিস্কো]

প্র—পৃথ্বীরায় ও চাঁদ যখন কান্যকুব্জে স্বয়ংবরে যেতে মনঃস্থ করেন, তখন তাঁরা কাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন—তা মনে করতে পারছি না।

উত্তর—উভয়েই চারণের বেশে গিয়েছিলেন।

প্র—পৃথ্বীরায় যে সংযুক্তাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তা কি এই জন্য যে, সংযুক্তা ছিলেন অসামান্যা রূপসী এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর দুহিতা? সংযুক্তার পরিচারিকা হবার জন্য তিনি কি নিজের একজন দাসীকে শিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং এই বৃদ্ধা ধাত্রীই কি রাজকুমারীর মনে পৃথ্বীরায়ের প্রতি ভালবাসার বীজ অঙ্কুরিত করেছিল?

উ—পরস্পরের রূপগুণের বর্ণনা শুনে ও আলেখ্য দেখে তাঁরা একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আলেখ্য-দর্শনে নায়ক-নায়িকার মনে পূর্বরাগের সঞ্চার ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রীতি।

প্র—কৃষ্ণ যে গোপবালকদের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছিলেন, তার কারণ কি?

উ—এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, কৃষ্ণ কংসকে সিংহাসনচ্যুত করবেন। পাছে জন্মের পর কৃষ্ণ কোথাও গোপনে লালিত পালিত হন, সেই ভয়ে দুরাচার কংস কৃষ্ণের পিতামাতাকে (যদিও তাঁরা ছিলেন কংসের ভগ্নী ও ভগ্নীপতি) কারাগারে নিক্ষেপ করেছিল এবং এই আদেশ দিয়েছিল যে, সেই বৎসরে রাজ্যের মধ্যে যত বালক জন্মাবে, সকলকেই হত্যা করা হবে। অত্যাচারী কংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই কৃষ্ণের পিতা কৃষ্ণকে গোপনে নদী পার করেছিলেন।

প্র—তাঁর জীবনের এ অধ্যায় কি ভাবে শেষ হয়?

উ—অত্যাচারী কংসের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে তিনি নিজে ভাই বলদেব ও পালক-পিতা নন্দের সঙ্গে রাজসভায় যান। অত্যাচারী তাঁকে বধ করবার ষড়যন্ত্র করেছিল। তিনি অত্যাচারীকে বধ করলেন, কিন্তু নিজে রাজ্য অধিকার না ক'রে কংসের নিকটতম উত্তরাধিকারীকে সিংহাসনে বসালেন। কর্মের ফল তিনি নিজে কখনও ভোগ করতেন না।

প্র—এই সময়কার কোন চমকপ্রদ ঘটনার কথা বলতে পারেন কি?

উ—কৃষ্ণের এই সময়কার জীবন অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। শৈশবে তিনি বড়ই দুরন্ত ছিলেন। দুষ্টামির জন্য তাঁর গোপিনী মাতা একদিন তাঁকে মন্থনরজ্জু দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সমস্ত রজ্জু একত্র জুড়েও তার দ্বারা তিনি তাঁকে বাঁধতে পারলেন না। তখন তাঁর চোখ খুলে গেল, আর তিনি দেখলেন যে, যাঁকে তিনি বাঁধতে যাচ্ছেন, তাঁর দেহে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড অধিষ্ঠিত। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ভগবানের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ভগবান তখন তাঁকে আবার মায়া দ্বারা আবৃত করলেন; আর তিনি শুধু বালকটিকেই দেখতে পেলেন।

পরব্রহ্ম যে গোপবালক হয়েছেন, এ-কথা দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার বিশ্বাস হ'ল না। তাই পরীক্ষা করবার জন্য একদা তিনি ধেনুগুলি ও গোপবালকদিগকে চুরি ক'রে এক গুহার মধ্যে ঘুম পাড়িয়ে রেখে দিলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন যে, সেই-সব ধেনু ও বালক কৃষ্ণকে ঘিরে বিরাজ করছে! তিনি আবার সেই নূতন দলকে চুরি করলেন এবং লুকিয়ে রাখলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, তারা যেমন ছিল, তেমনি সেখানে রয়েছে। তখন তাঁর জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হ'ল, তিনি দেখতে পেলেন—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড এবং সহস্র সহস্র ব্রহ্মা কৃষ্ণের দেহে বিরাজমান।

কালীয় নাগ যমুনার জল বিষাক্ত করছিল ব'লে তিনি ফণার উপর নৃত্য করেছিলেন। ইন্দ্রের পূজা তিনি বারণ করাতে ইন্দ্র কুপিত হয়ে এরূপ প্রবলবেগে বারিবর্ষণ আরম্ভ করলেন যেন সমস্ত ব্রজবাসী বন্যার জলে ডুবে মরে, তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন। কৃষ্ণ একটিমাত্র অঙ্গুলি দ্বারা গোবর্ধন পর্বতকে ছাতার মতো ঊর্ধ্বে তুলে ধরলেন, আর তার নীচে ব্রজবাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ ক'রল।

শৈশব হতেই তিনি নাগপূজা ও ইন্দ্রপূজার বিরোধী ছিলেন। ইন্দ্রপূজা একটি বৈদিক অনুষ্ঠান। গীতার সর্বত্র ইহা স্পষ্ট যে, তিনি বৈদিক যাগযজ্ঞের পক্ষপাতী ছিলেন না।

জীবনের এই সময়েই তিনি গোপীদের সঙ্গে লীলা করেছিলেন। তখন তাঁর বয়স পনর বৎসর।

একটি অপরূপ পত্রালাপ

[এই পত্রালাপটি যথাযথভাবে উপভোগ করিতে হইলে পাঠকদের জানিতে হইবে, কোন্ ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই পত্রালাপ শুরু হয় এবং পত্রব্যবহারকারীদের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল। প্রথম পত্রের গোড়ার দিকে স্বামীজী লিখিয়াছেন, তিনি জোর আঘাত দিয়েছেন। সেটা আর কিছু নয়, নিজ আচরণের সমর্থনে ১৮৯৫ খৃঃ ১লা ফেব্রুআরি[১] একটি অত্যন্ত কড়া চিঠি তিনি পত্রোদ্দিষ্টাকে লিখিয়াছিলেন। সেই অপূর্ব পত্রটিতে স্বামীজীর সন্ন্যাসী-সত্তা অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এই কবিতাকার পত্রগুচ্ছ পড়িবার পূর্বে সেই পত্রটি পড়া প্রয়োজন। পত্রোদ্দিষ্টা মেরী হেল মিঃ ও মিসেস হেলের (স্বামীজী যাঁহাদের ফাদার পোপ ও মাদার চার্চ বলিতেন) দুই কন্যার একজন। ঐ দুই হেল-ভগিনী এবং তাঁদের সম্পর্কিত আরও দুই ভগিনীকে স্বামীজী নিজের ভগিনীর মতো দেখিতেন, এবং তাঁহারাও স্বামীজীকে পরম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীজীর কয়েকটি মূল্যবান্ চিঠি এই ভগিনীদের উদ্দেশে লেখা।

বর্তমান পত্রালাপে স্বামীজীকে এক নূতন আলোকে দেখা যায়—রঙ্গপ্রিয় অথচ একান্ত গম্ভীর, পরিহাসের মধ্যেও তাঁহার জীবনের মূলভিত্তি ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পত্রালাপের প্রথম চিঠিটি নিউ ইয়র্ক হইতে ১৮৯৫ খৃঃ ১৫ই ফেব্রুআরি লেখা। সম্পাদক]

শোন আমার বোনটি মেরী,
হয়ো না দুখী—যদিও ভারী
ঘা খেয়েছ, তবুও জানো
জানো বলেই বলিয়ে নাও—
আমি তোমায় ভালবাসি
সারাটা এই হৃদয় দিয়ে।

[১] এই গ্রন্থাবলীর ৬ষ্ঠ খণ্ডে ৮২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

বলতে পারি বাজি রেখে—
সেই শিশুরা বন্ধু আমার
রইবে চির দুঃখে সুখে,
আমিও তাদের বন্ধু তেমন,
জানো তুমি মেরী-শিশু
ভালভাবেই জানো তাহা।

* সর্প যদি পদাহত ধরে তার ফণা,
অগ্নি যদি সমুত্থিত—শিখা লক্‌লক্‌,
প্রতিধ্বনি ঘুরে ফিরে রিক্ত মরুভূমে
দীর্ণবক্ষ সিংহ যবে গর্জে ঘোর রোষে।

বিদ্যুতের বাণবিদ্ধ মহামেঘরাশি
বন্যাশক্তি উন্মোচন করে বজ্রস্বরে,
সেইমত মহাপ্রাণ মুক্ত মহাদানে
আত্মা যবে আলোড়িত সত্তার গভীরে।

ম্লান হোক আঁখি-তারা, প্রাণ হোক ক্ষীণ,
বন্ধু নাই, প্রেম হোক অবিশ্বাসে লীন,
ভয়ঙ্কর ভাগ্য যদি হানে মৃত্যুভয়,
ঘনীভূত অন্ধকারে রুদ্ধ যদি পথ,

প্রকৃতি বিরূপ যদি ভ্রুকুটি-কুটিল
তব ধ্বংস চায় তবু জেনো—তুমি সেই।
তুমি দিব্য, ধাও ধাও, সম্মুখেতে শুধু,
ধাও নিজ লক্ষ্য পানে নিত্যগতি ধরি।

দেব নহি, আমি নহি পশু কিংবা নর,
দেহ নহি, মন নহি, নারী বা পুরুষ,

শাস্ত্র স্তব্ধ সবিস্ময়ে আমা পানে চাহি,
আমার প্রকৃতি ঘোষে—'আমি সেই' বাণী।

সূর্য চন্দ্র নক্ষত্রের জন্মিবার আগে
ছিনু আমি, যবে নাহি ছিল পৃথ্বী ব্যোম্,
নাহি ছিল মহাকাল, 'সে'ও নাহি ছিল,
ছিলাম, রয়েছি আমি, রবো চিরকাল।

এ পৃথিবী অপরূপা, এ সূর্য মহান্
চন্দ্রমা মধুর এত, তারকা আকাশ —
কার্য-কারণেতে বাঁধা সৃষ্টি সকরুণ
বন্ধনে জীবন তার, বন্ধনে মরণ।

মন তার মায়াময় জাল ছুঁড়ে দেয়,
বেঁধে ফেলে একেবারে নির্মম নিষ্পেষে ;
পৃথিবী, নরক, স্বর্গ—ভালো ও মন্দের
চিন্তা আর ভাবনার ছাঁচ গড়ে ওঠে।

জেনো কিন্তু—এ সকলই ফেনপুঞ্জবৎ
স্থান কাল পাত্র আর কার্য ও কারণ,
আমি কিন্তু ঊর্ধ্বচারী ইন্দ্রিয় মনের
নিত্য দ্রষ্টা সাক্ষী আমি এই সৃষ্টি মাঝে।

দুই নয়, বহু নয়, এক—শুধু এক,
তাইতো আমার মাঝে আছে সব 'আমি',
অনিবার তাই প্রেম,—ঘৃণা অসম্ভব ;
'আমি' হ'তে আমারে কি সরানো সম্ভব ?

স্বপ্ন হ'তে জেগে ওঠ, বন্ধ কর নাশ
হও অভী, বলো বীর : নিজ দেহ-ছায়া
ভীত আর নাহি করে, ওগো মৃত্যুঞ্জয়
আমি ব্রহ্ম, এই চির সত্য জ্যোতির্ময়।*[১]

আমার কবিতা এই পর্যন্ত। আশা করি তোমরা সকলে কুশলে আছ। মাদার চার্চ এবং ফাদার পোপকে ভালবাসা জানিও। আমি এত ব্যস্ত যে মরবার সময় নেই, এক ছত্র লেখবার পর্যন্ত সময় নেই। অতএব ভবিষ্যতে যদি লিখতে দেরী হয় ক্ষমা ক'রো।

তোমাদের চিরকালের
বিবেকানন্দ

মিস মেরী হেল উত্তরে লিখে পাঠালেন :

'কবি হবো আমি' এই সাধনায়
সন্ন্যাসী মহাবীর
সুর ভেঁজে যান প্রাণ পণ রেখে,
নিতান্ত গম্ভীর।

ভাবে ও বচনে অজেয় যে তিনি
সন্দেহ কিছু নাই,
গোল এক শুধু ছন্দ নিয়েই
কেমনে যে সামলাই!

কোন ছত্রটি অতি দীর্ঘ যে
কোনটি অতীব হ্রস্ব,
রূপ মেলে নাকো ভাবের সহিত—
কবিতা হয় না অবশ্য।

---

১ তারকা মধ্যস্থ অংশ 'বীরবাণী'-সংগ্রহে 'জীবন্মুক্তের গীতি' নামে পৃথক্‌ভাবে অনূদিত হইয়াছে ; ৭ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

মহাকাব্য না গীতিকাব্য সে
কিম্বা চৌদ্দপদী ?
সেই ভাবনায় খেটে খেটে হায়
হ'ল অজীর্ণব্যাধি ।

যতদিন থাকে ঐ কবি-ব্যাধি
অরুচি খাদ্যে তাঁর,
সে খাদ্য যদি নিরামিষ হয়,
লিয়ন[১] রাঁধুনি যার ।

তবুও চলে না, চলিতে পারে না ;
স্বামীজী ব্যস্ত অদ্য,
সযতনে রাঁধা খানা পড়ে থাক,
লিখিছেন তিনি পদ্য ।

একদিন তিনি সুখাসীন হয়ে
একান্ত ভাবমগ্ন,
সহসা আলোক আসিয়া তাঁহার
চারিপাশে হ'ল লগ্ন ।

'শান্ত ক্ষুদ্র কণ্ঠ' একটি
নাড়া দিল ভাব তাঁর,
শব্দ জ্বলিতে লাগিল যেমন
জ্বলন্ত অঙ্গার ।

সত্যই তারা অঙ্গার যেন
আমার উপরে হায়
বর্ষিত হ'ল, অনুতাপে মরি,
বোনটি যে ক্ষমা চায় ।

---

১ লিয়ন ল্যাণ্ডসবার্গ স্বামীজীর এক শিষ্য ; কিছুদিন স্বামীজীর সঙ্গে এক বাসায় ছিলেন

ভৎর্সনা-ভরা পত্রের তরে
দুঃখের সীমা নাই,
বারবার বলি, ক্ষমা চাই আমি,
চাই, চাই, ক্ষমা চাই !

যে-কটি ছত্র পাঠায়েছ তুমি,
তোমার ভগিনীগণ
নিশ্চয় জেনো স্মরণে রাখিবে
বাঁচিবে যতক্ষণ।

কারণ তাদের দেখায়ে দিয়েছ
অতীব পরিষ্কার—
'যাহা কিছু আছে, সব কিছু তিনি'
ইহাই সত্য সার।

উত্তরে স্বামীজী লিখলেন :

সেই পুরাকালে
গঙ্গার কূলে—ক'রে রামায়ণ গান
বৃদ্ধ কথক বুঝায়ে চলেন
দেবতারা সব—কেমনে আসেন যান
অতি চুপে চুপে
সীতারাম-রূপে
আর, নিরীহ সীতার—চোখের জলেতে বান !

কথা হ'ল শেষ
শ্রোতারা সকলে ঘরে ফিরে চলে
পথে যেতে যেতে মনের মাঝেতে
ভাসিছে কথার রেশ।
তখন জনতা হ'তে
একটি ব্যাকুল উচ্চ কণ্ঠ লাগিল জিজ্ঞাসিতে—

'ঐ যে সীতারাম
কিছুই না বুঝিলাম,
কারা ওঁরা তাই ব'লে দিন আজ, যদি বুঝি কোন মতে।'

তাই মেরী হেল, তোমাকেও বলি—
আমার শেখানো তত্ত্ব না বুঝে, সকলি করিলে মাটি!
আমি তো কখনো বলিনি কাকেও—
'সব ভগবান্'—অর্থ বিহীন অদ্ভুত কথাটি!
এটুকু বলেছি মনে রেখে দিও
ঈশ্বরই 'সৎ', বাকী যা অসৎ—একেবারে কিছু নয়।
পৃথিবী স্বপ্ন, যদিও সত্য ব'লে তা মনেতে হয়!
একটি মাত্র সত্য বুঝেছি জীবন্ত ভগবান্
যথার্থ 'আমি'—তিনি ছাড়া কিছু নয়!
পরিণামশীল এ জড়জগৎ আমি নয়, আমি নয়।
তোমরা সকলে জানিও আমার ভালবাসা অফুরান।

বিবেকানন্দ'

মিস্ মেরী হেল লিখলেন :

বুঝতে পেরেছি অতি সহজেই
তফাতটা কোথা রইল—
তৈল-আধার পাত্রের সাথে
পাত্র-আধার তৈল!
সে তো সোজা অতি—সোজা প্রস্তাব
একটি প্রত্যবায়—
প্রাচ্য যুক্তি বুঝতে সাধ্য
শক্তি নাইকো হায়!
যদি 'ভগবান্ কেবল সত্য
মিথ্যা যা কিছু আর,'
যদি 'পৃথিবীটা স্বপ্ন' তা হ'লে
রইল কি বাকি আর

ভগবান্ ছাড়া ? তাইতো শুধাই
তুমি যে বলেছ দাদা,
'বহু দেখে যারা তাদের মরণ',
এবং বলেছ সাদা—
'একের তত্ত্ব যাহারা বুঝেছে,
মুক্তি তাদের স্থির'—
তবুও আমার সামান্য কথা
বলিতেছি অতি ধীর :
সব কিছু তিনি, এই কথা ছাড়া
আর কিছু নাহি জানি,
আমি যদি থাকি, তাঁহার ভিতরে
আমারো ভিতরে তিনি ।

স্বামীজী উত্তরে লিখলেন :

মেজাজটা খর, বালা অপূর্ব,
প্রকৃতির কিবা খেয়াল মরি !
সুন্দরী নারী, সন্দেহ নেই,
দুর্লভ-আত্মা কুমারী মেরী ।

গভীর আবেগ ঠেলেঠুলে ওঠে
চাপা দিতে তার সাধ্য নাই,
দেখতেই পাই মুক্ত সত্তা
আগ্নেয় তার স্বভাবটাই ।

গানে বাজে তার রাসভ-রাগিণী,
পিয়ানোতে বাজে মধুর রেশ !
ঠাণ্ডা হৃদয়ে সাড়া যে পায় না
মনেতে যাদের বরের বেশ !

শুনেছি ভগিনী তাদের মুখেতে
তোমার রূপের প্রভাব ঘোর!
সাবধানে থেকো, নুয়োনা, প'রোনা
যত মধুর হোক—শিকল ডোর।

শীঘ্র শুনিবে আর এক সুর
চাঁদে-পাওয়া সেই তোমার সাথী ;
তার সাধে বাদ তোমার কথায়,
নিবে যাবে তার জীবন-ভাতি।
এ-কটি পঙ্‌ক্তি ভগিনী মেরী,
প্রত্যুপহার গ্রহণ কর।
'যেমন কর্ম তেমনি তো ফল'—
সন্ন্যাসী জেনো জবাবে দড়।

ইতিহাসের প্রতিশোধ

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আগস্ট মাসের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ অধ্যাপক জে. এইচ. রাইটের অ্যানিস্কুয়াম গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। নিউ ইংলণ্ডের মতো ছোট্ট শান্ত পল্লীতে স্বামীজীর আবির্ভাব এমন এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল যে, তিনি এখানে আসামাত্র এই অপরূপ সুন্দর বিরাট-ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি কোথা থেকে এসেছেন, তাই নিয়ে পল্লীবাসীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে যায়। প্রথমে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করলেন যে, তিনি একজন ভারতীয় ব্রাহ্মণ। কিন্তু ভারতীয় ব্রাহ্মণ সম্পর্কে তাঁদের ধারণার সঙ্গে স্বামীজীর আচার-ব্যবহার কিছুই মিলল না। তখন তাঁকে সঠিক জানবার জন্য এবং তাঁর কথা শোনার জন্য একদিন রাত্রির আহারের পর সকলে অধ্যাপক রাইটের বাড়িতে এসে হাজির হলেন। স্বামীজী তখন মধুর স্বরে বললেন :

'এই সেদিন—মাত্র কয়েকদিন আগেও—চার-শ বছরেরও বেশী হবে না—' হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর বদলে গেল, তিনি বলতে লাগলেন : দুর্গত জাতির উপর তারা কি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও অত্যাচারই না করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের বিচার তাদের ওপর নিশ্চয়ই একদিন নেমে আসবে। ইংরেজ! মাত্র অল্পকাল আগেও এরা ছিল অসভ্য। এদের গায়ে পোকা কিলবিল ক'রত, আর তারা তাদের গায়ের দুর্গন্ধ ঢেকে রাখত নানা সুগন্ধ দিয়ে।...কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! সবেমাত্র বর্বরতার অবস্থা পেরিয়ে আসতে শুরু করেছে। . .

যাদের সমালোচনা তিনি করছিলেন, তাদের মধ্যে একজন শ্রোতা ব'লে উঠলেন, 'এটা একেবারে বাজে কথা। এটা অন্ততঃ পাঁচ-শ বছর আগেকার ব্যাপার।'

আমি কি বলিনি, 'এই কিছুদিন আগেও? মানুষের আত্মার অনন্তত্বের পরিমাপে কয়েক-শ বছর আর কতটুকু?' তারপর গলার স্বর পরিবর্তন ক'রে সম্পূর্ণ শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ স্বরে বললেন : তারা একেবারে অসভ্য। উত্তরাঞ্চলের প্রচণ্ড শীত, অভাব-অনটন এদের বন্য ক'রে তুলেছে। এরা কেবল পরকে হত্যা করার কথাই ভাবে।...কোথায় তাদের ধর্ম? মুখে তারা পবিত্র

ঈশ্বরের নাম নেয়, প্রতিবেশীকে তারা ভালবাসে ব'লে দাবি করে, খ্রীষ্টের নামে তারা পরকে সভ্য করার কথা বলে। কিন্তু এ-সবই মিথ্যা। ঈশ্বর নয়—ক্ষুধাই এদের সভ্য ক'রে তুলেছে। মানুষের প্রতি ভালবাসার কথা কেবল তাদের মুখে, অন্তরে পাপ আর সর্বপ্রকার হিংসা ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা মুখে বলে, 'ভাই, আমি তোমাকে ভালবাসি,' কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গলায় ছুরি চালায়। তাদের হাত রক্তরাঙা।

তারপর তাঁর সুমিষ্ট গলার স্বর গম্ভীর হয়ে এল, তিনি আরও ধীরে বলতে লাগলেন: কিন্তু ঈশ্বরের বিচার একদিন তাদের উপরেও নেমে আসবে। প্রভু বলেছেন, 'প্রতিশোধ নেব আমি, প্রতিফল দেব।' মহাধ্বংস আসছে। এই পৃথিবীতে তোমাদের খ্রীষ্টানেরা সংখ্যায় কত? সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশও নয়। চেয়ে দেখ, লক্ষ লক্ষ চীনাদের দিকে, ঈশ্বরের হাতিয়ার হিসেবে তারাই নেবে এর প্রতিশোধ। তারাই তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। আর একবার চলবে হুন-অভিযান। তারপর একটু মুচকি হেসে বললেন, 'তারা সমগ্র ইওরোপকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, কোন কিছুরই অস্তিত্ব রাখবে না। নারী, পুরুষ, শিশু—সব ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে নেমে আসবে আবার এক অন্ধকার-যুগ।' এ-কথা বলবার সময় তাঁর গলার স্বর এত বিষণ্ণ হয়েছিল যে, তা অবর্ণনীয়। তারপর হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'আমি—আমি কিছুই গ্রাহ্য করি না। এই ধ্বংসস্তূপ থেকে পৃথিবী আরও ভালভাবে গড়ে উঠবে। কিন্তু মহাধ্বংস আসছে। ঈশ্বরের প্রতিশোধ ও অভিশাপ নেমে আসতে আর দেরী নেই।'

তারা সকলেই প্রশ্ন করলেন, 'শীগগিরই কি সেই অভিশাপ নেমে আসবে?'

'এক হাজার বছরের মধ্যে এ ঘটনা ঘটবে।'

বিপদ আসন্ন নয় শুনে তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

স্বামীজী বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বর এ অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবেনই। আপনারা ধর্মের মধ্যে, রাজনীতির মধ্যে হয়তো তা দেখতে পাচ্ছেন না। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর সন্ধান করতে হবে। বারে বারে এমনই ঘটেছে, ভবিষ্যতেও এমনই ঘটবে। আপনারা যদি জনগণকে অত্যাচার ও পীড়ন করেন, তবে তার জন্য আপনাদের দুঃখ ভোগ করতেই হবে। চেয়ে দেখুন না

ভারতের দিকে, কি ক'রে ঈশ্বর আমাদের কাজের প্রতিশোধ নিচ্ছেন। ভারতের ইতিহাসে দেখা যায়, অতীতে যারা ছিল ধনী মানী, তারা ধন-দৌলত বাড়াবার জন্য দরিদ্রকে নিষ্পেষণ করেছে, তাদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করেছে। দুর্গত জনের কান্না তাদের কানে পৌছয়নি। তারা যখন অন্নের জন্য হাহাকার করেছে, তখন ধনীরা তাদের সোনারূপার থালায় অন্নগ্রহণ করেছে। তারপরই ঈশ্বরের প্রতিশোধরূপে এল মুসলমানরা, এদের কেটে কুচি-কুচি করলে। তরবারির জোরে তারা তাদের উপর জয়ী হ'ল। তারপর বহুকাল ও বহু বছর ধরে ভারত বার বার বিজিত হয়েছে এবং সর্বশেষে এসেছে ইংরেজ। যত জাতি ভারতে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হ'ল এই ইংরেজ। ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা?—স্তূপীকৃত ব্র্যাণ্ডির ভাঙা বোতল—আর কিছু নয়। তবুও ঈশ্বর আমাদের দয়া করেননি, কারণ আমরাও অন্যের প্রতি কোন দয়া-মমতা দেখাইনি। আমাদের দেশবাসীরা তাদের নিষ্ঠুরতায় সমগ্র সমাজকে নীচে টেনে এনে নামিয়েছে। তারপর যখন তাদের প্রয়োজন হ'ল জনসাধারণের, তখন জনসাধারণের কোন ক্ষমতা রইল না তাদের সাহায্য করার। ঈশ্বর প্রতিশোধ নেন—মানুষ এ-কথা বিশ্বাস না করলেও ইতিহাসের প্রতিশোধ গ্রহণের অধ্যায়টি সে অবশ্যই অস্বীকার করতে পারবে না। ইতিহাস ইংরেজের কৃত কার্যের প্রতিশোধ নেবেই। আমাদের গ্রামে গ্রামে—দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে, তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে টিপে ধরেছে, আমাদের শেষ রক্তটুকু তারা নিজ-তৃপ্তির জন্য পান ক'রে নিয়েছে, আর আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা তাদের নিজেদের দেশে চালান দিয়েছে। চীনারাই আজ তার প্রতিশোধ নেবে—তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আজ যদি চীনারা জেগে ওঠে ও ইংরেজকে সমুদ্রে ঠেলে ফেলে দেয়, যা তাদের উচিত প্রাপ্য—তা হ'লে সুবিচারই হবে।

তারপর তাঁর সব কথা বলা হ'লে তিনি চুপ ক'রে রইলেন। সমবেত জনগণের মধ্যে তাঁর সম্পর্কে চাপা গুঞ্জরন উঠল, তিনি সব শুনলেন, বাইরে থেকে মনে হ'ল যেন কান দিলেন না। উপরের দিকে চেয়ে আস্তে আস্তে

বলতে লাগলেন, 'শিব! শিব!' ক্ষুদ্র শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি ও ভাববন্যার প্রবাহে চঞ্চল ও অশান্ত হ'য়ে পড়েছিলেন, তাঁদের মনে হয়েছিল এই অদ্ভুত লোকটির শান্ত মনোভাবের অন্তরালে যেন আগ্নেয়-গিরি গলিত লাভাস্রোতের মতো এই ভাবাবেগ ও ভাববন্যা প্রবহমান। সভা ভঙ্গ হ'ল, শ্রোতারা বিক্ষুব্ধ মনে চলে গেলেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ছিল সপ্তাহের শেষের একটি দিন। তিনি কয়েক দিনই এখানে ছিলেন।...এখানে যে-সব আলাপ-আলোচনা হয়েছে, তিনি বরাবরই সেগুলি ছবির মতো নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে সুন্দর সুন্দর গল্প উপাখ্যান দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন।...

এই সুন্দর গল্পটিও স্বামীজী কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন: এক নারী তার স্বামীকে তার দুঃখ-কষ্টের জন্য গালাগালি দিত, অন্যের সাফল্য দেখে তাকে গঞ্জনা করত এবং তার দোষত্রুটিগুলির কথা তাকে সবিস্তারে ব'লত। স্ত্রী ব'লত: ভগবানকে এত বছর সেবা করার পর তোমার ভগবান্ কি তোমার জন্য এই করলেন? এই তার প্রতিদান? স্ত্রীর এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বললেন, 'আমি কি ধর্মের ব্যবসা করি? এই পর্বতটির দিকে তাকিয়ে দেখ। এ আমার জন্য কি করে, আর আমিই বা তার জন্য কি করেছি? কিন্তু তা হলেও আমি এ পর্বতকে ভালবাসি। আমি সুন্দরকে ভালবাসি বলেই একে (হিমালয়কে) ভালবাসি—আমাকে এ ভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আমার প্রকৃতি। ভগবান্‌কে আমি এজন্যই ভালবাসি।'

তারপর স্বামীজী এক রাজার কাহিনী বললেন। এক রাজা জনৈক সাধুকে কিছু দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সাধু তার প্রস্তাব প্রথমে প্রত্যাখ্যান করেন। প্রাসাদে এসে রাজা তাঁর দান গ্রহণের জন্য সাধুকে আবার বিশেষ পীড়াপীড়ি করতে থাকেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু রাজবাড়িতে এসে সাধু দেখলেন, রাজা ধন-সম্পদ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছেন, ভিক্ষা চাইছেন। সাধু কিছুক্ষণ তাঁর এই প্রার্থনা অবাক্ হয়ে শুনলেন, তারপর তাঁর মাদুরটি গুটিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন। রাজা চোখ বুঁজে প্রার্থনা করছিলেন। প্রার্থনার পর চোখ খোলা-

মাত্র দেখলেন যে সাধু চলে যাচ্ছেন। রাজা প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন? আপনি তো আমার দান গ্রহণ করলেন না?' সাধু উত্তরে বললেন, 'আমি ভিক্ষুকের কাছে দান নেবো?'

ধর্মই সকলকে রক্ষা করতে পারে এবং খ্রীষ্টান ধর্মে সকলকে রক্ষা করার শক্তি আছে—কোন ব্যক্তি এরূপ মন্তব্য করলে স্বামীজী তাঁর বড় বড় চোখ দুটি মেলে বললেন, 'খ্রীষ্টান ধর্মে যদি রক্ষা করার শক্তি থাকত, তবে এই ধর্ম কেন ইথিওপিয়া ও আবিসিনিয়ার লোকদের রক্ষা করতে পারল না?'

স্বামীজীর মুখে প্রায়ই এই কথাটি শোনা যেত: কোন সন্ন্যাসীর প্রতি ইংরেজরা এ-রকম ক'রতে সাহস পাবে না। কোন কোন সময়ে তিনি তাঁর আকুল মনের এই ইচ্ছাও প্রকাশ করতেন ও বলতেন, ইংরেজ আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে গুলি ক'রে মেরে ফেলুক। তা হ'লে আমার মৃত্যুই হবে তাদের ধ্বংসের সূত্রপাত। তারপর হাসির ঝিলিক লাগিয়ে বলতেন, 'আমার মৃত্যু-সংবাদ সমগ্র দেশের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে।'

সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসীর রাণীই ছিলেন তাঁর কাছে সবচেয়ে বীর নারী। তিনি রণক্ষেত্রে নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। বিদ্রোহীদের অনেকেই পরে আত্মগোপন করার উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। সাধুদের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর রকমের জেদী মনোভাব দেখা যায়, এই হ'ল তার অন্যতম ইতিহাস। এই বিদ্রোহীদেরই একজন তার চার চারটি সন্তানকে হারিয়েছিল, শান্ত সুস্থির-ভাবে তার সেই হারানো সন্তানদের কথা ব'লত, কিন্তু ঝাঁসীর রাণীর কথা উঠলেই তিনি আর চোখের জল রাখতে পারতেন না, দরদর ধারায় বুক ভেসে যেতো। তিনি বলতেন, 'রাণী তো মানবী নন, দেবী। সৈন্যদল যখন পরাজিত হ'ল, রাণী তখন তলোয়ার নিয়ে পুরুষের মতো যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করলেন। এই সিপাহী বিদ্রোহের অন্য দিকের কাহিনী অদ্ভুত মনে হয়। এর যে অন্য দিক আছে, তা আপনারা ভাবতেই পারবেন না। কোন হিন্দু সিপাহী যে কোন নারীকে হত্যা করতে পারে না, সে-বিষয়ে আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন।

ধর্ম ও বিজ্ঞান

জ্ঞানের একমাত্র উৎস অভিজ্ঞতা। জগতে ধর্মই একমাত্র বিজ্ঞান যাহাতে নিশ্চয়তা নাই, কেন-না অভিজ্ঞতামূলক শাস্ত্রহিসাবে ইহা শিখানো হয় না। এইরূপ উচিত নয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে ধর্মশিক্ষা দেন, এমন কিছু লোক সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের রহস্যবাদী (mystic) বলা হইয়া থাকে, এবং প্রতি ধর্মেই এই রহস্যবাদিগণ একই ভাষায় কথা বলিয়া থাকেন এবং একই সত্য প্রচার করেন। ইহাই প্রকৃত ধর্মবিজ্ঞান। জগতে স্থানভেদে যেরূপ গণিতের (গাণিতিক সত্যের) তারতম্য হয় না, এই রহস্যবাদিগণের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখা যায় না। তাঁহারা একই উপাদানে গঠিত ও সমভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহাদের উপলব্ধি এক, এবং এই উপলব্ধ সত্যই নিয়মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে।

ধর্মসংস্থার তথাকথিত ধার্মিক ব্যক্তিগণ প্রথমে ধর্ম-সম্বন্ধীয় একটি ধর্মমত শিক্ষা করে, পরে সেইগুলি অনুশীলন করে। স্বীয় অভিজ্ঞতাকে তাহারা বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করে না। কিন্তু রহস্যবাদিগণ পরে মতবাদ সৃষ্টি করেন। ধর্মযাজক-প্রচারিত ধর্ম অপরের উপলব্ধি-প্রসূত, রহস্যবাদি-প্রচারিত ধর্ম স্বীয় উপলব্ধি-প্রসূত। যাজকীয় ধর্ম বাহিরকে অবলম্বন করিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হয়, রহস্যবাদীর যাত্রা অন্তর হইতে বাহিরে।

রসায়নশাস্ত্র ও অপরাপর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন জড়বস্তু-কেন্দ্রিক, ধর্মের কেন্দ্র সেরূপ অতীন্দ্রিয় জগতের ব্যাপার। রসায়নশাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করিতে হইলে প্রকৃতি-রাজ্যের গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করিতে হয়। অপরপক্ষে ধর্ম-শিক্ষার গ্রন্থ হইল স্বীয় মন ও হৃদয়। ঋষিগণ প্রায়শঃ জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ, কেন-না জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাঁহারা অন্তর-গ্রন্থরূপ বিপরীত গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া থাকেন। বৈজ্ঞানিকও সেরূপ ধর্মবিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ, কেন-না তিনিও ধর্মবিজ্ঞান-সম্পর্কিত জ্ঞানদানে সম্পূর্ণ অসমর্থ কেবল বাহিরের পুস্তকখানি অধ্যয়ন করিয়া থাকেন।

প্রতি বিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ ধারা (পদ্ধতি) আছে; ধর্মবিজ্ঞান অনুরূপ ধারা-বিশিষ্ট। বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া ইহার ধারাও অনেক।

অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সমজাতীয় নয়। স্বভাবের বিভিন্নতাবশতঃ ধর্মবিজ্ঞান-প্রণালী বিভিন্ন হইবেই। যেমন কোন একটি ইন্দ্রিয়ের প্রখরতা হেতু কাহারও শ্রবণশক্তি প্রখর, কাহারও বা দর্শনশক্তি, সেইরূপ মানস ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্য সম্ভব এবং এই বিশেষ দ্বারপথেই প্রত্যেকে তাহার অন্তর্জগতে উপনীত হয়। তথাপি সকল মনের মধ্যে একটা ঐক্য আছে এবং এমন একটি বিজ্ঞানও আছে, যাহা সকল মনের পক্ষেই প্রযোজ্য হইতে পারে। এই ধর্ম-বিজ্ঞান মানবাত্মার বিশ্লেষণমূলক। ইহার কোন নির্দিষ্ট মতবাদ নাই।

কোন একটি ধর্ম সকলের জন্য নির্দিষ্ট হইতে পারে না। প্রত্যেকটি মানবের ধর্মমত একসূত্রে গ্রথিত এক একটি মুক্তার ন্যায়। সর্বোপরি প্রত্যেকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ আবিষ্কার করা সম্বন্ধে আমাদের যত্নশীল হওয়া উচিত। মানুষ কোন বিশেষ ধর্মমত লইয়া জন্মগ্রহণ করে না; ধর্ম তাহার ভিতরেই রহিয়াছে, যে-কোন ধর্মমত ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিতে চায়, তাহাই পরিণামে ভয়াবহ। প্রত্যেক জীবন এক একটি স্রোত-প্রবাহের ন্যায় এবং সেই স্রোত-প্রবাহই তাহাকে ঈশ্বরের দিকে লইয়া যায়। ঈশ্বরোপলব্ধিই সকল ধর্মের চরম উদ্দেশ্য। ঈশ্বরোপাসনাই সর্বশিক্ষার সার। যদি প্রত্যেক মানব তাহার আদর্শ নির্বাচনপূর্বক নিষ্ঠার সহিত তাহা অনুশীলন করে, তবে ধর্ম-সম্বন্ধীয় মতানৈক্য ঘুচিয়া যাইবে।

উপলব্ধিই ধর্ম

মানুষ এ পর্যন্ত ঈশ্বরকে যত নামে অভিহিত করিয়াছে, তন্মধ্যে 'সত্য'ই সর্বশ্রেষ্ঠ। সত্য উপলব্ধির ফলস্বরূপ; অতএব আত্মার মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান কর। পুস্তক ও প্রতীক সকল দূর করিয়া আত্মাকে তাহার স্ব-স্বরূপ দর্শন করিতে দাও। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'আমরা গ্রন্থরাজির চাপে অভিভূত ও উন্মত্ত হইয়া গিয়াছি।' যাবতীয় দ্বৈতভাবের ঊর্ধ্বে যাও। যে মুহূর্তে তুমি মতবাদ, প্রতীক ও অনুষ্ঠানকে সর্বস্ব মনে করিলে সেই মুহূর্তেই তুমি বন্ধনে পড়িলে; অপরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঐ-সকলের সাহায্য গ্রহণ কর, কিন্তু সাবধান ঐগুলি যেন তোমার বন্ধন না হইয়া পড়ে। ধর্ম এক, কিন্তু

উহার প্রয়োগ বিভিন্ন হইবেই। সুতরাং প্রত্যেকে তাহার মতবাদ প্রচার করুক, কিন্তু কেহ যেন অপর ধর্মের দোষানুসন্ধান না করে। যদি সেই আলোক প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তাহা হইলে সকল প্রকার প্রতীক-চিন্তা হইতে মুক্ত হও। তত্ত্বজ্ঞান-সুধা আকণ্ঠ পান কর। ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়াও যে 'সোঽহম্' উপলব্ধি করে, সেই ব্যক্তিই সুখী। অনন্তের রাজ্যে প্রবেশ কর ও অনন্ত শক্তি লইয়া ফিরিয়া আইস। ক্রীতদাস সত্যের অনুসন্ধানে যায়, এবং মুক্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

স্বার্থ-বিলোপই ধর্ম

বিশ্বের অধিকার-সমূহ কেহ বণ্টন করিতে পারে না। 'অধিকার' শব্দটিই ক্ষমতার সীমা-নির্দেশক। অধিকার 'দায়িত্বে'র নামান্তর। 'অধিকার' নয়, পরন্তু দায়িত্ব। জগতের কোথাও কোন অনিষ্ট সাধিত হইলে আমরা প্রত্যেকে তাহার জন্য দায়ী। কেহই নিজেকে তাহার ভ্রাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। যাহা ভূমার সহিত সংযোগ স্থাপন করে, তাহাই পুণ্য; এবং যাহা উহা হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত করে, তাহাই পাপ। তুমি অনন্তের একটি অংশ, উহাই তোমার স্বরূপ। সেই অর্থে 'তুমি তোমার ভ্রাতার রক্ষক'।

জীবনের প্রথম উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য আনন্দ লাভ; জ্ঞান ও আনন্দ মুক্তির পথে পরিচালিত করে। কিন্তু যে পর্যন্ত না জগতের প্রত্যেকটি প্রাণী—পিপীলিকা বা কুকুর পর্যন্ত মুক্ত না হয়, ততক্ষণ কেহই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। সকলে সুখী না হওয়া পর্যন্ত কেহই সুখী হইতে পারে না। যেহেতু তুমি ও তোমার ভ্রাতা মূলতঃ এক, অন্যকে আঘাত করিলে নিজেকেই আঘাত করা হয়। যিনি সর্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্বভূত প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই প্রকৃত যোগী। আত্মপ্রতিষ্ঠা নয়, আত্মোৎসর্গই বিশ্বের উচ্চতম বিধান।

'অন্যায়ের প্রতিরোধ করিও না'—যীশুর এই উপদেশ কার্যে পরিণত না করাতেই জগতে এত অন্যায় পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র নিঃস্বার্থতাই এই সমস্যার সমাধানে সক্ষম। প্রচণ্ড আত্মোৎসর্গের দ্বারা ধর্ম সাধিত হয়। নিজের জন্য কোন বাসনা রাখিও না। তোমার সকল কর্ম অপরের জন্য অনুষ্ঠিত হউক। এইভাবে জীবন যাপন করিয়া ঈশ্বরে স্বীয় অস্তিত্ব উপলব্ধি কর।

আত্মার মুক্তি

দৃশ্যবস্তুর সংস্পর্শে না আসা পর্যন্ত যেমন আমরা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবহিত হইতে পারি না, সেইরূপ আত্মাকেও তাহার কার্যের ভিতর দিয়া ছাড়া আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ইন্দ্রিয়ানুভূতির নিম্নভূমিতে আত্মাকে আনিতে পারা যায় না। আত্মা স্বয়ং কারণের বিষয়ীভূত না হইয়াও এই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের কারণ। যখন আমরা নিজেদের আত্মা বলিয়া জানিতে পারি, তখনই আমরা মুক্ত হইয়া যাই। আত্মা অপরিণামী। ইহা কদাপি কারণের বিষয় হইতে পারে না, কেন-না ইহা স্বয়ং কারণ। আত্মা স্বয়ম্ভু। আমাদের মধ্যে যদি এমন কোন বস্তুর সন্ধান পাই, যাহা কোন কারণের দ্বারা সাধিত নয়, তখনই বুঝিতে হইবে, আমরা আত্মাকে জানিয়াছি।

অমৃতত্ব ও মুক্তি ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। মুক্ত হইতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মের ঊর্ধ্বে যাইতে হইবে। বিধিনিষেধ ততদিন, যতদিন আমরা অজ্ঞান। জ্ঞানোন্মেষ হইলে আমরা হৃদয়ঙ্গম করি যে, আমাদের অন্তরে অবস্থিত মুক্তির অভিলাষই নিয়ম। ইচ্ছা কখন স্বাধীন হইতে পারে না, কারণ ইহা কার্য-কারণ-সাপেক্ষ। কিন্তু ইচ্ছাশক্তির পশ্চাতে অবস্থিত 'অহং' স্বাধীন, এবং উহাই আত্মা। 'আমি মুক্ত' এই বুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া জীবন গঠন করিতে হইবে ও বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। মুক্তির অর্থ অমৃতত্ব।

বেদান্ত-বিষয়ক বক্তৃতার অনুলিপি

হিন্দুধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ—অনুধ্যান- ও গভীরচিন্তা-মূলক দর্শনশাস্ত্র এবং বেদের বিভিন্ন অংশে নিহিত নৈতিক শিক্ষার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলির মতে এই বিশ্ব অনন্ত ও নিত্যকাল স্থায়ী। ইহার কখন আদি ছিল না, অন্তও হইবে না। এই জড়-জগতে আত্মার চৈতন্য-শক্তির—সীমার রাজ্যে অসীমের শক্তির অসংখ্য প্রকাশ ঘটিয়াছে ; কিন্তু অনন্ত নিজে স্বয়ং বিদ্যমান—শাশ্বত ও অপরিণামী। কালের গতি অনন্তের চক্রের উপর কোন রেখাপাত করিতে পারে না।

মানব-বুদ্ধির অগোচর সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে অতীত বা ভবিষ্যৎ বলিয়া কিছু নাই।

মানবাত্মা অমর—ইহাই বেদের শিক্ষা। দেহ ক্ষয়-বৃদ্ধিরূপ নিয়মের অধীন, কারণ যাহার বৃদ্ধি আছে, তাহা অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু দেহী আত্মা দেহমধ্যে অবস্থিত, অনন্ত ও শাশ্বত জীবনের সহিত যুক্ত। ইহার আদি কখন ছিল না, অন্তও কখন হইবে না। বৈদিক ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হইল এই যে, খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষা দেয়—এই পৃথিবীতে জন্ম-পরিগ্রহই মানবাত্মার আদি, অপরপক্ষে—বৈদিক ধর্ম দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া থাকে, মানবাত্মা অনন্ত সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র এবং পরমেশ্বরের মতোই ইহার কোন আদি নাই। সেই শাশ্বত পূর্ণতা লাভ না করা পর্যন্ত, আধ্যাত্মিক ক্রম-বিকাশের নিয়মানুসারে দেহ হইতে দেহান্তরে—অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে গমনকালে সেই আত্মা বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইবে। অবশেষে, সেই পূর্ণত্ব-প্রাপ্তির পর তাহার আর অবস্থান্তর ঘটিবে না।

বেদ ও উপনিষদ-প্রসঙ্গে

বৈদিক যজ্ঞের বেদী হইতেই জ্যামিতির উদ্ভব হইয়াছিল।

দেবতা বা দিব্যপুরুষদের আরাধনাই ছিল পূজার ভিত্তি। ইহার ভাব এই : যে-দেবতা আরাধিত হন, তিনি সাহায্য প্রাপ্ত হন ও সাহায্য করেন। বেদের স্তোত্রগুলি কেবল স্তুতিবাক্য নয়, পরন্তু যথার্থ মনোভাব লইয়া উচ্চারিত হইলে উহারা শক্তিসম্পন্ন হইয়া দাঁড়ায়।

স্বর্গরাজ্য-সমূহ অবস্থান্তর মাত্র, যেখানে ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও উচ্চতর ক্ষমতা আরও অধিক। পার্থিব দেহের ন্যায় ঊর্ধ্বস্থিত সূক্ষ্ম দেহও পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। ইহজীবনে এবং পরজীবনে সর্বপ্রকার দেহেরই মৃত্যু ঘটিবে। দেবগণও মরণশীল এবং তাঁহারা কেবল ভোগসুখ-প্রদানেই সমর্থ।

দেবগণের পশ্চাতে এক অখণ্ড সত্তা—ঈশ্বর বর্তমান, যেমন এই দেহের পশ্চাতে এক উচ্চতর সত্তা অবস্থিত, যিনি অনুভব ও দর্শন করেন।

বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় বিধানের শক্তি ও সর্বত্রবিদ্যমানতা, সর্বজ্ঞতা এবং সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি গুণাবলী দেবগণেরও নিয়ন্তা একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান।

'অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর ; ঊর্ধ্বলোক-নিবাসী সকলে শ্রবণ কর, সকল সংশয় ও অন্ধকারের পারে আমি এক জ্যোতির দর্শন পাইয়াছি। আমি সেই সনাতন পুরুষকে জানিয়াছি।' উপনিষদের মধ্যে এই পথের নির্দেশ আছে।

পৃথিবীতে আমরা মরণশীল। স্বর্গেও মৃত্যু আছে। ঊর্ধ্বতম স্বর্গলোকেও আমরা মৃত্যুর কবলে পতিত হই। কেবল ঈশ্বরলাভ হইলেই আমরা সত্য ও প্রকৃত জীবন লাভ করিয়া অমরত্ব প্রাপ্ত হই।

উপনিষদ কেবল এই তত্ত্বগুলিরই অনুশীলন করে। উপনিষদ শুদ্ধ পথের প্রদর্শক। উপনিষদে যে-পথের নির্দেশ আছে, তাহাই পবিত্র পন্থা। বেদের বহু আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও স্থানীয় প্রসঙ্গ বর্তমানে বোঝা যায় না। কিন্তু উহাদের মাধ্যমে সত্য পরিস্ফুট হয়। সত্যের আলোক-প্রাপ্তির জন্য স্বর্গ ও মর্ত্য ত্যাগ করিতে হয়।

উপনিষদ ঘোষণা করিতেছেন :

সেই ব্রহ্ম সমগ্র জগতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। এই জগৎ-প্রপঞ্চ তাঁহারই। তিনি সর্বব্যাপী, অদ্বিতীয়, অশরীরী, অপাপবিদ্ধ, বিশ্বের মহান্ কবি, শুদ্ধ, সর্বদর্শী; সূর্য ও তারকাগণ যাঁহার ছন্দ—তিনি সকলকে যথানুরূপ কর্মফল প্রদান করিয়া থাকেন।

যাঁহারা কর্মানুষ্ঠানের দ্বারাই জ্ঞানের আলোক লাভ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাঁহারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন; এবং যাঁহারা মনে করেন, এই জগৎ-প্রপঞ্চই সর্বস্ব, তাঁহারা অন্ধকারে রহিয়াছেন। এই-সকল ভাবনার দ্বারা যাঁহারা প্রকৃতির বাহিরে যাইতে অভিলাষ করেন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন।

তবে কি কর্মানুষ্ঠান মন্দ? না, যাহারা প্রবর্তক মাত্র, তাহারা এই-সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা উপকৃত হইবে।

একটি উপনিষদে কিশোর নচিকেতা কর্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে: মানুষের মরণ হইলে কেহ বলে, তিনি থাকেন না; কেহ কেহ বলেন, তিনি থাকেন। আপনি যম, মৃত্যু স্বয়ং—এই সত্য অবগত আছেন; আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। যম উত্তর করিলেন, 'মানুষ তো দূরের কথা, দেবতাগণের মধ্যেও অনেকে ইহা জ্ঞাত নন। হে বালক, তুমি আমাকে ইহার উত্তর জিজ্ঞাসা করিও না।' কিন্তু নচিকেতা স্বীয় প্রশ্নে অবিচলিত রহিলেন। যম পুনরায় বলিলেন, 'দেবতাগণের ভোগ্যবিষয়সকল আমি তোমাকে প্রদান করিব। ঐ প্রশ্ন-বিষয়ে আমাকে আর উপরোধ করিও না।' কিন্তু নচিকেতা পর্বতের ন্যায় অটল রহিলেন। অতঃপর মৃত্যুদেবতা বলিলেন, 'বৎস, তুমি তৃতীয়বারেও সম্পদ্, শক্তি, দীর্ঘজীবন, যশ, পরিবার সকলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছ। চরম সত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার মতো যথেষ্ট সাহস তোমার আছে। আমি তোমাকে এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিব। দুইটি পথ আছে—একটি শ্রেয়ের, অপরটি প্রেয়ের। তুমি প্রথমটি নির্বাচন করিয়াছ।'

এখানে সত্যবস্তু-প্রদানের শর্তগুলি লক্ষ্য কর। প্রথম হইল পবিত্রতা—একটি অপাপবিদ্ধ নির্মলচিত্ত বালক বিশ্বের রহস্য জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কোন পুরস্কার বা প্রতিদানের আশা না রাখিয়া কেবল সত্যের জন্যই সত্যকে গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি স্বয়ং আত্ম-

সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সত্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন—এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে সত্য সম্বন্ধে উপদেশ না আসিলে উহা ফলপ্রদ হয় না। গ্রন্থ উহা দান করিতে পারে না, তর্কবিচারে উহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। যিনি সত্যের রহস্য অবগত, তাঁহার নিকটই সত্য উদ্ঘাটিত হয়।

সত্যলাভ করিবার পর শান্ত হও। বৃথা তর্কে উত্তেজিত হইও না। আত্মসাক্ষাৎকারে লাগিয়া যাও। তুমিই সত্যলাভ করিতে সমর্থ।

ইহা সুখ নয়, দুঃখ নয়; পাপ নয়, পুণ্যও নয়; জ্ঞান নয়, অজ্ঞানও নয়। তোমাদিগকে উহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কিরূপে আমি তোমাদিগের নিকট ইহার বিষয় ব্যাখ্যা করিব?

যিনি অন্তর হইতে কাঁদিয়া বলেন, প্রভু, আমি একমাত্র তোমাকেই চাই—প্রভু তাঁহারই নিকট নিজেকে প্রকাশ করেন। পবিত্র হও, শান্ত হও; অশান্ত চিত্তে ঈশ্বর প্রতিফলিত হন না।

'বেদ যাঁহাকে ঘোষণা করে, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আমরা প্রার্থনা ও যজ্ঞ করিয়া থাকি, ওম্ (ওঁ) সেই অব্যক্ত পুরুষের পবিত্র নামস্বরূপ।' এই ওঙ্কার সমুদয় শব্দের মধ্যে পবিত্রতম। যিনি এই শব্দের রহস্য অবগত, তিনি প্রার্থিত বস্তু লাভ করেন। এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যে-কেহ এই শব্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার নিকট পথ উদ্ঘাটিত হয়।

জ্ঞানযোগ

প্রথমতঃ ধ্যান নেতিমূলক হইবে। সর্ব বিষয় চিন্তা কর—যাহা মনে আসে, তাহাই চিন্তা কর, কেবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে মনের মধ্যে যাহাই আসুক, তাহার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ কর।

অতঃপর দৃঢ়তার সহিত আমাদের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তৎসম্বন্ধে চিন্তা কর—সৎ, চিৎ, আনন্দ—সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং প্রেমস্বরূপ।

ধ্যানের মধ্য দিয়াই (বিষয়ী ও বিষয়) কর্তা ও কর্মের ঐক্যানুভব হইয়া থাকে। ধ্যান কর:

ঊর্ধ্ব আমা-দ্বারা পরিপূর্ণ; অধঃ আমাতে পরিপূর্ণ; মধ্য আমাতে

পরিপূর্ণ। আমি সর্বভূতে এবং সর্বভূত আমাতে বিরাজিত। ওম্ তৎ সৎ, আমিই সেই। আমি মনের উর্ধ্বে সৎস্বরূপ। আমি বিশ্বের একমাত্র আত্মা-স্বরূপ। আমি সুখ নই, দুঃখ নই।

দেহই পান করে, আহার করে ইত্যাদি। আমি দেহ নই, মন নই। সোঽহম্।

আমি সাক্ষি-স্বরূপ, আমি দ্রষ্টা। যখন দেহ সুস্থ থাকে, আমি সাক্ষী; যখন রোগ আক্রমণ করে, তখনও আমি সাক্ষি-স্বরূপ বর্তমান।

আমি সচ্চিদানন্দ। আমিই সার পদার্থ, জ্ঞানামৃত-স্বরূপ। অনন্তকালে আমার পরিবর্তন নাই। আমি শান্ত, দীপ্যমান, পরিবর্তন-রহিত।

সত্য এবং ছায়া

দেশ, কাল ও নিমিত্ত এক বস্তু হইতে অপর বস্তুর পার্থক্য নির্ণয় করে। পার্থক্য আকারেই বিদ্যমান, বস্তুতে নয়। রূপ (আকার) বিনষ্ট হইলে উহা চিরতরে লোপ পায়; কিন্তু বস্তু একরূপই থাকে। বস্তুকে কখনও ধ্বংস করিতে পার না। প্রকৃতির মধ্যেই ক্রম-বিবর্তন, আত্মায় নয়—প্রকৃতির ক্রমবিবর্তন, আত্মার প্রকাশ।

সাধারণতঃ যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে, মায়া সেরূপ ভ্রম নয়। মায়া সৎ, আবার সৎ নয়। মায়া সৎ, কারণ উহার পশ্চাতে প্রকৃত সত্তা বিদ্যমান, উহাই মায়াকে প্রকৃত সত্তার আভাস প্রদান করে। মায়ার মধ্যে যাহা সৎ, তাহা হইল মায়ার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান প্রকৃত সত্তা। তথাপি ঐ প্রকৃত সত্তা কখনও দৃষ্ট হয় না; সুতরাং যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অসৎ, এবং উহার প্রকৃত স্বতন্ত্র সত্তা নাই, প্রকৃত সত্তার উপরেই উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে।

অতএব মায়া হইল কূটাভাস—সৎ অথচ সৎ নয়, ভ্রম অথচ ভ্রম নয়। যিনি প্রকৃত সত্তাকে (সৎস্বরূপকে) জানিয়াছেন, তিনি মায়াকে ভ্রম বলিয়া দেখেন না, সত্য বলিয়াই দেখেন। যিনি সৎস্বরূপ জ্ঞাত নন, তাঁহার নিকট মায়া ভ্রম এবং উহাকেই তিনি সত্য বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন।

জীবন-মৃত্যুর বিধান

প্রকৃতির অন্তর্গত সমুদয় বস্তু নিয়ম অনুযায়ী কর্ম করিয়া থাকে। কিছুই ইহার ব্যতিক্রম নয়। মন ও বহিঃপ্রকৃতির সমুদয় বস্তু নিয়ম দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

আন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি, মন ও জড়বস্তু, কাল ও দেশের মধ্যে অবস্থিত এবং কার্য-কারণ সম্বন্ধ দ্বারা বদ্ধ।

মনের মুক্তি ভ্রমমাত্র। যে মন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত, তাহার মুক্তি কিরূপে সম্ভব? কর্মবাদই কার্য-কারণবাদ।

আমাদিগকে মুক্ত হইতেই হইবে। আমরা মুক্তই আছি; আমরা যে মুক্ত—উহা জানিতে পারাই প্রকৃত কাজ। সর্বপ্রকার দাসত্ব ও সর্বপ্রকার বন্ধন পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমাদিগকে যে কেবল সর্বপ্রকার পার্থিব বন্ধন এবং জগদন্তর্গত সর্বপ্রকার বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি বন্ধন ত্যাগ করিতে হইবে—তাহা নয়, পরন্তু স্বর্গ ও সুখ সম্বন্ধে সর্বপ্রকার কল্পনা ত্যাগ করিতে হইবে।

বাসনার দ্বারা আমরা পৃথিবীতে বদ্ধ, আবার ঈশ্বর স্বর্গ দেবদূতের নিকটও বদ্ধ। ক্রীতদাস ক্রীতদাসই, মানব ঈশ্বর অথবা দেবদূত—যাহারই ক্রীতদাস সে হউক না কেন। স্বর্গের কল্পনা পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সজ্জন ব্যক্তি মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়া অনন্ত সুখময় জীবন-যাপন করে—এই ধারণা বৃথা স্বপ্নমাত্র। ইহার বিন্দুমাত্র অর্থ বা যৌক্তিকতা নাই। যেখানে সুখ, সেখানে কোন না কোন সময় দুঃখ আসিবেই। যেখানে আনন্দ, সেখানে বেদনা নিশ্চিত। ইহা সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, যেভাবে হউক প্রত্যেক ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া থাকিবেই।

স্বাধীনতার আদর্শই হইতেছে মোক্ষলাভের প্রকৃত আদর্শ। তাহা ইন্দ্রিয়ের সর্বপ্রকার দ্বন্দ্ব আনন্দ বা বেদনা, ভাল বা মন্দ, যাবতীয় বিষয় হইতে মুক্তি।

ইহা হইতেও অধিক—আমাদিগকে মৃত্যুর কবল হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে; এবং মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হইতে হইবে। জীবন মৃত্যুরই ছায়া মাত্র। জীবন থাকিলেই মৃত্যু থাকিবে; সুতরাং মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে হইলে জীবন হইতেও মুক্ত হও।

আমরা চিরকালই মুক্ত, কেবল আমাদিগকে উহা বিশ্বাস করিতে হইবে, যথেষ্ট বিশ্বাস থাকা চাই। তুমি অনন্ত মুক্ত আত্মা, চিরমুক্ত—চিরধন্য। যথেষ্ট বিশ্বাস রাখো—মুহূর্ত মধ্যে তুমি মুক্ত হইয়া যাইবে।

দেশ কাল ও নিমিত্তের অন্তর্গত সমুদয় বস্তু বদ্ধ। আত্মা সর্বপ্রকার দেশ কাল ও নিমিত্তের বাহিরে। যাহা বদ্ধ, তাহাই প্রকৃতি,—আত্মা নয়।

অতএব তোমার মুক্তি ঘোষণা কর, এবং তুমি প্রকৃত যাহা, তাহাই হও—চিরমুক্ত, চির-ভাগ্যবান্।

দেশ কাল ও নিমিত্তকেই আমরা মায়া বলিয়া থাকি।

আত্মা ও ঈশ্বর

যাহা কিছু স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে, তাহারই রূপ আছে। স্থান (দেশ) নিজেই রূপ বা আকার ধারণ করে। হয় তুমি স্থানের (দেশের) মধ্যে অবস্থিত, নতুবা স্থান তোমাতে অবস্থিত। আত্মা সর্বপ্রকার দেশের অতীত। দেশ আত্মায় অবস্থিত, আত্মা দেশে অবস্থিত নয়।

আকার বা রূপ কাল ও দেশের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কার্য-কারণের দ্বারা আবদ্ধ। সমুদয় কাল আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আমরা কালের মধ্যে অবস্থিত নই। যেহেতু আত্মা স্থান ও কালের মধ্যে অবস্থিত নন, সমুদয় কাল ও দেশ আত্মায় অবস্থিত; অতএব আত্মা সর্বব্যাপী।

ঈশ্বর-সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আমাদের নিজ নিজ চিন্তার প্রতিচ্ছবি।

প্রাচীন ফারসী এবং সংস্কৃতের মধ্যে মিল আছে।

প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সহিত ঈশ্বরের অভেদ-কল্পনা অর্থাৎ প্রকৃতি-পূজাই ছিল ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রাচীন যুগের ধারণা। পরবর্তী ধাপ হইল জাতীয় দেবতা। রাজাকে ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করা হইল পরবর্তী ক্রম।

এই ধারণা ভারতবর্ষে ব্যতীত সকল জাতির মধ্যেই প্রবল, ঈশ্বর স্বর্গে অবস্থান করেন—ঐ ধারণা অত্যন্ত অপরিণত।

অবিচ্ছিন্ন জীবনের কল্পনা হাস্যজনক। যে পর্যন্ত আমরা জীবন হইতে মুক্তিলাভ না করি, সে পর্যন্ত মৃত্যু হইতেও মুক্তি নাই।

চরম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য

দ্বৈতবাদীর মতে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি চিরকাল পৃথক্। বিশ্ব ও প্রকৃতি অনন্তকাল ধরিয়া ঈশ্বরাধীন।

চরম অদ্বৈতবাদিগণ এইরূপ তারতম্য করেন না। সর্বশেষ বিচারে তাঁহারা দাবি করিয়া থাকেন—সমুদয় ব্রহ্ম, বিশ্বপ্রপঞ্চ ঈশ্বরে লয়প্রাপ্ত হয়; ঈশ্বর এই বিশ্বের অনন্ত জীবন স্বরূপ।

তাঁহাদের মতে অসীম ও সসীম—কেবল শব্দমাত্র। পার্থক্য-নির্ণয়ের দ্বারাই বিশ্বজগৎ, প্রকৃতি প্রভৃতি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। প্রকৃতি স্বয়ং বিভিন্নতার স্বরূপ।

'ঈশ্বর এই বিশ্ব সৃষ্টি করিলেন কেন?' 'যিনি স্বয়ং পূর্ণ, তিনি এই অপূর্ণ সৃষ্টি করিলেন কেন?' ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না, কারণ এই ধরনের প্রশ্নগুলি তর্কশাস্ত্রানুসারে অযৌক্তিক। যুক্তির স্থান প্রকৃতির এলাকার মধ্যে; প্রকৃতির উর্ধ্বে উহার কোন অস্তিত্ব নাই। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্, সুতরাং 'কেন তিনি এইরূপ করিলেন, কেন তিনি ঐরূপ করিলেন?' ইত্যাদি প্রশ্ন করিলে তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা হয়। যদি তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকে, তবে উহা নিশ্চয় কোন লক্ষ্যপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ এবং উহার অর্থ এই যে, উপায় ব্যতিরেকে তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারিত না। সুতরাং 'কেন? ও কোথা হইতে?'—ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সেই বস্তুর সম্বন্ধেই উঠিতে পারে, যাহার অস্তিত্ব অপর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে।

ধর্মের প্রমাণ-প্রসঙ্গে

ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন হইল : কি কারণে ধর্ম এত অবৈজ্ঞানিক ? ধর্ম যদি একটি বিজ্ঞান, তবে অপরাপর বিজ্ঞানের ন্যায় উহার সত্যতা অবধারিত নয় কেন ? ঈশ্বর, স্বর্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে সমুদয় ধারণা অনুমান ও বিশ্বাস মাত্র। ইহার সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, মনে হয়। ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। মন সর্বদা পরিবর্তনশীল প্রবাহ-স্বরূপ !

মানব কি আত্মা, এক অপরিবর্তনীয় সত্তা (পদার্থ) অথবা নিত্য পরিবর্তনশীলতার সমষ্টি-মাত্র ? প্রাচীন বৌদ্ধধর্ম ব্যতীত সমুদয় ধর্ম বিশ্বাস করে যে, মানুষ আত্মা, এক অভিন্ন সত্তা, এক, অদ্বিতীয়—যাহার মৃত্যু নাই, অবিনশ্বর।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে, মানুষ নিত্য পরিবর্তনশীলতার সমষ্টিমাত্র, এবং অসংখ্য দ্রুত অবস্থান্তরের প্রায় অনন্ত পারম্পর্যের মধ্যেই তাহার চৈতন্য নিহিত। প্রত্যেকটি পরিবর্তন যেন অপর পরিবর্তনগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় একক অবস্থান করিতেছে এবং এইভাবে কার্যকারণ-বাদ ও পরিণাম-বাদ রহিত করিয়া থাকে।

যদি অদ্বিতীয় 'সমগ্র' বলিয়া কিছু থাকে, তবে বস্তুও (সত্তা) আছে। অখণ্ড সর্বদাই মৌলিক। মৌলিক কোন পদার্থের সংমিশ্রণ নয়। অন্য কোন পদার্থের উপর উহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। উহা একাকী বিরাজমান ও অবিনশ্বর।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন যে, সমুদয় বস্তু পরস্পর বিচ্ছিন্ন ; অখণ্ড বলিয়া কিছু নাই ; এবং মানব একটি পূর্ণ বা অখণ্ড—এই মতবাদ কেবল বিশ্বাসমাত্র, উহা প্রমাণ করা যাইতে পারে না।

এখন প্রধান প্রশ্ন হইল : মানুষ কি এক পূর্ণ অথবা নিত্য পরিবর্তনশীলতার স্তূপমাত্র ? এই প্রশ্নের উত্তর দিবার—প্রমাণ করিবার একটি মাত্র উপায় আছে। মনের চাঞ্চল্য রুদ্ধ কর, দেখিবে মানুষ যে পূর্ণ, মৌলিক বা অবিমিশ্র, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে। সমুদয় পরিবর্তন আমার মধ্যে—চিত্তে বা মনরূপ পদার্থে, আমি পরিবর্তনসমূহ নই। যদি তাহা হইতাম, তবে পরিবর্তনসমূহ বোধ করিতে পারিতাম না।

প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের ও অপরের মধ্যে এই বিশ্বাস উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে যে, জগতের সবই অতি সুন্দর, এবং সে সম্পূর্ণ সুখী। কিন্তু

যখন সে স্থির হইয়া জীবনের উদ্দেশ্য কি তাহা অনুসন্ধান করে, তখন উপলব্ধি করে, সে যে ইহার এবং উহার পশ্চাতে ছুটিয়া চলিয়াছে—নানা বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে, তাহার কারণ উহা না করিয়া উপায় নাই। তাহাকে অগ্রসর হইতেই হইবে। সে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সুতরাং সে নিজেকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করে যে, সত্য সত্যই তাহার নানা বস্তুর প্রয়োজন আছে। যে ব্যক্তি নিজেকে যথার্থভাবে বুঝাইতে সমর্থ হয় যে, তাহার সময় খুব ভাল যাইতেছে, বুঝিতে হইবে—তাহার শারীরিক স্বাস্থ্য অতি উত্তম। ঐ ব্যক্তি কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাসনা চরিতার্থ করে। তাহার ভিতরে যে শক্তি রহিয়াছে, তাহার বশেই সে কার্য করিয়া থাকে। ঐ শক্তি তাহাকে বলপূর্বক কার্যে প্রবৃত্ত করে এবং দেখায় যেন সে ঐরূপ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল বলিয়াই করিয়াছে। কিন্তু যখন সে প্রকৃতির নিকট হইতে প্রচণ্ড বাধা প্রাপ্ত হয়, যখন বহু আঘাত সহ্য করিতে হয়, তখন তাহার মনে প্রশ্ন জাগে, এ-সকলের অর্থ কি? যত অধিক সে আঘাত লাভ করে ও চিন্তা করে, ততই সে দেখে যে, তাহার আয়ত্তের বাহিরে এক শক্তির দ্বারা সে ক্রমাগত চালিত হইতেছে এবং সে কার্য করিয়া থাকে, তাহার কারণ—তাহাকে করিতেই হইবে। অতঃপর সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং তখনই সংগ্রাম সুরু হয়।

এখন যদি এই-সকল উৎপাত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় থাকে, তবে তাহা আমাদের অন্তরেই অবস্থিত। আমরা সর্বদাই প্রকৃত সত্তা কি, তাহা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছি। সহজাত সংস্কার-বশেই উহা করিয়া থাকি। জীবাত্মার অন্তর্গত সৃষ্টিই ঈশ্বরকে আবৃত করিয়া থাকে; আর এই কারণেই ঈশ্বরের আদর্শ-সম্বন্ধে এত প্রভেদ বিদ্যমান। সৃষ্টির বিরাম ঘটিলেই আমরা নির্বিশেষ সত্তাকে জানিতে পারি। নির্বিশেষ পূর্ণ বা অসীম সত্তা আত্মাতেই বিদ্যমান, সৃষ্টির মধ্যে নয়। সুতরাং সৃষ্টির অবসান ঘটিলেই আমরা পূর্ণকে জানিতে পারি। নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে আমরা শরীর সম্বন্ধেই চিন্তা করিয়া থাকি; এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে চিন্তা করিতে গেলে তাঁহাকে দেহধারিরূপেই চিন্তা করিয়া থাকি। যাহাতে আত্মার প্রকাশ ঘটে, সেজন্য মনের চাঞ্চল্য দমন করাই প্রকৃত কাজ। শিক্ষার আরম্ভ শরীরে। প্রাণায়াম শরীরকে শিক্ষিত করিয়া সৌষ্ঠব দান করে। প্রাণায়াম-অভ্যাসের

উদ্দেশ্য ধ্যান ও একাগ্রতা-লাভ। যদি মুহূর্তের জন্য তুমি সম্পূর্ণ স্থির বা নিশ্চল হইতে পারো, তবে লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছ—বুঝিতে হইবে। মন উহার পরেও কাজ করিয়া যাইতে পারে; কিন্তু পূর্বে মন যে অবস্থায় ছিল, তাহা আর পাইবে না। তুমি নিজকে জানিতে পারিবে, তোমার প্রকৃত স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিবে। এক মুহূর্তের জন্য মন স্থির কর, তোমার যথার্থ স্বরূপ সহসা উদ্ভাসিত হইবে এবং বুঝিবে মুক্তি আসন্ন; আর কোন বন্ধন থাকিবে না। তত্ত্বটি এইরূপ—যদি তুমি সময়ের এক মুহূর্ত অনুধাবন করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে সমগ্র সময় বা কাল জানিতে পারিবে, যেহেতু একেরই দ্রুত অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য হইল 'সমগ্র'। এক-কে আয়ত্ত কর, এক মুহূর্তকে সম্পূর্ণভাবে জানো—মুক্তি লাভ হইবেই।

প্রাচীন বৌদ্ধগণ ব্যতীত সকল ধর্ম ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাসী। আধুনিক বৌদ্ধগণ ঈশ্বর ও আত্মায় বিশ্বাস করেন। ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণ প্রাচীন বৌদ্ধগণের পর্যায়ে পড়েন।

আর্নল্ডের 'লাইট অব্ এশিয়া' পুস্তকে বৌদ্ধবাদ অপেক্ষা বেদান্তবাদই অধিক প্রদর্শিত।

উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদ

প্রকৃতির সুশৃঙ্খল বিধি-ব্যবস্থা বিশ্বস্রষ্টার এক অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতেছে, এই ধারণা 'কিণ্ডারগার্টেন' শিক্ষাপদ্ধতি হিসাবে উত্তম। যেহেতু ঐ ধারণা ধর্মজগতে যাহারা শিশু তাহাদিগকে ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় দার্শনিক তত্ত্বে পরিচালিত করিবার জন্য ঈশ্বরের সৌন্দর্য, শক্তি ও মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এই ধারণা বা মতবাদের কোন উপকারিতা নাই, এবং উহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্ বলিয়া স্বীকার করিলে দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্য দিয়া প্রকৃতি যদি ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে সৃষ্টির মূলে কোন অভিপ্রায় বা পরিকল্পনা আছে, এই তত্ত্ব তাহার ত্রুটিও প্রদর্শন করে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান্ হইলে কোন কার্যের জন্য তাঁহার

পরিকল্পনা বা মতলবের প্রয়োজন হয় না। তাঁহার ইচ্ছামাত্রেই উহা সম্পন্ন হয়। সুতরাং প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের কোন বিতর্ক, কোন উদ্দেশ্য বা কোন পরিকল্পনা নাই।

মানুষের সীমাবদ্ধ চৈতন্যের পরিণাম হইতেছে জড়-জগৎ। মানুষ যখন তাহার দেবত্ব অবগত হয়, তখন সমুদয় জড়বস্তু বা প্রকৃতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ঐরূপেই জগৎ আমাদের নিকট প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

কোন উদ্দেশ্য-সাধনের প্রয়োজনরূপে এই জড়-জগতের স্থান সেই সর্বব্যাপী ঈশ্বরে নাই। যদি তাহা থাকিত, তবে ঈশ্বর বিশ্ব দ্বারা সীমাবদ্ধ হইতেন। ঈশ্বরের অনুজ্ঞাক্রমে এই জগৎ বিদ্যমান, এ-কথা বলার অর্থ ইহা নয় যে, মানুষকে পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন কারণবশতঃ বা ঈশ্বরের প্রয়োজনের নিমিত্ত এই জগৎ বিদ্যমান।

মানুষের প্রয়োজনেই জগতের সৃষ্টি, ঈশ্বরের প্রয়োজনে নয়। বিশ্ব-পরিকল্পনায় ঈশ্বরের কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান্ হইলে ঐরূপ কোন উদ্দেশ্য কিরূপে থাকিতে পারে? কোন কার্য-সাধনের জন্য তাঁহার কোন পরিকল্পনা, মতলব বা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হইবে কেন? তাঁহার কোন প্রয়োজন আছে, ইহা বলার অর্থ তাঁহাকে সীমাবদ্ধ করা ও তাঁহার সর্বশক্তিমত্তারূপ গুণ হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত করা।

উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, কোন প্রশস্ত নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলে—নদীটি এত চওড়া যে, সেতু-নির্মাণ ব্যতীত ঐ নদী উত্তীর্ণ হওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। নদী উত্তীর্ণ হইবার জন্য সেতু-নির্মাণের প্রয়োজন, এই ঘটনার দ্বারা সেতু নির্মাণ করিবার সামর্থ্য তোমার শক্তির পরিচয় প্রদান করিলেও উহা দ্বারাই তোমার সীমাবদ্ধ শক্তি ও অকিঞ্চিৎকরতা প্রকাশ পাইবে। তোমার ক্ষমতা যদি সীমাবদ্ধ না হইত, যদি তুমি উড়িয়া অথবা নদীতে ঝাঁপ দিয়া নদী অতিক্রম করিতে পারিতে, তবে তোমাকে সেতু নির্মাণ-রূপ প্রয়োজনীয়তার বশবর্তী হইতে হইত না। সেতু-নির্মাণ দ্বারা তোমার মধ্যে সেতু-নির্মাণের শক্তি রহিয়াছে, ইহা প্রদর্শিত হইলেও উহা দ্বারাই তোমার অপূর্ণতা প্রদর্শিত হইল। অন্য কিছু অপেক্ষা তোমার ক্ষুদ্রতাই অধিক প্রকাশ পাইল।

অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ মুখ্যতঃ এক। ভেদ শুধু প্রকাশে। দ্বৈতবাদিগণ যেমন পিতা ও পুত্র 'দুই' বলিয়া গ্রহণ করেন, অদ্বৈতবাদিগণ তেমন উভয়কে প্রকৃতপক্ষে 'এক' বলিয়া মনে করেন। দ্বৈতবাদের অবস্থান প্রকৃতির মধ্যে, বিকাশের মধ্যে এবং অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা বিশুদ্ধ আত্মার স্বরূপে।

প্রত্যেক ধর্মেই ত্যাগ ও সেবার আদর্শ ঈশ্বরের নিকট উপনীত হইবার উপায়স্বরূপ।

চৈতন্য ও প্রকৃতি

চৈতন্যকে চৈতন্যরূপে প্রত্যক্ষ করাই ধর্ম, জড়রূপে দেখা নয়।

ধর্ম হইতেছে বিকাশ। প্রত্যেককে উহা নিজে উপলব্ধি করিতে হইবে। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস, মানবের পরিত্রাণের নিমিত্ত যীশুখ্রীষ্ট প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তোমাদের নিকট উহা একটি বিশিষ্ট মতবাদের উপর বিশ্বাস, এবং এই ধর্মবিশ্বাসই তোমাদের মুক্তি দেয়, আমাদের নিকট মুক্তির সহিত বিশিষ্ট মতবাদের কোন প্রকার সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকেরই স্বীয় মনোমত কোন মতবাদে বিশ্বাস থাকিতে পারে; অথবা সে কোন মতবাদে বিশ্বাস না করিতেও পারে। যীশুখ্রীষ্ট কোন এক সময়ে ছিলেন, অথবা তিনি কোন দিন ছিলেন না, তোমার নিকট এই উভয়ের পার্থক্য কি? জ্বলন্ত ঝোপের (burning bush) মধ্যে মুশার ঈশ্বর-দর্শনের সহিত তোমার কি সম্পর্ক? মুশা জ্বলন্ত ঝোপে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছিলেন, এই তত্ত্বের দ্বারা তোমার ঈশ্বর-দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই যদি হয়, তবে মুশা যে আহার করিয়াছিলেন, ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট; তোমার আহার-গ্রহণে নিবৃত্ত হওয়া উচিত। একটি অপরটির মতই সমভাবে যুক্তিযুক্ত। আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন মহাপুরুষগণের বিবরণসমূহ আমাদিগকে তাঁহাদের পথে অগ্রসর হইতে ও স্বয়ং ধর্ম উপলব্ধি করিতে প্রণোদিত করে, ইহা ব্যতীত অপর কোন কল্যাণ সাধন করে না। যীশুখ্রীষ্ট, মুশা বা অপর কেহ যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করা ব্যতীত আর কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির একটি বিশেষ স্বভাব আছে, উহা তাহার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। ঐ বৈশিষ্ট্য অনুসরণের দ্বারাই সে তাহার মুক্তির পথ প্রাপ্ত হয়। তোমার গুরুই তোমাকে বলিয়া দিবেন, তোমার নির্দিষ্ট পথ কোন্‌টি এবং সেই পথে তোমাকে পরিচালিত করিবেন। তোমার মুখ দেখিয়া তিনি বলিয়া দিবেন, তুমি কোন্ অবস্থায় ও কিরূপ সাধনার অধিকারী এবং ঐ বিষয়ে তোমাকে নির্দেশ দিবার ক্ষমতাও তাঁহার থাকিবে। অপরের পথ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করা উচিত নয়, কেন না উহা তাহার জন্যই নির্দিষ্ট, তোমার জন্য নয়। নির্দিষ্ট পথ পাইলে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা ব্যতীত আর কিছুই করিবার নাই, স্রোতই তোমাকে মুক্তির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। অতএব যখন সেই নির্ধারিত পথ পাইবে, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইও না। তোমার পন্থা তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ, কিন্তু উহা যে অপরের পক্ষেও শ্রেয়ঃ হইবে, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রকৃত আধ্যাত্মিক-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চৈতন্যকে চৈতন্যরূপেই প্রত্যক্ষ করেন, জড়রূপে নয়। চৈতন্যই প্রকৃতিকে গতিশীল করে, চৈতন্যই প্রকৃত বস্তু। ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রকৃতির মধ্যেই বিদ্যমান, চৈতন্যে নয়। চৈতন্য সর্বদা এক, অপরিণামী ও শাশ্বত। চৈতন্য ও জড় প্রকৃতপক্ষে এক, কিন্তু চৈতন্য স্ব-স্বরূপে কখনই জড় নয়। জড়ও কখন জড়সত্তা-রূপে চৈতন্য হইতে পারে না। আত্মা কখনও ক্রিয়া করেন না। কেনই বা করিবেন? আত্মা বিদ্যমান—ইহাই যথেষ্ট। আত্মা শুদ্ধ, সৎ ও নিরবচ্ছিন্ন। আত্মায় ক্রিয়ার কোন আবশ্যকতা নাই।

নিয়ম দ্বারা তুমি বদ্ধ নও। উহা তোমার স্বভাবের অন্তর্গত। মন প্রকৃতির অন্তর্গত ও নিয়মাধীন। সমগ্র প্রকৃতি স্বীয় কর্মজনিত নিয়মের অধীন এবং এই নিয়ম অলঙ্ঘনীয়। প্রকৃতির একটি নিয়মও যদি লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হও, তবে মুহূর্তমধ্যে প্রকৃতি অন্তিম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, প্রকৃতির অস্তিত্ব আর থাকিবে না। যিনি মুক্তিলাভ করেন, তিনিই প্রকৃতির নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিতে সমর্থ, তাঁহার নিকট প্রকৃতি লয়প্রাপ্ত হয়; প্রকৃতির কোন প্রভাব আর তাঁহার উপর থাকে না। প্রত্যেকেই একদিন চিরকালের জন্য এই নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিবে, আর তখনই প্রকৃতির সহিত তাহার দ্বন্দ্ব শেষ হইয়া যাইবে।

গবর্নমেণ্ট, সমিতি প্রভৃতি অল্পবিস্তর ক্ষতিকর। সকল সমিতিই কতকগুলি

দোষযুক্ত সাধারণ নিয়মের উপর স্থাপিত। যে মুহূর্তে তোমরা নিজেদের একটি সঙ্ঘে পরিণত করিলে, সেই মুহূর্ত হইতে ঐ সঙ্ঘের বহির্ভূত সকলের প্রতি বিদ্বেষ আরম্ভ হইল। যে-কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের অর্থ নিজের উপর গণ্ডি টানা ও স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করা। প্রকৃত কল্যাণ হইতেছে শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সাধুতার আধিক্যের সহিত কৃত্রিম নিয়ম হ্রাস পায়। ঐগুলি আর নিয়মের মধ্যে গণ্য করা হয় না। কারণ—উহা যদি সত্যই নিয়ম হইত, তবে কখনই উহা লঙ্ঘন করা যাইত না। এই তথাকথিত নিয়মগুলি যে ভাঙিয়া ফেলা যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, ঐগুলি প্রকৃত নিয়ম নয়; যাহা অলঙ্ঘ্য, তাহাই নিয়ম।

যখন কোন চিন্তা দমন করিয়া ফেলো, তখন উহা স্প্রিং-এর ন্যায় কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্যভাবে চাপা পড়িয়া থাকে মাত্র। সুযোগ পাইলেই মুহূর্তমধ্যে —দমনের ফলে সংহত সমস্ত রুদ্ধশক্তি লইয়া সবেগে বাহির হইয়া আসে, এবং তারপর যাহা ঘটিতে বহু সময় লাগিত, কয়েক মুহূর্তে তাহা ঘটিয়া যায়।

প্রতিটি ক্ষুদ্র সুখ বৃহৎ দুঃখ বহন করে। শক্তি এক—এক সময়ে যাহা আনন্দরূপে ব্যক্ত হয়, অন্যসময়ে তাহারই অভিব্যক্তি দুঃখ। কতকগুলি অনুভূতির অবসান হইলেই অপর কতকগুলি আরম্ভ হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নততর ব্যক্তিগণের কাহারও মধ্যে দুইটি, এমনকি একশত বিভিন্ন চিন্তা একই সময়ে কার্য করিতে থাকে।

মন হইতেছে স্বীয় স্বভাবের পরিণতি। মানসী ক্রিয়া অর্থে সৃষ্টি। শব্দ চিন্তার ও রূপ (আকার) শব্দের অনুসরণ করে। মনে আত্মা প্রতিফলিত হইবার পূর্বে মানসিক ও শারীরিক সর্বপ্রকার কার্য করিবার সঙ্কল্প রুদ্ধ করা প্রয়োজন।

ধর্মের অনুশীলন

১৮ই মার্চ, ১৯০০ খৃঃ ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত আলামেডায় প্রদত্ত।

আমরা বহু পুস্তক পড়িয়া থাকি, কিন্তু উহা দ্বারা আমাদের জ্ঞানলাভ হয় না। জগতের সমুদয় 'বাইবেল' আমরা পড়িয়া শেষ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমাদের ধর্মলাভ হইবে না। যে-ধর্ম কেবল কথায় পর্যবসিত, তাহা লাভ করা অতি সহজ, যে-কেহ উহা লাভ করিতে পারে। আমরা চাই কর্মে পরিণত ধর্ম। কর্মে পরিণত ধর্ম সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদিগের ধারণা হইতেছে সৎকর্মের অনুষ্ঠান—জগতের হিতসাধন।

হিতসাধনের বা পরোপকারের ফল কি? হিতবাদিগণের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিচার করিলে দেখা যায়, ধর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছে। বহুসংখ্যক লোক হাসপাতালে আসুক—ইহাই প্রত্যেকটি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের আকাঙ্ক্ষা। পরহিতৈষণার অর্থ কি? উহা অত্যাবশ্যক নয়। প্রকৃতপক্ষে পরহিতৈষণার অর্থ জগতের দুঃখে কিঞ্চিৎ সাহায্য করা—দুঃখের উচ্ছেদ সাধন নয়। সাধারণ লোক নাম-যশের প্রার্থী, এবং নাম-যশ লাভের উদ্দেশ্যেই সে তাহার সমুদয় প্রচেষ্টা পরোপকার ও সৎকর্মের চাকচিক্যময় আবরণে ঢাকিয়া রাখে। অপরের জন্য কাজ করিতেছি, এই ভান করিয়া বস্তুতঃ সে নিজের কাজই গুছাইয়া লয়। প্রত্যেকটি তথাকথিত পরোপকারের উদ্দেশ্য হইতেছে—অসৎকার্য অনুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে উৎসাহ-দান।

হাসপাতাল বা যে-কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রতি দাক্ষিণ্য দেখাইবার জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া বলনৃত্যে যোগদান করে এবং সারারাত্রি নৃত্যগীতে অতিবাহিত করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর পশুর ন্যায় আচরণ করে; ফলে পৃথিবীতে দলে দলে পাষণ্ড ব্যক্তির উৎপত্তি হয় এবং কারাগার, পাগলা-গারদ ও হাসপাতাল ঐ-প্রকার ব্যক্তির দ্বারা পূর্ণ হইয়া যায়। এইরূপই চলিতে থাকে, আর হাসপাতাল-স্থাপন প্রভৃতি সৎ কর্ম বলিয়া অভিহিত হয়। সৎ কর্মের আদর্শ হইতেছে জগতের সমুদয় দুঃখের হ্রাস অথবা সমূলে উচ্ছেদ-সাধন। যোগী বলেন, মনঃসংযমে ব্যর্থতা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি। যোগীর আদর্শ জড়-জগৎ হইতে মুক্তিলাভ। প্রকৃতিকে জয় করাই

তাঁহার কর্মের মানদণ্ড। যোগী বলেন, সমুদয় শক্তি আত্মায় বিদ্যমান, এবং শরীর ও মন সংযত করিয়া আত্মশক্তি-বলে যে-কেহ প্রকৃতিকে জয় করিতে সমর্থ।

দৈহিক কর্মের জন্য যতটা প্রয়োজন, তদতিরিক্ত সামান্য পরিমাণ দৈহিক শক্তির অর্থ—বুদ্ধির অনেকখানি হ্রাস। অত্যধিক কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়, উহা ক্ষতিকর। কঠোর পরিশ্রম না করিলে দীর্ঘজীবী হইবে। অল্প আহার গ্রহণ কর ও অল্প পরিশ্রম কর। মস্তিষ্কের খাদ্য সংগ্রহ কর।

নারীর পক্ষে গৃহকর্মই যথেষ্ট। প্রদীপ তাড়াতাড়ি পুড়াইয়া শেষ করিও না, ধীরে ধীরে পুড়িতে দাও।

যুক্তাহারের অর্থ সাদাসিধা খাদ্য, অত্যধিক মশলাযুক্ত খাদ্য নয়।

বেলুড় মঠ—আবেদন

হিন্দুধর্মের মূল তত্ত্বগুলি প্রচার করিয়া পাশ্চাত্য দেশে বহুনিন্দিত আমাদের ধর্মমতের প্রতি কথঞ্চিৎ শ্রদ্ধা অর্জন করিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্যগণ যেটুকু সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের ভিতরে ও বাহিরে প্রচার-কার্যের জন্য একদল যুবক সন্ন্যাসীকে শিক্ষা দিবার আশা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়াছে, একদল যুবক ছাত্রকে গুরুর সান্নিধ্যে রাখিয়া বৈদিক মতানুসারে শিক্ষা দিবার চেষ্টাও সেজন্য আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েকজন ইওরোপীয় এবং আমেরিকান বন্ধুর সাহায্যে কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গার তীরে একটি মঠ স্থাপিত হইয়াছে।

অল্প দিনে এই কাজের কোন প্রত্যক্ষ ফললাভ করিতে হইলে চাই অর্থ, অতএব যাঁহারা আমাদের এই চেষ্টার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন তাঁহাদের নিকট আমাদের এই আবেদন।

আমাদের ইচ্ছা—মঠের কাজের এইরূপ প্রসার করিতে হইবে, যাহাতে এই অর্থানুকূল্যে যতজন সম্ভব যুবককে মঠে রাখিয়া তাহাদিগকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়। উহাতে তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সহিত তাহাদের গুরুর নিকট বাস করিয়া পুরুষোচিত নিয়মানুবর্তিতা শিক্ষা লাভ করিবে।

লোকবল ও অর্থবল হইলে কলিকাতার নিকটস্থ প্রধান কেন্দ্র কর্তৃক দেশের অন্যান্য স্থানেও ক্রমশঃ শাখা-কেন্দ্র স্থাপিত হইবে।

এই কাজের স্থায়ী ফললাভ করিতে সময় লাগিবে, আমাদের যুবকদের পক্ষে যাহাদের এই কার্যে সাহায্য করার উপায় আছে, তাহাদের এজন্য প্রচুর ত্যাগের প্রয়োজন।

আমরা বিশ্বাস করি, এজন্য জনবল প্রস্তুত। অতএব যাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম ও দেশকে সত্যই ভালবাসেন এবং কার্যতঃ সহানুভূতি দেখাইতে পারেন, তাঁহাদের কাছে আমরা এই আবেদন জানাইতেছি।

অদ্বৈত আশ্রম, হিমালয়

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে স্বামীজী এই লেখাটি মায়াবতী (আলমোড়া, হিমালয়) অদ্বৈত আশ্রমের পূর্বাভাস-পত্রে (Prospectus) প্রকাশ করার জন্য পত্রযোগে প্রেরণ করেন।

যাঁহার মধ্যে এই ব্রহ্মাণ্ড, যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত, আবার যিনিই এই ব্রহ্মাণ্ড; যাঁহার মধ্যে আত্মা, যিনি এই আত্মার মধ্যে অবস্থিত, এবং যিনিই এই মানবাত্মা; তাঁহাকে অতএব এই ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মস্বরূপ, জানিলে আমাদের সমস্ত ভয় দূর হইয়া দুঃখের অবসান হয় এবং পরম মুক্তিলাভ হয়। যেখানেই প্রেমের প্রসারণ কিংবা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি দেখা যায়, সেখানেই উহা শাশ্বত সত্যের—'বহুত্বে একত্বে'র উপলব্ধির, উহার ধারণা ও কার্যকারিত্বের মধ্য দিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে। পরাধীনতাই দুঃখ; স্বাধীনতাই সুখ।

অদ্বৈতই একমাত্র মতবাদ, যাহা মানুষকে তাহার স্বাধিকার প্রদান করে, এবং তাহার সমস্ত পরাধীনতা, তৎসংশ্লিষ্ট সকল কুসংস্কার দূর করিয়া আমাদিগকে সর্বপ্রকার দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা ও কার্য করিবার সাহস প্রদান করে; পরিশেষে উহাই আমাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম করে।

দ্বৈতভাবের দুর্বলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিয়া এতদিন এই মহান্ সত্য প্রচার করা সম্ভবপর হয় নাই। এই কারণে আমাদের ধারণা—এই ভাব মানবসমাজের কল্যাণে সম্যক্ প্রচারিত হয় নাই।

এই মহান্ সত্যকে ব্যক্তিগত জীবনে স্বাধীন ও পূর্ণতর প্রকাশের সুযোগ দিয়া মানব-সমাজকে উন্নত করিতে আমরা হিমালয়ের এই ঊর্ধ্ব প্রদেশে—যেখানে ইহা প্রথম উদ্গীত হইয়াছিল—এই অদ্বৈত আশ্রম স্থাপন করিতেছি।

এখানে সমস্ত কুসংস্কার এবং বলহানিকারক মলিনতা হইতে অদ্বৈত ভাব মুক্ত থাকিবে, আশা করা যায়। এখানে শুধু 'একত্বের শিক্ষা' ছাড়া অন্য কিছুই শিক্ষা দেওয়া বা সাধন করা হইবে না। যদিও আশ্রমটি সমস্ত ধর্মমতের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিসম্পন্ন, তবুও ইহা অদ্বৈত—কেবলমাত্র অদ্বৈত—ভাবের জন্যই উৎসর্গীকৃত হইল।

বারাণসী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম : আবেদন

১৯০২ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে কাশী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমেব প্রথম কার্যবিবরণীসহ প্রেরিত একটি পত্র।

প্রিয়……

ইহার সহিত ৺কাশী রামকৃষ্ণ মিশন 'হোম অব সার্ভিসে' গত বৎসরের একটি কার্যবিবরণী আপনার জন্য পাঠাইতেছি।

এই পুণ্যতীর্থে যে-সকল ব্যক্তি, সাধারণতঃ বৃদ্ধ নরনারী দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদের দুঃখ মোচনের জন্য আমরা যে সামান্য চেষ্টা করিতে পারিয়াছি, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহা হইতে পাইবেন।

বর্তমান শিক্ষার জাগরণ ও জনমতের ক্রমবর্ধনের দিনে হিন্দুর তীর্থসমূহ তাহাদের বর্তমান অবস্থা ও কর্মপদ্ধতি সমালোচকের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। এই তীর্থ হিন্দুদিগের নিকট পবিত্রতম, সেজন্য ইহার সমালোচনাও কঠোরতম।

অন্যান্য তীর্থস্থানগুলিতে লোকে পাপ-মোচনের উদ্দেশ্যে যায়। সেজন্য তাহাদের সহিত তাহাদের সম্পর্কও সাময়িক—মাত্র কয়েকদিনের জন্য। কিন্তু আর্য সভ্যতার এই প্রাচীনতম ও সজীব ধর্মীয় কেন্দ্রে—এই নগরে—বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত নর-নারীগণ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের ছায়াতলে বসিয়া ধীরে ধীরে মৃত্যু বরণ করিয়া যাহাতে চরমমোক্ষ লাভ করিতে পারেন, সেজন্য দিনের পর দিন অপেক্ষা করিতে থাকেন।

ইহা ছাড়াও আর যাঁহারা জগদ্ধিতায় সর্বত্যাগী হইয়াছেন ও তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ও শৈশবের সকল সম্পর্ক হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাও এ শহরে বাস করেন। মানুষের নির্বিশেষ নিয়তি—দৈহিক রোগাদির দ্বারা তাঁহারাও আক্রান্ত হন।

শহরের ব্যবস্থাপনায় হয়তো কিছু কিছু ত্রুটি আছে, পুরোহিতবর্গের উপর সাধারণতঃ যে-সকল কঠোর সমালোচনা বর্ষিত হয়, হয়তো তাহাও সত্য। তথাপি ভুলিলে চলিবে না—জনসাধারণ যেমন, পুরোহিতও তেমনি। যদি লোকে জোড়হাতে কেবল একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকে ও দুঃখের

এই দ্রুত প্রবাহ—যাহা তাহাদের গৃহের পাশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সন্ন্যাসী ও গৃহীদিগকে অসহায় দুর্ভোগের সাধারণ আবর্তে টানিয়া ফেলিতেছে—কেবল দেখিতে থাকেন এবং ঐ প্রবাহ হইতে কাহাকেও বাঁচাইবার চেষ্টামাত্র না করিয়া তীর্থের পুরোহিতকুলের অন্যায় কার্যের শুধু বাগাড়ম্বরপূর্ণ সমালোচনা করেন, তাহা হইলে এই দুর্ভোগের এক কণাও কমিবে না, এক ব্যক্তিও সাহায্য পাইবে না।

প্রশ্ন এই—শিবের এই চিরন্তন স্থান মোক্ষলাভের অনুকূল বলিয়া আমাদের পূর্বপুরুষগণ যেরূপ বিশ্বাস করিতেন, আমরাও কি সেই বিশ্বাস পোষণ করিতে চাই? যদি তাই হয়, তবে মরণার্থী ব্যক্তিগণের বৎসরের পর বৎসর এখানে আসিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে দেখিয়া আমাদের আনন্দলাভ করাই উচিত। দুঃখিগণের মোক্ষলাভের এই চিরন্তন ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া আমাদের শ্রীভগবানের নামের জয়গান করাই কর্তব্য।

যে-সব দুঃখার্ত ব্যক্তি এইস্থানে মৃত্যুবরণ করিতে আসে, তাহারা স্বকীয় জন্মস্থানের প্রাপ্য সমস্ত সাহায্য হইতে স্বেচ্ছায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; তাহারা যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন তাহাদের যে কী অবস্থা হয়, তাহা অনুভব করিবার ভার ও হিন্দু-হিসাবে আপনারা উহার কি প্রতিকার করিতে পারেন, তাহা ভাবিয়া দেখিবার ভার আপনাদের বিবেকের উপর ন্যস্ত করিতেছি।

ভ্রাতৃগণ! অন্তিম বিশ্রামের প্রস্তুতির এই অদ্ভুত স্থানের আশ্চর্যকর আকর্ষণের বিষয় স্থিরচিত্তে আপনারা কি চিন্তা করিতে পারেন না? মৃত্যুর মাধ্যমে মোক্ষের দিকে অগ্রসর তীর্থযাত্রীদের বহু প্রাচীন বিরামহীন এই স্রোত আপনাদিগকে কি অনির্বচনীয় শ্রদ্ধার ভাবে আবিষ্ট করে না? যদি করে, তবে আসুন আমাদিগকে এই কাজের জন্য আপনাদের সদয় হস্ত প্রসারিত করুন।

আপনাদের দান হয়তো অতি সামান্য, আপনাদের সাহায্য হয়তো নগণ্য, তবুও কুণ্ঠাবোধ করিবেন না। সেই প্রাচীন প্রবাদ—তৃণগুচ্ছগুলি একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত করিলে সর্বাপেক্ষা মদমত্ত হস্তীকেও উহা দ্বারা বাঁধিয়া রাখা যায়।

বিশ্বনাথাশ্রিত সর্বদা আপনাদের

বিবেকানন্দ

উক্তি-সঞ্চয়ন

উক্তি-সঞ্চয়ন—১

[ভগিনী নিবেদিতার Master as I saw Him প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে স্বামীজীর উক্তি-চয়ন]

১। মানুষের জন্ম প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই, তাহাকে অনুসরণ করার জন্য নয়।

২। তুমি যখন নিজেকে দেহমাত্র বলিয়া ভাবো, তখন তুমি বিশ্বজগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন; নিজেকে যখন জীব বলিয়া ভাবো, তখন তুমি সেই শাশ্বত মহান্ জ্যোতির একটি কণিকামাত্র; আর যখন নিজেকে আত্মা বলিয়া ভাবো, তখন তুমিই সব কিছু।

৩। ইচ্ছাশক্তি স্বাধীন নয়—ইহা কার্যকারণের গণ্ডিরই মধ্যস্থ ব্যাপার-বিশেষ; কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির পিছনে এমন কিছু আছে, যাহা স্বাধীন।

৪। সততা এবং পবিত্রতাই শক্তির আকর।

৫। বিশ্বজগৎ ঈশ্বরেরই বহিঃপ্রকাশ।

৬। নিজের উপর বিশ্বাস না আসিলে ঈশ্বরে বিশ্বাস আসে না।

৭। 'আমরা দেহ'—এই ভ্রমই সকল অমঙ্গলের মূল। আদি পাপ বলিয়া যদি কিছু থাকে, ইহাই সেই পাপ।

৮। একদল বলেন, চিন্তা—জড় হইতে উৎপন্ন; আবার অপর দলের মতে চিন্তা হইতে জড়-জগতের উৎপত্তি। এই দুইটি মতবাদই ভুল। জড়বস্তুএবং চিন্তা পরস্পর-সহগামী। তৃতীয় এমন একটি বস্তু আছে, যাহা হইতে জড় এবং চিন্তা দুই-ই উদ্ভূত।

৯। আকাশের ভিত্তিতে যেমন সমস্ত জড়কণা একত্র হয়, তেমনি কালের ভিত্তিতে সমস্ত চিন্তাতরঙ্গ মিলিত হয়। সকল জড় যেমন আকাশে (দেশে) সীমাবদ্ধ, সকল চিন্তাও তেমনি কালে সীমাবদ্ধ।

১০। ঈশ্বরের সংজ্ঞা নির্ণয় করিতে যাওয়া মানে পিষ্টপেষণ করা, কারণ তিনিই একমাত্র সত্তা—যাহাকে আমরা জানি।

১১। ধর্ম এমন একটি ভাব, যাহা পশুকে মানুষে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।

১২। বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতিরই স্থূল প্রকাশ মাত্র।

১৩। উদ্দেশ্য দ্বারাই কোন কাজের মূল্য নিরূপিত হয়। তুমি ঈশ্বর, নিম্নতম মানুষটিও ঈশ্বর—ইহা অপেক্ষা উচ্চতর উদ্দেশ্য আর কি থাকিতে পারে?

১৪। মনোজগতের ঘটনাবলী পরীক্ষা করিতে হইলে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে শিক্ষিত এবং খুব সবল হওয়া প্রয়োজন।

১৫। মনই সব কিছু, চিন্তাই সব কিছু—এ-রকম ভাবা একটি উন্নত ধরনের জড়বাদ মাত্র।

১৬। এই পৃথিবী একটি বিরাট ব্যায়ামাগার, এখানে আমরা আসি নিজেদের সবল করিয়া তুলিতে।

১৭। একটি চারাগাছকে বাড়ানো তোমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব, একটি শিশুকে শিক্ষা দেওয়াও তোমার পক্ষে ততটুকু সম্ভব, তার বেশী নয়। তুমি যেটুকু করিতে পারো, তাহার সবটাই 'নেতি'র দিকে—তুমি শুধু তাহাকে সাহায্য করিতে পারো। শিক্ষা ভিতর হইতে বিকাশ হয়। নিজের প্রকৃতিকে শিশু বিকশিত করিতে থাকে; তুমি কেবল বাধাগুলি অপসারিত করিতে পারো।

১৮। সম্প্রদায়-গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের বিরোধিতা করা হয়। যাঁহাদের হৃদয়ে সত্যই বিশ্বপ্রেমের অনুভূতি জাগিয়াছে, তাঁহারা বেশী কথা বলেন না, কিন্তু তাঁহাদের কাজগুলিই উচ্চকণ্ঠে উহা ঘোষণা করে।

১৯। সত্যকে হাজার রকম বাক্যে প্রকাশ করা চলে, এবং প্রতিটি বাক্যই সত্য।

২০। তোমাকে ক্রমশঃ ভিতর হইতে বাহিরের দিকে বিকশিত হইতে হইবে; ইহা কেহই তোমাকে শিখাইতে পারে না, কেহ তোমাকে ভগবৎ-

পরায়ণ করিয়া দিতে পারে না। তোমার নিজের অন্তরাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোন শিক্ষক নাই।

২১। একটি অন্তহীন শৃঙ্খলের কয়েকটি শিকলির সহিত পরিচয় ঘটিয়া থাকিলে একই উপায়ে অপর অংশগুলিরও পরিচয়-লাভ সহজ।

২২। কোন জড় পদার্থ যাঁহাকে চঞ্চল করিতে পারে না, তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন।

২৩। সত্যের জন্য সব কিছুকেই ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুরই জন্য সত্যকে বর্জন করা চলে না।

২৪। সত্যের অনুসন্ধান মানে শক্তির প্রকাশ—এটা দুর্বল বা অন্ধের মতো হাতড়ানো নয়।

২৫। ঈশ্বর মানুষ হইয়াছেন—মানুষ আবার ঈশ্বর হইবে।

২৬। মানুষ মরে এবং স্বর্গে যায়—ইহা তো ছেলেমানুষী কথা। আমরা কখনও আসি না, যাইও না। আমরা যেখানকার সেখানেই আছি। যত জীবাত্মা আজ পর্যন্ত হইয়াছে বা আছে এবং হইবে—সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে অবস্থিত।

২৭। যাঁহার হৃদয়-বেদ খুলিয়া গিয়াছে, তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রয়োজন হয় না। গ্রন্থের একমাত্র কাজ হইল অন্তরে আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করা। গ্রন্থগুলি তো অন্যের অভিজ্ঞতা মাত্র।

২৮। সকল জীবের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হও। দুঃস্থদের প্রতি করুণা প্রকাশ কর। সমস্ত প্রাণীকে ভালবাসো। কাহারও প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইও না এবং অপরের দোষ দর্শন করিও না।

২৯। মানুষ কখনও মরে না বা কখনও জন্মায়ও না। মৃত্যু হয় দেহের ; কিন্তু আত্মা কোনদিন মরে না।

৩০। কোন ধর্ম-মত লইয়া কেহ জন্মায় না ; পরন্তু প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মমতের জন্যই জন্মায়।

৩১। প্রকৃতপক্ষে চরাচর বিশ্বে এক আত্মাই আছেন; অন্য সব কিছু তাঁহারই বিকাশ মাত্র।

৩২। উপাসকদের অধিকাংশই সাধারণ শ্রেণীর, বীর কেবল দু-একজন, উপাসকদিগকে শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

৩৩। যদি এইখানে—এবং এই মুহূর্তেই পূর্ণত্ব লাভ করা সম্ভব না হয়, তবে অন্য কোন জীবনে যে আমরা পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারিব, তাহার কোন প্রমাণ নাই।

৩৪। একতাল মাটি সম্বন্ধে যদি আমার সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়, তবে পৃথিবীতে যত মাটি আছে, সে সম্বন্ধেও আমি জানিতে পারি। ইহা হইল তথ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান, কিন্তু ইহার ক্ষেত্রানুযায়ী রূপ বিভিন্ন হইতে পারে। যখন তুমি নিজেকে জানিতে পারিবে, তখন সবই জানা হইয়া যাইবে।

৩৫। বেদের যতখানি অংশ যুক্তিসিদ্ধ, আমি ব্যক্তিগতভাবে ততটুকু গ্রহণ করি। বেদের কোন কোন অংশ আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী। দিব্যপ্রেরণালব্ধ বাণী (Inspired) বলিতে পাশ্চাত্য ভাষায় যাহা বুঝায়, এগুলি ঠিক তাহা নয়, বরং এগুলিকে ঈশ্বরের জ্ঞানসমষ্টি বা সর্বজ্ঞতা বলা যাইতে পারে। কল্পারম্ভে এই জ্ঞানের স্ফূর্তিও বিস্তার হয় এবং কল্পশেষে এগুলি আবার সূক্ষ্মাকার প্রাপ্ত হয়। আবার যখন কল্প আরম্ভ হয়, তখন ঐ সঙ্গে এই জ্ঞানেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই পর্যন্ত এই মতবাদটি ঠিকই আছে। কিন্তু বেদ নামে অভিহিত শুধু এই বইগুলিই ঈশ্বরের জ্ঞান, 'এ-কথা বলা বৃথা তর্ক মাত্র। মনু এক জায়গায় উল্লেখ করিয়াছেন, বেদের যে-অংশ যুক্তিসম্মত, সেইটুকুই বেদ নামের যোগ্য, অন্য কিছু নয়। আমাদের দার্শনিকেরা অনেকেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।

৩৬। জগতের সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বেদই কেবল ঘোষণা করেন যে, বেদের অধ্যয়নও গৌণ। 'যাহা দ্বারা আমরা সেই অক্ষর পুরুষকে জানিতে পারি' তাহাই প্রকৃত বিদ্যা এবং এই বিদ্যা কেবল বেদপাঠ, বিশ্বাস বা বিচার—এগুলির কোনটিই নয়, উহা অতিচেতন অনুভূতি বা সমাধি।

৩৭। আমরাও এক সময়ে নিম্নতর প্রাণী ছিলাম। আমরা ভাবি যে, তাহারা আমাদের হইতে ভিন্ন। পাশ্চাত্য দেশের লোকদের বলিতে শুনি—আমাদের ভোগের জন্য জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। ব্যাঘ্রদের বই লিখিবার ক্ষমতা থাকিলে তাহারাও বলিত যে, তাহাদের ভোগের জন্যই মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সব প্রাণীর মধ্যে মানুষই পাপিষ্ঠ, কেন-না তাহারা সহজে বাঘের নিকট ধরা দিতে চায় না। যে কীট তোমার পায়ের তলায় আজ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেও একদিন ঈশ্বরত্ব লাভ করিবে।

৩৮। নিউ ইয়র্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন: আমাদের দেশের মেয়েরা তোমাদের মতো বিদ্যা বুদ্ধি অর্জন করুক, ইহা আমি খুবই চাই, কিন্তু পবিত্রতা বিসর্জন দিয়া যদি তাহা করিতে হয়, তবে নয়। তোমরা যাহা জানো, তাহার জন্য তোমাদের আমি প্রশংসা করি, কিন্তু তোমরা যেভাবে মন্দকে ফুল দিয়া ঢাকিয়া ভাল বলো, তাহা আমি পছন্দ করি না। বুদ্ধি-চাতুর্যই শ্রেষ্ঠ বস্তু নয়। নৈতিকতা এবং অধ্যাত্মিকতা লাভের জন্যই আমাদের সাধনা। আমাদের দেশের মেয়েরা তেমন শিক্ষিতা নয় বটে, কিন্তু তাহারা অনেক বেশী পবিত্র। নারীর কাছে নিজ স্বামী ছাড়া অন্য সব পুরুষই সন্তান, প্রত্যেক পুরুষের নিকট নিজ স্ত্রী ব্যতীত অপর সকল নারীই মাতৃসদৃশ মনে হওয়া উচিত। আমি যখন আশে-পাশে তাকাই, তখন তোমরা যাহাকে নারীজাতির প্রতি পুরুষসুলভ সৌজন্য (gallantry) বলো, তাহা দেখিয়া আমার মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া যতদিন না তোমরা মানবিকতার সাধারণ ভিত্তি-ভূমিতে পরস্পর মেলামেশা করিতে পারিতেছ, ততদিন তোমাদের নারী-সমাজের যথার্থ উন্নতি হইবে না। তাহারা ততদিন তোমাদের ক্রীড়া-পুত্তলিকা মাত্র হইয়া থাকিবে, তার বেশী নয়। এইগুলিই হইল বিবাহ-বিচ্ছেদের কারণ। তোমাদের পুরুষেরা নত হইয়া মেয়েদের অভিবাদন করে এবং বসিতে চেয়ার আগাইয়া দেয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে প্রশংসাবাদ। তাহারা বলিতে থাকে, 'মহোদয়া, আপনার চোখ-দুটি কি সুন্দর!' এইরূপ করার তাহাদের কি অধিকার আছে? পুরুষ কি করিয়া এতদূর সাহসী হইতে পারে এবং তোমরা মেয়েরাই বা কি করিয়া এ-সব অনুমোদন কর? এই ভাব-অবলম্বনে মানব-জীবনের অপেক্ষাকৃত নিম্ন দিকটাই প্রকাশিত হয়। এগুলির দ্বারা মহৎ আদর্শের দিকে

যাওয়া যায় না। আমরা যেন না ভাবি যে, আমরা পুরুষ বা স্ত্রী, বরং আমরা যেন ভাবি যে, আমরা মানুষ-মাত্র। জীবনকে সার্থক করার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করার জন্যই আমাদের জন্ম। কোন যুবক ও যুবতীকে একসঙ্গে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে অমনি যুবকটি যুবতীর স্তুতিবাদ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এবং একজন কাহাকেও বিবাহ করার আগে হয়তো দেখা যাইবে, সে দুই-শ জনের নিকট প্রণয় নিবেদন করিয়াছে। কি জ্বালা! আমি যদি বিবাহকারীদের দলে ভিড়িতাম, তবে অত না করিয়া একজন প্রেয়সী যোগাড় করিতে পারিতাম।

ভারতে থাকা-কালে যখন আমি দূর হইতে এই-সব লক্ষ্য করিতাম, তখন শুনিয়াছিলাম, এ-সব দোষের নয়; এগুলি একটু আমোদ-প্রমোদ মাত্র, আর আমি তাহা বিশ্বাসও করিয়াছিলাম, কিন্তু তারপর আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, ইহা ঠিক নয়, এগুলি দূষণীয়; কেবল পাশ্চাত্যবাসী তোমরা চোখ বুজিয়া থাকো আর বলো, এ-সব ভাল। পাশ্চাত্য জাতিগুলির ত্রুটি এইখানে যে, তাহারা নূতন জাতি, নির্বোধ, অব্যবস্থিত-চিত্ত এবং ঐশ্বর্যশালী। এইগুলির যে-কোন একটিই কত না ক্ষতিকর হইতে পারে; আবার যখন এগুলির তিনটি বা চারিটি একত্র হয়, তখন সাবধান হওয়া উচিত।

স্বামীজী স্বভাবতঃ সকলেরই কঠোর সমালোচনা করিলেও বস্টনবাসীদের প্রতি কঠোরতম ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন: বস্টনই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। ওখানকার মেয়েরা হুজুকপ্রিয়, অব্যবস্থিত-চিত্ত; সব সময় কিছু অভিনব এবং অদ্ভুত জিনিসের পিছু পিছু ছুটিতে ব্যস্ত।

৩৯। তিনি আমেরিকায় বলেন: যে-দেশ সভ্যতার জন্য এত গর্বিত, সে-দেশের নিকট যেরূপ আধ্যাত্মিকতা আশা করা যায়, তাহা কোথায়?

৪০। 'ইহলোক' এবং 'পরলোক' এই-সব শব্দ শুধু শিশুদের ভয় দেখাইবার জন্য। সব কিছুই 'এখানে'। ইহলোকে—এই দেহেই ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া ভাগবত জীবন যাপন করিতে হইবে, সেজন্য সমস্ত স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করা প্রয়োজন, সমস্ত কুসংস্কার বর্জন করিতে হইবে। ভারতে এরূপ পুরুষ আছেন; এদেশে সে-রকম মানুষ কোথায়? তোমাদের (আমেরিকার)

ধর্ম-প্রচারকেরা স্বপ্ন-বিলাসীদের নিন্দা করেন। কিন্তু এদেশে আরও বেশী স্বপ্নবিলাসী থাকিলে এদেশের মঙ্গল হইত। স্বপ্নবিলাস এবং উনবিংশ শতাব্দীর এই দাম্ভিকতার মধ্যে তফাত অনেক। সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরভাবে পরিপূর্ণ, পাপে নয়। এস, আমরা একে অপরকে সাহায্য করি, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি।

৪১। অর্থ, নারী ও যশ উপেক্ষা করিয়া আমি যেন আমার শ্রীগুরুর মতো প্রকৃত সন্ন্যাসীর মৃত্যু বরণ করিতে পারি। এগুলির মধ্যে যশের আকাঙ্ক্ষাই হইল সর্বাধিক শত্রু।

৪২। আমি কখনও প্রতিহিংসার কথা বলি না। আমি সব সময়ে শক্তির কথাই বলিয়াছি। সমুদ্রের এই একটু জলকণিকার বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিহিংসা-বৃত্তি জাগে কি? তবে হাঁ, একটা মশকের নিকট উহা খুবই মারাত্মক বটে।

৪৩। একবার আমেরিকায় স্বামীজী বলিলেন: এটি একটি মহান্ দেশ, কিন্তু আমি এখানে বাস করিতে চাই না। আমেরিকানরা বড় বেশী অর্থের কথা ভাবে। অন্য কোন বস্তু অপেক্ষা তাহারা অর্থের উপর বেশী গুরুত্ব দেয়। তোমাদের দেশের লোকদের অনেক কিছু শিখিবার আছে। তোমাদের জাতি যখন আমাদের মতো প্রাচীন হইবে, তখন তোমাদের জ্ঞান আরও পাকা হইবে।

৪৪। এমনও হইতে পারে যে, আমি হয়তো বুঝিব—এই দেহের বাহিরে চলিয়া যাওয়া, এই দেহকে জীর্ণ পোশাকের মতো ফেলিয়া দেওয়াই আমার পক্ষে হিতকর। কিন্তু আমি কোনদিন কর্ম হইতে ক্ষান্ত হইব না। যতদিন না সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একত্ব অনুভব করিতেছে, ততদিন আমি সর্বত্র মানুষের মনে প্রেরণা জাগাইতে থাকিব।

৪৫। আমি নিজে যাহা কিছু হইয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যাহা হইবে, তাহার সব কিছুরই মূলে আছেন—আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ। জগতে অবতীর্ণ হইয়া তিনি হিন্দু-ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মের মধ্যে সেই সর্বানুস্যূত অতি আশ্চর্য এক একত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা প্রচার করিয়াছিলেন।

৪৬। জিহ্বাকে যথেচ্ছ চলিতে দিলে অপর ইন্দ্রিয়গুলিও যথেচ্ছ চলিবে।

৪৭। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম—মুক্তির এই চারিটি পথ। নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে; তবে এই যুগে কর্মযোগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

৪৮। ধর্ম কল্পনার জিনিস নয়, অপরোক্ষ অনুভূতির বিষয়। যিনি কোন একটি ভাবকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত অপেক্ষা বড়।

৪৯। স্বামীজী একবার একজনের খুব প্রশংসা করিতেছিলেন, ইহাতে পার্শ্বস্থ একজন বলিয়া উঠিলেন, 'তিনি কিন্তু আপনাকে মানেন না।' এই কথা শুনিয়া স্বামীজী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'তিনি কি এমন কোন আইনে আবদ্ধ যে, আমাকে মানিতেই হইবে। তিনি সৎ কাজ করিতেছেন, তাই তিনি প্রশংসার যোগ্য।'

৫০। প্রকৃত ধর্মের রাজ্যে পুঁথিগত বিদ্যার প্রবেশাধিকার নাই।

৫১। কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ভিতর যেদিন হইতে ধনীদের তোষণ করা আরম্ভ হয়, সেদিন হইতে ঐ সম্প্রদায়ের ধ্বংসও আরম্ভ হয়।

৫২। তোমার যদি কোন অন্যায় করিবার ইচ্ছা হয়, তবে তাহা তোমার গুরুজনদের চোখের সামনে কর।

৫৩। গুরুর কৃপায় কোন বই না পড়িয়াও শিষ্য পণ্ডিত হইতে পারে।

৫৪। পাপ বা পুণ্যের কোন অস্তিত্ব নাই, আসলে আছে অজ্ঞান। অদ্বৈত অনুভূতির দ্বারা এই অজ্ঞান দূরীভূত হয়।

৫৫। ধর্মান্দোলনগুলি দলবদ্ধভাবে আসে; তাহাদের প্রত্যেকটি অপরগুলিকে অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিতে যায়, কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের একটিই প্রকৃতপক্ষে শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং সমসাময়িক অপর আন্দোলনগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলে।

৫৬। রামনাদে থাকা কালে কথোপকথন-প্রসঙ্গে স্বামীজী বলিলেন: রাম পরমাত্মা, সীতা দেবী জীবাত্মা এবং প্রত্যেক নারী বা পুরুষের দেহই লঙ্কা।

এই দেহ-রূপ লঙ্কায় বন্দী জীবাত্মা সব সময়েই পরমাত্মা বা শ্রীরামের সহিত মিলন কামনা করে, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহা হইতে দেয় না। রাক্ষস মানে চারিত্রিক কতকগুলি বৈশিষ্ট্য। উদাহরণস্বরূপ বিভীষণ সত্ত্বগুন, রাবণ রজোগুণ এবং কুম্ভকর্ণ তমোগুণের প্রতীক। সত্ত্বগুণের অর্থ সাধুতা; রজোগুণের অর্থ কাম ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতা; তমোগুণের অর্থ অজ্ঞান, জড়তা, লোভ, হিংসা ও অন্যান্য সহগামী দোষসমূহ এই গুণগুলি দেহে আবদ্ধ জীবাত্মাকে বা লঙ্কায় বন্দিনী সীতাকে পরমাত্মা বা শ্রীরামের সহিত মিলিত হইতে দেয় না। এইরূপে বন্দিনী সীতা যখন তাঁহার প্রভুর সঙ্গে মিলিবার জন্য ব্যাকুল, তখন তিনি হনুমান্ অর্থাৎ গুরু বা পরমার্থ-বস্তুর উপদেষ্টার সাক্ষাৎ পান। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের অঙ্গুরীয়ক দেখান। এই অঙ্গুরীয়ক হইল ব্রহ্মজ্ঞান বা সর্বোত্তম অনুভূতি, যাহা সকল ভ্রান্তি নিরসন করে। এইরূপে সীতা শ্রীরামের সান্নিধ্যলাভের উপায় দেখিতে পান অর্থাৎ অন্য কথায় বলিতে গেলে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্বানুভূতি হয়।

৫৭। যে প্রকৃত খ্রীষ্টান, সে প্রকৃত হিন্দুও বটে, আবার যে প্রকৃত হিন্দু, সে প্রকৃত খ্রীষ্টানও বটে।

৫৮। সমাজের ভিতরে যে আধ্যাত্মিক শক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তাহার বিকাশের ফলেই সামাজিক শুভ পরিবর্তনগুলি সংঘটিত হইতেছে। এই শক্তিগুলি সুদৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ হইলে সমাজও নিজেকে তদনুরূপ গড়িয়া তুলিবে। প্রত্যেককেই যেমন নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে হয় এবং তা ছাড়া উপায় নাই, প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধেও একই কথা। প্রত্যেক জাতির মধ্যে আবার যে-সব নিজস্ব ভাল বিধিব্যবস্থাদি আছে, ঐগুলিরই উপর ঐ-সব জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করে এবং ঐগুলিকে অন্য জাতির ছাঁচে ঢালিয়া নূতন করিয়া গড়া চলে না। যতদিন না কোন উন্নততর বিধিব্যবস্থা উদ্ভাবিত হয়, ততদিন পুরাতনগুলিকে ভাঙিয়া ফেলার চেষ্টা করা মারাত্মক। উন্নতি সব সময় ধীর গতিতে ক্রমশঃ হইয়া থাকে। সব সামাজিক রীতিনীতি অল্পবিস্তর অসম্পূর্ণ বলিয়া ঐগুলির ত্রুটি দেখাইয়া দেওয়া খুবই সোজা। কিন্তু তিনিই মনুষ্য-জাতির যথার্থ কল্যাণকামী, যিনি মানুষ যে-কোন সমাজব্যবস্থার মধ্যেই জীবন যাপন করুক না কেন, তাহার অপূর্ণতা দূর করিয়া দিয়া তাহাকে

উন্নতির পথে অগ্রসর করাইয়া দেন, ব্যক্তির উন্নতি হইলেই সমাজ ও জাতির উন্নতি হইবে।

ধার্মিক ব্যক্তিগণ সমাজের দোষ ত্রুটি ধরিতে যান না, কিন্তু তাহাদের প্রেম সহানুভূতি ও সততা তাহাদিগকে সমাজকল্যাণে নিয়োজিত করে। উহাই তাঁহাদের নিকট অলিখিত শাস্ত্র। যে-সকল জাতি বা সমাজ ক্ষুদ্র লিখিত শাস্ত্রীয় গণ্ডির উপরে উঠিতে পারেন, তাঁহারাই যথার্থ সুখী। সৎলোকেরা এই শাস্ত্রীয় গণ্ডির উপরে উঠেন ও তাঁহাদের প্রতিবেশিগণ যে-কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন তাহাদিগকে এইরূপ উঠিতে সাহায্য করেন। ভারতের মুক্তিও সেইজন্য ব্যক্তির শক্তি-বিকাশ ও তাহার অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম-উপলব্ধির উপরই নির্ভর করে।

৫৯। জড়বাদ না গেলে আধ্যাত্মিকতা কখনও আসিতে পারে না।

৬০। গীতার প্রথম অধ্যায়টি রূপক হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

৬১। যথাসময়ে স্টীমার ধরিতে পারিবেন না ভাবিয়া উদ্বিগ্ন একজন মার্কিন ভক্ত মন্তব্য করিলেন, 'স্বামীজী, আপনার কোন সময়-জ্ঞান নাই।' স্বামীজী শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'ঠিক কথা ; তুমি আছ সময়ের ভিতর, আমি আছি অনন্তে।'

৬২। আমরা সর্বদাই ভাবপ্রবণতাকে আমাদের কর্তব্যবুদ্ধির স্থান অধিকার করিতে দিই, অথচ আমরা এই মনে করিয়া আত্মতুষ্টি লাভ করি যে, আমরা প্রকৃত ভালবাসার প্রেরণাতেই কাজ করিতেছি।

৬৩। ত্যাগের শক্তি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই ভাব-প্রবণতার বাহিরে যাইতে হইবে। ভাবপ্রবণতা পশুদের বৃত্তি। তাহারা পুরাপুরি ভাবাবেগেই চলে।

৬৪। নিজ নিজ সন্তান-সন্ততির জন্য ত্যাগকে উচ্চতর ত্যাগ বলা যায় না। পশুরাও ঐরকম করিয়া থাকে এবং মানুষের যে-কোন মা যতখানি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ত্যাগ করেন, তাহারাও ঠিক ততখানি করে। ঐরূপ করাটাই ভালবাসার প্রকৃত পরিচয় নয় ; উহা তো শুধু অন্ধ ভাবপ্রবণতা।

৬৫। আমরা চিরকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছি, আমাদের দুর্বলতাকে

শক্তিরূপে দেখাইতে, ভাবপ্রবণতাকে ভালবাসা বলিয়া চালাইতে, কাপুরুষতাকে সাহসের রূপ দিতে, এবং এইরূপ আরও কত কি।

৬৬। দাম্ভিকতা দুর্বলতা প্রভৃতি বিষয়ে তোমার অন্তরাত্মাকে বলো: এগুলি তোমার সাজে না, এগুলি তোমার সাজে না।

৬৭। কোন স্বামী কখনও তাহার স্ত্রীকে 'স্ত্রী' বলিয়া ভালবাসে নাই বা স্ত্রীও তাহার স্বামীকে 'স্বামী' বলিয়াই ভালবাসে নাই। স্ত্রীর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাহাকেই স্বামী ভালবাসে, এবং স্বামীর মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকেই স্ত্রী ভালবাসে। প্রত্যেকের মধ্যে যে ঈশ্বর আছেন, তিনিই আমাদের হৃদয়ে ভালবাসার প্রেরণা জাগান। ঈশ্বরই একমাত্র প্রেমস্বরূপ।

৬৮। আহা! যদি তোমরা তোমাদের নিজেদের জানিতে পারিতে! তোমরা আত্মা, তোমরাই ঈশ্বর! যদি কখনও আমি তোমাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাবি, তাহা হইলে আমি ঈশ্বরের নিন্দা করিতেছি, জানিও।

৬৯। প্রত্যেকের মধ্যেই সেই ঈশ্বর, পরমাত্মা আছেন। অন্য সব কিছুই স্বপ্ন, শুধু মায়া।

৭০। আধ্যাত্মিক জীবনে যদি আনন্দ না পাই, তবে কি ইন্দ্রিয়পরায়ণতার মধ্যে তৃপ্তির সন্ধান করিতে হইবে? অমৃত না পাইলে কি নর্দমার জল পান করিতে হইবে? চাতক কেবল বৃষ্টির জল পান করে; উড়িতে উড়িতে সে শুধু ভাবে—ফটিক জল, ফটিক জল। কোন ঝড়-ঝঞ্ঝাও তাহার পাখার গতি থামাইতে পারে না বা জলপানের জন্য তাহাকে ধরাপৃষ্ঠে নামাইতে পারে না।

৭১। ঈশ্বর-উপলব্ধির সহায়ক যে-কোন সম্প্রদায়কেই স্বাগত জানাও। ঈশ্বরানুভূতিই ধর্ম।

৭২। নাস্তিকও দয়াবান্ হইতে পারে, কিন্তু ধার্মিক হইতে পারে না। পরন্তু ধার্মিককে দয়াশীল হইতেই হইবে।

৭৩। গুরুর আসন গ্রহণ করিবার জন্য জন্মিয়াছেন, এমন সব মহাত্মা ছাড়া আর সকলেই গুরুগিরি করিতে গিয়া ভরাডুবি করেন।

৭৪। পশুত্ব, মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরত্ব—এই তিনের সমষ্টিতেই মানুষ।

৭৫। গরম বরফ, অন্ধকার আলো—বলিতে যাহা বুঝায়, 'সামাজিক উন্নতি' বলিতে অনেকটা তাহাই বুঝায়। শেষ পর্যন্ত 'সামাজিক উন্নতি' বলিতে কিছুই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

৭৬। বাহিরের কিছুর উন্নতি হয় না, জগতের উন্নতি করিতে গিয়া আমরাই উন্নত হই।

৭৭। আমি যেন মানুষের সেবা করিতে পারি—ইহাই আমার একমাত্র কাম্য।

৭৮। নিউ ইয়র্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী অতি মৃদুভাবে বলিলেন: না, আমি কোন অলৌকিক বিদ্যায় (Occultism) বিশ্বাস করি না। কোন জিনিস যদি মিথ্যা হয়, তবে তাহা নাই; যাহা মিথ্যা, তাহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনাগুলিও প্রাকৃতিক ব্যাপারেরই অন্তর্গত। আমি এগুলিকে বিজ্ঞানের বিষয় বলিয়াই মনে করি। সে-হিসাবে এগুলি আমার নিকট গুপ্তবিদ্যার বিষয় নয়। আমি কোন গুপ্তবিদ্যা-সঙ্ঘে আস্থা রাখি না। তাহারা ভাল কিছুই করে না, করিতে পারে না।

৭৯। যুক্তিবাদী, ভাবপ্রবণ, রহস্যবাদী এবং কর্মী—সাধারণতঃ এই চারি স্তরের লোক দেখা যায়। ইহাদের প্রত্যেক স্তরের জন্যই উপযুক্ত সাধন-পদ্ধতি থাকা প্রয়োজন। যুক্তিবাদী আসিয়া বলিলেন—আমি এ রকম সাধন-পদ্ধতি মানি না, আমাকে বিশ্লেষণমূলক যুক্তিসিদ্ধ কিছু বলুন; যাহাতে আমার মন সায় দিতে পারে। সুতরাং বিচারবাদীর জন্য দার্শনিক বিচারই হইল সাধন-মার্গ। তারপর কর্মী আসিয়া বলেন, আমি দার্শনিকের সাধন-পদ্ধতি মানি না। আমাকে মানুষের জন্য কিছু করিতে দিন। অতএব তাঁহার সাধনার জন্য কর্মই পথ-হিসাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে। রহস্যবাদী (mystic) এবং ভাবপ্রবণ ব্যক্তিদের জন্যও তাঁহাদের উপযুক্ত উপাসনা-মার্গ নির্ধারিত হইয়াছে। এই-সব লোকেরই জন্য ধর্মের মধ্যে তাঁহাদের নিজ নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা রহিয়াছে।

৮০। আমি সত্যানুসন্ধিৎসু। সত্য কখনও মিথ্যার সহিত বন্ধুত্ব করিতে

পারে না। এমনকি সমস্ত পৃথিবী আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেও অবশেষে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

৮১। যেখানেই দেখিবে—মানবহিতৈষণার উদারভাবগুলি সাধারণ জনতার হাতে পড়িয়াছে, সেখানেই সর্বপ্রথমে তুমি লক্ষ্য করিবে, ঐগুলির অধোগতি ঘটিয়াছে। শিক্ষা এবং বুদ্ধি থাকিলেই কোন কিছুর সংরক্ষণের সম্ভাবনা থাকে। সমাজের কৃষ্টি-সম্পন্ন সম্প্রদায়ই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ও দর্শনের বিশুদ্ধতম রূপটি রক্ষা করিতে পারে। আর উহা হইতেই ঐ জাতির সামাজিক এবং মানসিক গতি-প্রকৃতির নিদর্শন পাওয়া যায়।

৮২। স্বামীজী একবার আমেরিকায় বলিলেন: আমি নূতন ধর্মমতে তোমাদের দীক্ষিত করিবার জন্য এখানে আসি নাই। আমি চাই তোমাদের স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস অটুট থাকুক। আমি একজন মেথডিষ্টকে ভাল মেথডিষ্ট, প্রেসব্রিটেরিয়ানকে ভাল প্রেসব্রিটেনিয়ান, ইউনিটেরিয়ানকে ভাল ইউনিটেরিয়ান করিতে চাই। আমি তোমাদিগকে শিখাইতে চাই—কি করিয়া সত্যকে জীবনে রূপায়িত করিতে হয়, কি করিয়া তোমাদের অন্তর্নিহিত জ্যোতিকে বাহিরে প্রকাশ করিতে হয়।

৮৩। দুঃখের রাজমুকুট মাথায় পরিয়া সুখ মানুষের সামনে হাজির হয়। যে তাহাকে স্বাগত জানায়, সে দুঃখকেও স্বাগত জানাইতে বাধ্য।

৮৪। যিনি সংসারের প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন এবং যিনি শান্তিকামী, এই পৃথিবীতে তিনিই মুক্ত—তিনিই মহৎ। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পাইয়াও কেহ যদি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র এবং বাসনার দাস হয়, তবে সে প্রকৃত মুক্তির বিশুদ্ধ আস্বাদ পাইতে পারে না।

৮৫। পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম। দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বরে এবং নিজ

আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ। বিভিন্ন শাস্ত্র শুধু ধর্মলাভের উপায় নির্দেশ করে।

৮৬। বিচারের সহায়ে সত্য যখন বুদ্ধিগ্রাহ্য হয়, তখন উহা অনুভূতির উৎস হৃদয়েই অনুভূত হয়। এইরূপে হৃদয় ও মস্তিষ্ক দুই-ই একক্ষণে আলোকিত হইয়া উঠে এবং তখনই উপনিষদের কথায় বলিতে গেলে—'ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ'—হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া যায়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়।

প্রাচীনকালে এই জ্ঞান ও এই ভাব যখন যুগপৎ ঋষির অন্তঃকরণে বিকশিত হইয়াছিল, তখনই শ্রেষ্ঠ সত্যগুলি কবিতার ভাষায় রূপায়িত হয় এবং তখনই বেদ এবং অন্যান্য শাস্ত্র রচিত হয়। এই কারণে এগুলি অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞান ও ভাবের দুইটি সমান্তরাল রেখা অবশেষে বেদের স্তরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে এবং ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে।

৮৭। বিশ্বপ্রেম, স্বাধীনতা, সাহসিকতা এবং নিঃস্বার্থ পরোপকার প্রভৃতি আদর্শগুলি আয়ত্ত করিবার জন্য বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র বিভিন্ন পথের সন্ধান দিয়াছে। কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পুণ্য—এই-বিষয়ে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায় প্রায়ই অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে দ্বিমত এবং সিদ্ধির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া এই পাপ ও পুণ্যের পথের বিষয়ে ঝগড়ায় মত্ত। প্রত্যেক পথই অল্প-বিস্তর উন্নতির পথে সাহায্য করে। গীতা বলেন, 'সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।' আগুন যেমন ধূমে আবৃত থাকে, সমস্ত কর্মের সঙ্গেই তেমনি দোষ মিশ্রিত থাকে। অতএব পথগুলি অল্প-বিস্তর অসম্পূর্ণ থাকিবেই, ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু নিজ নিজ শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ অনুসরণ করিয়া উচ্চতম ধর্মভাব লাভ করাই যখন আমাদের লক্ষ্য, তখন ঐগুলিকে অনুসরণ করার জন্যই আমাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। তাছাড়া ঐগুলিকে যুক্তি- ও বিচার-সহায়ে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমরা যতই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতে থাকিব, ততই পাপপুণ্য-সমস্যার সমাধান আপনা-আপনিই হইয়া যাইবে।

৮৮। আজকাল আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রের অর্থ ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা শুধু ব্রহ্ম, মায়া, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ শিখিয়া ঐগুলির দ্বারা মাথার মধ্যে গোলমাল বাধাইয়া তুলিয়াছেন।

শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম এবং উদ্দেশ্যকে ছাড়িয়া তাঁহারা কেবল শব্দ লইয়া মারামারি করেন। শাস্ত্র যদি সমস্ত লোককে সকল অবস্থায় সকল সময়ে সাহায্য করিতে না পারে, তবে সে শাস্ত্রের কি প্রয়োজন? শাস্ত্র যদি কেবল সন্ন্যাসীর জীবনের পথপ্রদর্শক হয়, যদি গার্হস্থ্য জীবনের কোন কাজে না আসে, তবে এই একদেশদর্শী শাস্ত্রে গৃহস্থের কি প্রয়োজন? যাঁহারা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছেন, শাস্ত্র যদি কেবল তাঁহাদের জন্যই হয়, শাস্ত্র যদি কর্ম-চঞ্চল পৃথিবীতে দৈনিক শ্রম, রোগ, শোক, দারিদ্র্যের মধ্যে, অনুশোচনাময় হতাশ হৃদয়ে, নিপীড়িতের আত্মগ্লানিতে, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতার মধ্যে, লোভে, ক্রোধে, সুখে, বিজয়ের আনন্দে, পরাজয়ের অন্ধকারে এবং অবশেষে মৃত্যুর ভয়াবহ মুহূর্তে মানুষকে আশার আলো জ্বালাইবার উপায় দেখাইতে না পারে, তবে দুর্বল মানুষের কাছে এই শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে শাস্ত্রের শাস্ত্রত্বই নষ্ট হইয়া যাইবে।

৮৯। ভোগের মধ্য দিয়াই কালে যোগ আসিবে। কিন্তু হায়, আমাদের দেশবাসীর ভাগ্য এমনি যে, যোগ আয়ত্ত করার কথা দূরে থাকুক, তাহারা সামান্য ভোগও পায় না। সর্বপ্রকার অপমান সহ্য করিয়া অতি কষ্টে তাহারা জীবনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজন মাত্র মিটাইতে সমর্থ হয়; তাহাও আবার সকলে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এমন দুরবস্থাও আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া আমাদিগকে আশু কর্তব্যের প্রতি সচেতন করিতে পারে না।

৯০। তোমাদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার জন্য তোমরা যতই আন্দোলন কর না কেন, স্মরণ রাখিও, যতদিন না তীব্র জাতীয় সম্মানবোধ জাগাইয়া আমরা সত্যসত্যই নিজেদের উন্নত করিতে পারিতেছি, ততদিন এই সুযোগ- ও অধিকার-লাভের আশা 'আলনাস্কারের দিবাস্বপ্নের' তুল্য।

৯১। যখন কোন বংশে কোন প্রতিভাবান্ বা বিশেষ বিভূতিমান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তখন সেই বংশে যা কিছু শ্রেষ্ঠ এবং সমধিক সৃজনশীল প্রতিভা থাকে, তাহা যেন ঐ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপুষ্টির জন্য নিঃশেষে তাঁহারই দিকে আকৃষ্ট হয়। এই কারণে আমরা দেখি, ঐ বংশে পরবর্তী

কালে যাহারা জন্মগ্রহণ করেন, তাহারা হয় নির্বোধ অথবা অতি সাধারণবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র এবং কালে ঐ বংশ বহুক্ষেত্রেই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

৯২। এই জীবনে যদি মুক্তিলাভ না হয়, তবে পরবর্তী এক বা বহু জীবনে যে মুক্তিলাভ ঘটিবে, তাহার প্রমাণ কি?

৯৩। আগ্রার তাজমহল দেখিতে গিয়া তিনি মন্তব্য করিলেন: ইহার যে-কোন এক-টুকরা মার্বেলকে নিঙড়াইলে ইহা হইতে বিন্দু বিন্দু রাজকীয় প্রেম ও দুঃখ ক্ষরিত হইবে। তিনি আরও বলিলেন: 'ইহার অন্তর্ভাগের এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানের সৌন্দর্য ঠিক ঠিক উপভোগ করিতে ছয় মাস লাগিবে।

৯৪ ভারতের প্রকৃত ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হইলে প্রমাণিত হইবে যে, যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি ললিতকলার ক্ষেত্রেও ভারত সমস্ত পৃথিবীর আদি গুরু।

৯৫। স্থাপত্য-সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন: লোকে বলে কলিকাতা প্রাসাদপুরী। কিন্তু বাড়িগুলি দেখিলে মনে হয় যেন কতকগুলি বাক্সকে উপর উপর সাজাইয়া রাখিয়াছে। এগুলি কোন বিশেষ ভাবের দ্যোতক নয়। প্রকৃত হিন্দু স্থাপত্য রাজপুতানায় এখনও অনেক দেখা যায়। কোন ধর্মশালার দিকে তাকাইলে মনে হইবে, উহা যেন মুক্ত বাহু প্রসারিত করিয়া যাত্রীকে আহ্বান জানাইতেছে—তাহারা সেখানে আশ্রয় ও আতিথেয়তা লাভ করিতে পারে। উহার ভিতরে ও বাহিরে দেবতার সান্নিধ্য অনুভব করিবে। গ্রাম্য কুটির দেখিলেও তৎক্ষণাৎ উহার বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে এবং বুঝিতে পারিবে যে, সমস্ত কুটিরটিই মালিকের নিজস্ব আদর্শ এবং প্রকৃতির দ্যোতক। ইতালী ব্যতীত অন্য কোন দেশে আমি এই জাতীয় ভাবব্যঞ্জক স্থাপত্যশিল্প দেখি নাই।

উক্তি-সঞ্চয়ন—২

১। স্বামীজীকে প্রশ্ন করা হইল, 'বুদ্ধের মত কি এই যে, বহুত্ব সত্য এবং একত্ব (আত্মা) মিথ্যা ? আর হিন্দু (বেদ) মতে তো একত্বই সত্য, বহুত্ব মিথ্যা।' স্বামীজী বলিলেন: হ্যাঁ, এবং ইহার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এবং আমি যাহা যোগ করেছি, তা এই যে, একই নিত্য বস্তু একই মনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে অনুভূত হয়ে এক ও বহুরূপে প্রতিভাত হয়।

২। একবার এক শিষ্যকে বলিলেন: মনে রাখিও জীবাত্মারই বিকাশের জন্য প্রকৃতি, প্রকৃতির জন্য জীবাত্মা নয়—ইহাই হইল ভারতের শাশ্বত বাণী।

৩। পৃথিবী আজ চায় এমন কুড়িজন নর-নারী, যাহারা সামনের ঐ পথে সাহসভরে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে যে, ভগবান্ ব্যতীত তাহাদের অন্য কোন সম্বল নাই। কে আসিবে ? কেন, ইহাতে ভয় কি ? যদি এটি সত্য হয়, তবে আর কিসের প্রয়োজন ? আর যদি এটি সত্য না হয়, তবে আমাদের বাঁচিয়া কি লাভ ?

৪। আহা, পরমাত্মার স্বরূপ যিনি জানিয়াছেন, তাঁহার কাজ কতই না শান্ত! বাস্তবিকপক্ষে লোকের দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া ছাড়া তাঁহাদের অন্য কিছু করণীয় থাকে না। আর যাহা কিছু, তাহা আপনিই হইতে থাকে।

৫। তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এক মহৎ জীবন যাপন করিয়াই তৃপ্ত ছিলেন এবং সেই জীবনের তাৎপর্য-নির্ণয়ের ভার দিয়া গিয়াছেন অপর সকলের উপর।

৬। একজন শিষ্য কোন একটি বিষয়ে স্বামীজীকে সংসারের অভিজ্ঞতা-সম্ভূত পরামর্শ দিলে স্বামীজী বিরক্তির সহিত বলিলেন: পরিকল্পনা আর পরিকল্পনা! এই জন্যই পাশ্চাত্যবাসীরা কখনও কোন ধর্মমত গঠন করিতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কখন পারিয়া থাকে, তবে তাহা কয়েকজন ক্যাথলিক সন্ন্যাসী মাত্র, যাহাদের পরিকল্পনা বলিতে কিছু ছিল না। পরিকল্পনাকারীদের দ্বারা কখনও ধর্মপ্রচার হয় নাই।

৭। পাশ্চাত্যের সমাজ-জীবন দেখিতে একটি হাসির হুল্লোড়ের মতো, কিন্তু একটু নীচেই উহা কান্নায় ভরা। ইহার শেষ হয় হতাশ ক্রন্দনে। কৌতুক উচ্ছলতা সবই সমাজের উপর উপর, বাস্তবিকপক্ষে ইহা বিষাদে পূর্ণ। এদেশে (ভারতে) আবার বাহিরে হয়তো নিরানন্দ ও বিষাদ, কিন্তু ভিতরে গাম্ভীর্য, নিশ্চিন্ততা ও আনন্দ।

আমাদের একটি মতবাদ আছে—ঈশ্বর স্বয়ংই লীলাচ্ছলে নিজেকে জীব-জগতে রূপান্তরিত করিয়াছেন এবং এই সংসারে অবতারেরা লীলাচ্ছলে দেহ-ধারণ করিয়া জীবন যাপন করেন। সবটাই লীলা, সবই খেলা। যীশু ক্রুশ-বিদ্ধ হইয়াছিলেন কেন? সেটাও সম্পূর্ণ খেলা। মানব-জীবনের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। উহাও ঈশ্বরের সঙ্গে ক্রীড়ামাত্র। বলো, 'সবই লীলা, সবই খেলা।' খেলা ছাড়া তুমিও আর কিছু কর কি?

৮। আমি এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছি যে, এক জীবনেই কেহ নেতা হইয়া উঠিতে পারে না। তাহাকে শক্তি লইয়াই জন্মাইতে হয়। কারণ সংগঠন বা পরিকল্পনা তেমন কষ্ট-সাধ্য নয়। নেতার পরীক্ষা—প্রকৃত পরীক্ষা হয় বিভিন্ন ব্যক্তিকে তাহাদের সাধারণ সহানুভূতির সূত্র ধরিয়া, সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখার ক্ষমতায়। চেষ্টা করিয়া নয়, অজ্ঞাতসারেই ইহা হইয়া থাকে।

৯। প্লেটোর ভাববাদ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'তাহা হইলে তোমরা দেখিতেই পাইতেছ যে, বড় বড় ভাবগুলির ক্ষীণতম বিকাশ এই-সব যাহা কিছু। ঐ ভাবগুলিই সত্য এবং সম্পূর্ণ। একটি আদর্শ 'তুমি' কোথাও আছে এবং সেইটি জীবনে রূপায়িত করার জন্যই এখানে তোমার যত চেষ্টা। চেষ্টা হয়তো অনেক দিক দিয়াই ক্রটিপূর্ণ হইবে, তবু চেষ্টা করিয়া যাও। একদিন না একদিন সে আদর্শ রূপায়িত হইবে।'

১০। জনৈকা শিষ্যা নিজের ভাব ব্যক্ত করিয়া মন্তব্য করিলেন, ব্যক্তিগত মুক্তি—জীবন হইতে নিষ্কৃতি পাইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা অপেক্ষা যে-সকল উদ্দেশ্য সাধন করা আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, সেইগুলি সম্পাদন করার জন্য বার-বার সংসারে ফিরিয়া আসা আমি ভাল বলিয়া মনে করি। ইহাতে স্বামীজী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠলেন, 'ইহার কারণ তুমি উন্নতি করিবার ধারণার ঊর্ধ্বে উঠিতে পার না; কিন্তু কোন জিনিসই উন্নততর হয় না।

ঐগুলি যেমন তেমনই থাকে। ঐগুলির রূপান্তর ঘটাইয়া শুধু আমরাই উন্নততর হই।'

১১। আলমোড়াতে একজন বয়স্ক লোক স্বামীজীর নিকট আসিলেন। তাঁহার মুখে এমন একটা পরনির্ভরতার ভাব ছিল, যাহা দেখিলেই সহানুভূতি জাগে। তিনি কর্মবাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন, 'যাহারা নিজ কর্মদোষে দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার দেখিতে বাধ্য হয়, তাহাদের কর্তব্য কি?' স্বামীজী ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'কেন, সবলকে ঠেঙাইবে, আবার কি? এই কর্মবাদের মধ্যে তোমার নিজের অংশটা তুমি ভুলিয়া যাইতেছ। মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার—বিদ্রোহ করার অধিকার তোমার সব সময়ই আছে।'

১২। একজন স্বামীজীকে প্রশ্ন করিলেন, 'সত্যের জন্য কি মানুষের মৃত্যুকেও বরণ করা উচিত, অথবা গীতার শিক্ষা অনুসারে সর্বদা উদাসীন থাকিতে চেষ্টা করা উচিত?' স্বামীজী ধীরে ধীরে অনেকক্ষণ থামিয়া থামিয়া বলিলেন, 'আমি উদাসীন থাকার পক্ষপাতী।' তারপর আবার বলিলেন, 'এটি সন্ন্যাসীর জন্য; গৃহীদের পথ আত্মরক্ষা।'

১৩। সবাই সুখ চায়—এ-কথা ভুল। প্রায় সমসংখ্যক লোক জন্মায় দুঃখকে বরণ করার জন্য। এস, আমরা ভয়ঙ্করকে ভয়ঙ্কর হিসাবেই পূজা করি।

১৪। আজ পর্যন্ত রামকৃষ্ণ পরমহংসই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন: ঠিক যে-ভাষায় অপরে কথা বলে ও যে-ভাষা বোঝে, তাহার সহিত সেই ভাষাতেই কথা বলা উচিত।

১৫। নিজ জীবনে কালীকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার পূর্বে তাঁহার সন্দেহ-বিজড়িত দিনগুলিকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন, 'কালী ও কালীর সর্বপ্রকার কার্যকলাপকে আমি কতই না অবজ্ঞা করিয়াছি! আমার ছ বছরের মানসিক দ্বন্দ্বের কারণ ছিল এই যে, আমি তাঁহাকে মানিতাম না। কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে আমায় মানিতে হইয়াছে। রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাকে তাঁহার কাছে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং এখন আমার বিশ্বাস

যে, সব কিছুতেই মা-কালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাঁহার যা ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। তবু আমি কতদিনই না তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি। আসল কথা এই, আমি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসিতাম, তাহাই আমাকে ধরিয়া রাখিত। আমি তাঁহার অপূর্ব পবিত্রতা দেখিয়াছি। আমি তাঁহার আশ্চর্য ভালবাসা অনুভব করিয়াছি। তখনও পর্যন্ত তাঁহার মহত্ত্ব আমার নিকট প্রতিভাত হয় নাই। পরে যখন আমি তাঁহার কাছে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দিলাম, তখন ঐ ভাব আসিয়াছিল। তাহার পূর্বে আমি তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক একটি শিশু বলিয়া ভাবিতাম, মনে করিতাম—এই জন্যই তিনি সর্বদা অলৌকিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখেন। এগুলি আমি ঘৃণা করিতাম। তারপর আমাকেও মা-কালী মানিতে হইল। না, যে কারণে আমাকে মানিতে হইল, তাহা একটি গোপন রহস্য, এবং উহা আমার মৃত্যুর সঙ্গেই লুপ্ত হইবে। সে-সময় আমার খুবই ভাগ্য-বিপর্যয় চলিতেছিল।...ইহা আমার জীবনে এক সুযোগ হিসাবে আসিয়াছিল। মা (কালী) আমাকে তাঁহার ক্রীতদাস করিয়া লইলেন। এই কথাই বলিয়াছিলাম, 'আমি তোমার দাস।' রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন। অদ্ভুত ব্যাপার! এই ঘটনার পর তিনি মাত্র দুই বছর জীবিত ছিলেন এবং ঐ কালের অধিকাংশ সময়ই অসুস্থ ছিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তাঁর স্বাস্থ্য এবং লাবণ্য নষ্ট হইয়া যায়।

তোমরা জানো, গুরু নানকও এই রকম এমন একজন শিষ্যের খোঁজ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে তিনি তাঁহার শক্তির উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে পারেন। তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের কাহাকেও উপযুক্ত মনে করিলেন না। তাঁহার সন্তানসন্ততিরা তাঁহার কাছে অত্যন্ত অযোগ্য বলিয়া মনে হইল। তারপর তিনি এক বালকের সন্ধান পাইলেন, তাহাকে ঐ শক্তি দিয়া দিলেন, এবং দেহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তোমরা বলিতেছ, ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে কালীর অবতার বলা হইবে কি? হাঁ, আমিও মনে করি, কালী তাঁহার কার্য সম্পাদনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দেহযন্ত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন। দেখ, আমার পক্ষে ইহা বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই যে, কোথাও এমন এক বিরাট শক্তি নিশ্চয়

আছেন, যিনি নিজেকে কখন কখন নারীরূপে কল্পনা করেন এবং তাঁহাকে লোকে 'কালী' এবং 'মা' বলিয়া ডাকে। আমি ব্রহ্মেও বিশ্বাস করি। আর আসল ব্যাপারটা কি সব সময় ঠিক ঐরূপই নয়?...যেমন সংখ্যাতীত জীব-কোষের সমষ্টিতেই ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়, যেমন একটি নয়—বহু মস্তিষ্ক-কোষের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়, ঠিক তেমনি নয় কি? একত্ব মানেই বৈচিত্র্য। ইহাও ঠিক সেইরকম। ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বা ভিন্ন ব্যবস্থা কেন? ব্রহ্মই আছেন, তিনিই একমাত্র সত্তা, কিন্তু তবু তিনিই আবার বহু দেবতাও হইয়াছেন।

১৬। যতই বয়স বাড়িতেছে, ততই মনে হয়, বীরত্বের উপরই সব কিছু নির্ভর করে। ইহাই আমার নূতন বাণী।

১৭। 'কোন কোন সমাজে নরমাংস-ভোজন স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার অঙ্গীভূত'—ইওরোপে এই মতের উল্লেখ শুনিয়া স্বামীজী মন্তব্য করিলেন: এটা কি সত্য নয় যে, যুদ্ধে হিংসার বশবর্তী হইয়া বা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ছাড়া কোন জাতিই কখনও নরমাংস ভোজন করে না? তোমরা কি ইহা বুঝিতে পার না? সমাজবদ্ধ প্রাণীদের ইহা রীতি নয়, কারণ ইহাতে সমাজ-জীবনের মূলোচ্ছেদ হইবে।

১৮। মৃত্যু বা কালীকে উপাসনা করিতে সাহস পায় কয়জন? এস, আমরা মৃত্যুর উপাসনা করি। আমরা যেন ভীষণকে ভীষণ জানিয়াই আলিঙ্গন করি—তাহাকে যেন কোমলতর হইতে অনুরোধ না করি, আমরা যেন দুঃখের জন্যই দুঃখকে বরণ করি।

১৯। পাঁচ-শ বছর নীতির অনুশাসন, পাঁচ-শ বছর মূর্তিপূজা এবং পাঁচ-শ বছর তন্ত্রের প্রাধান্য—বৌদ্ধধর্মের এই তিনটি যুগ। তোমরা যেন কখনও না ভাবো যে, ভারতে বৌদ্ধধর্ম নামে এমন কোন ধর্মমত ছিল, যাহার স্বতন্ত্র ধরনের মন্দির, পুরোহিত প্রভৃতি ছিল; এ-রকম কোন কিছুই ছিল না। বৌদ্ধধর্ম সব সময়ই হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত ছিল। কেবল কোন এক সময়ে বুদ্ধের প্রভাব বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সমস্ত জাতিতে সন্ন্যাসের প্রাধান্য ঘটিয়াছিল।

২০। যাঁহারা প্রাচীনপন্থী, তাঁহাদের দৃষ্টিতে আদর্শ বলিতে শুধু আত্ম-সমর্পণই বুঝায়। কিন্তু তোমাদের আদর্শ হইল সংগ্রাম। ফলে জীবনকে উপভোগ করি আমরাই, তোমরা কখনই পার না। তোমরা সব সময় আরও ভালো কিছুর জন্য তোমাদের জীবনকে পরিবর্তিত করিতে সচেষ্ট, কিন্তু ঈপ্সিত পরিবর্তনের লক্ষ ভাগের এক ভাগ সাধিত হওয়ার আগেই তোমরা মরিয়া যাও। পাশ্চাত্যের আদর্শ হইল—কোন কিছু করা এবং প্রাচ্যের আদর্শ হইল—সহ্য করা। 'করা' এবং 'সহ্য করা'—এই দুইয়ের অপূর্ব সমন্বয়েই পূর্ণ জীবন গড়িয়া উঠিবে, কিন্তু তাহা কখনও সম্ভব নয়।

আমাদের সমাজে এটা স্বীকৃত সিদ্ধান্ত যে, মানুষের সব আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হওয়া সম্ভব নয়। সেজন্যই আমাদের জীবন অনেক বিধি-নিষেধের অধীন। এগুলি সৌন্দর্যহীন মনে হইলেও ইহা শক্তি- ও আলোক-প্রদ। আমাদের সমাজের উদারপন্থীরা সমাজের শুধু কুৎসিত দিকটা দেখিয়া ইহাকে দূরে বর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে যাহা প্রবর্তন করিলেন, তাহা তেমনই খারাপ। তারপর নূতন প্রথাগুলির শক্তি লাভ করিতে পুরাতন প্রথাগুলির মতোই দীর্ঘ সময় লাগিবে।

পরিবর্তন করিলেই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ় হয় না, বরং উহা দুর্বল ও পরিবর্তনের অধীন হইয়া পড়ে। তবে আমাদের সব সময়েই গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিজস্ব করিয়া লওয়ার মধ্য দিয়াই ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তর হয়। আর পৃথিবীতে ইচ্ছাশক্তিই একমাত্র বস্তু, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা ইহার প্রশংসা করিয়া থাকি। সতীদাহ-প্রথায় সতীগণ সকলের প্রশংসা অর্জন করেন, যেহেতু এই প্রথার ভিতর দিয়া দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি প্রকাশ পায়।

স্বার্থপরতা দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। জীবনে যখনই কোন ভুল করিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, তাহার মূল কারণ হইল আমি আমার স্বার্থবুদ্ধিকে উহার মধ্যে আনিয়াছিলাম। যেখানে আমার স্বার্থ ছিল না, সেখানে আমার সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইয়াছে।

স্বার্থবুদ্ধি না থাকিলে কোন ধর্মমতই গড়িয়া উঠিত না। মানুষের নিজের জন্য কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে তোমরা কি মনে কর যে, তাহার এই-সব প্রার্থনা উপাসনা প্রভৃতি থাকিত? হয়তো বা কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য বা অপর কিছু দেখিয়া কখন কখন সামান্য একটু স্তুতি করিত, ইহা ছাড়া সে

ঈশ্বরের কথা কখনও ভাবিত না। সর্বদা ভগবানের স্তুতি ও প্রার্থনায় রত থাকাই তো উচিত। কিন্তু হায়! আমরা যদি এই স্বার্থবুদ্ধি ছাড়িতে পারিতাম!

যুদ্ধ-বিগ্রহ অগ্রগতির লক্ষণ—এই কথা যখনই ভাবো, তখনই তুমি সম্পূর্ণ ভুল কর। ব্যাপারটি মোটেই ঐ রকম নয়। অগ্রগতির লক্ষণ—গ্রহণশীলতা। কোন কিছুকে গ্রহণ করিয়া নিজস্ব করিয়া লওয়া হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। যুদ্ধ-বিগ্রহ লইয়া আমরা কখনও মাথা ঘামাইতাম না। অবশ্য আমাদের নিজ বাসভূমি রক্ষার জন্য কখন কখন অস্ত্রধারণ করিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু যুদ্ধকে নীতিহিসাবে কোনদিনই আমরা গ্রহণ করি নাই। প্রত্যেক জাতিকেই ইহা শিখিতে হইয়াছে। অতএব নবাগত জাতিগুলি কিছুদিন ঘুরপাক খাইতে থাকুক, অবশেষে সকলেই হিন্দু-ধর্মের (ভাবের) অঙ্গীভূত হইয়া পড়িবে।

২১। কেবল মানুষ নয়, সমস্ত জীবাত্মার সমষ্টিই হইলেন সগুণ ঈশ্বর। সমষ্টির ইচ্ছাকে কিছুই রোধ করিতে পারে না। নিয়ম বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এই ; ইহাকেই আমরা শিব, কালী বা অন্য নামে ব্যক্ত করি।

২২। ভীষণের পূজা কর, মৃত্যুর উপাসনা কর। বাকী সবই বৃথা ; সমস্ত চেষ্টাই বৃথা। ইহাই শেষ উপদেশ। কিন্তু ইহা কাপুরুষের এবং দুর্বলের মৃত্যুবরণ নয় বা আত্মহত্যাও নয়—ইহা শক্তিমান্ পুরুষের মৃত্যুবরণ, যিনি সব কিছুর অন্তরতম প্রদেশ খুঁজিয়া দেখিয়াছেন ও জানিয়াছেন যে, ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন সত্য নাই।

২৩। যাহারা তাহাদের কুসংস্কারগুলি আমাদের দেশবাসীর ঘাড়ে চাপাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের সঙ্গে আমি একমত নই। মিশর-তত্ত্ববিদ্-গণের মিশরের প্রতি কৌতূহল পোষণ করার মতো ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও লোকের কৌতূহল পোষণ করা সহজ, কিন্তু উহা স্বার্থ-প্রণোদিত।

কেহ কেহ হয়তো প্রাচীন গ্রন্থে, গবেষণাগারে বা স্বপ্নে ভারতবর্ষকে যেমন দেখিয়াছেন, তাহাকে আবার সেইভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন। আমি সেই ভারতকেই আবার দেখিতে চাই, যে-ভারতে প্রাচীন যুগে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ভাব ছিল, তাহার সহিত বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ভাবগুলি স্বাভাবিকভাবে

মিলিত হইয়াছে। এই নূতন অবস্থার সৃষ্টি ভিতর হইতেই হইবে, বাহির হইতে নয়।

সেজন্য আমি কেবল উপনিষদ্ই প্রচার করি। তোমরা লক্ষ্য করিবে যে, আমি কখনও উপনিষদ্ ছাড়া অন্য কিছু আবৃত্তি করি না। আবার উপনিষদের যে-সব বাক্যে শক্তির কথা আছে, সেগুলিই বলি। শক্তি—এই একটি শব্দের মধ্যেই বেদ-বেদান্তের মর্মার্থ রহিয়াছে। বুদ্ধের বাণী ছিল অপ্রতিরোধ বা অহিংসা; কিন্তু আমার মতে সেই অহিংসা শিক্ষা দেওয়ার জন্য শক্তির ভাব একটি উন্নততর উপায়। অহিংসার পিছনে আছে একটি ভয়ঙ্কর দুর্বলতা; দুর্বলতা হইতেই প্রতিরোধের ভাবটি আসে। আমি সমুদ্রের একটি জল-কণিকার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার বা ইহাকে এড়াইবার কথা কখনও চিন্তা করি না। আমার নিকট 'এটা কিছুই নয়, কিন্তু একটা মশার কাছে এটা বিপজ্জনক। সব রকম হিংসার ব্যাপারেই এই একই কথা—শক্তি এবং নির্ভীকতা। আমার আদর্শ সেই মহাপুরুষ, যাঁহাকে লোকে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হত্যা করিয়াছিল এবং যিনি বুকে ছুরিকাহত হইলে মৌন ভঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমিও তিনিই।'

তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারো—এই চিন্তাধারায় রামকৃষ্ণের স্থান কোথায়? তাঁহার ছিল এক অদ্ভুত জীবন, এক অত্যাশ্চর্য সাধনা, যাহা অজ্ঞাতসারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি নিজেও তাহা জানিতেন না। তিনি ইংলণ্ড বা ইংলণ্ডবাসীদের সম্বন্ধে—তাহারা সমুদ্রপারের এক অদ্ভুত জাতি—এইটুকু ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। কিন্তু তিনি এক মহৎ জীবন দেখাইয়া গিয়াছেন এবং আমি তাহার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিতেছি। কোনদিন কাহারও একটি নিন্দাবাদ তিনি করেন নাই। একবার আমি আমাদের দেশের এক ব্যভিচারী সম্প্রদায়ের সমালোচনা করিতেছিলাম। আমি তিন ঘণ্টা ধরিয়া বকিয়া গেলাম, কিন্তু তিনি শান্তভাবে সব শুনিলেন। আমার বলা শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন, 'তাই না হয় হ'ল, প্রত্যেক বাড়িরই তো একটা খিড়কির দরজা থাকতে পারে; তা কে জানে?'

আজ পর্যন্ত যত ভারতীয় ধর্ম হইয়াছে, সেগুলির দোষ এই যে, ধর্মগুলিতে দুটি কথা স্থান পাইয়াছে—ত্যাগ ও মুক্তি। জগতে কেবল মুক্তিই চাই! গৃহীদের জন্য কি কিছুই বলিবার নাই? কিন্তু আমি গৃহীদের সাহায্য করিতে

চাই। সকল আত্মাই কি সমগুণসম্পন্ন নয়? সকলেরই লক্ষ্য কি এক নয়? সুতরাং শিক্ষার মধ্য দিয়া জাতির ভিতর শক্তির স্ফুরণ হওয়া আবশ্যক।

২৪। হিন্দুধর্মের সু-উচ্চ ভাবগুলি জনতার কাছে পৌঁছিয়া দিবার চেষ্টা হইতেই পুরাণগুলির উৎপত্তি। ভারতবর্ষে একজনই মাত্র এই প্রয়োজন অনুভব করিয়াছিলেন—তিনি শ্রীকৃষ্ণ, এবং সম্ভবতঃ তিনি মানবেতিহাসে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।

এইরূপে এমন একটি ধর্মের উৎপত্তি হইল, যাহা ক্রমে বিষ্ণুর উপাসনাতে পর্যবসিত হয় এবং ঐ উপাসনাতে আমাদের জীবন-রক্ষা ও সাংসারিক সুখ-ভোগকেও ভগবান্ লাভের উপায়রূপে স্বীকার করা হইয়াছে। আমাদের দেশের শেষ ধর্ম-আন্দোলন হইল শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদ। তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে, ঐ মতবাদেও ভোগের কথা আছে। অন্যদিকে জৈনধর্ম আবার আর একটি বিপরীত চরমভাবের দৃষ্টান্ত। ইহাতে আত্মনিগ্রহের দ্বারা ধীরে ধীরে শরীর ধ্বংস করা হয়। অতএব তোমরা দেখিতে পাইতেছ, বৌদ্ধধর্ম হইল জৈনধর্মেরই এক সংস্কৃত রূপ এবং বুদ্ধ যে পাঁচজন তপস্বীর সঙ্গ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রকৃত অর্থ ইহাই। একদিকে চরম কৃচ্ছ্রতা, অপরদিকে সম্ভোগ—এই-সব বিভিন্ন স্তরের দৈহিক সাধনায় রত ধর্মসম্প্রদায়-সমূহ ভারতবর্ষে প্রত্যেক যুগে একের পর এক আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সেই-সব যুগেই আবার এমন কতকগুলি দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, যাহাদের কেহ বা ঈশ্বর-লাভের উপায়স্বরূপ ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়োজিত করিয়াছে আবার কেহ বা উহারই জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে ধ্বংস করিতে উদ্যত। এইভাবে দেখা যায়, হিন্দুধর্মের মধ্যে সর্বদাই যেন দুটি বিপরীত সর্পিলগতি সিঁড়ি (spiral staircase) একই অক্ষ-অবলম্বনে কখন বা ঊর্ধ্বগামী, কখন বা অধোগামী হইয়া পরস্পরের অভাব পূরণ করিয়া চলিয়াছে।

হাঁ, বৈষ্ণবধর্মের মতে তুমি যাহা কিছু করিতেছ সবই ভাল, তোমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্বামী এবং সন্তানের প্রতি এই যে তীব্র ভালবাসা, ইহার সবই ভালো। এগুলির সবই ঠিক, যদি তুমি ভাবিতে পারো যে, কৃষ্ণই তোমার সন্তান, আর সন্তানকে যখন কোন খাবার দাও,

তখন যদি ভাবিতে পারো যে, তুমি কৃষ্ণকেই খাওয়াইতেছ। এই ছিল চৈতন্যের বাণী—'সব ইন্দ্রিয় দিয়ে তুমি ঈশ্বরেরই পূজা কর।' ইহার বিপরীত ভাব বেদান্তে বলা হইয়াছে—ইন্দ্রিয়কে সংযত কর, ইন্দ্রিয়কে প্রতিহত কর।

আমার দৃষ্টিতে ভারত যেন নবযৌবনসম্পন্ন এক জীবন্ত প্রাণী বিশেষ, ইওরোপও যৌবনশালী এবং জীবন্ত। দুইটির কোনটিই তাহাদের উন্নতির এমন স্তরে আসিয়া পৌছায় নাই, যেখানে আমরা নির্বিবাদে তাহাদের সমাজের ব্যবস্থাগুলি সমালোচনা করিতে পারি। উভয়েই দুই বিরাট পরীক্ষার মধ্য দিয়া চলিতেছে। কোন পরীক্ষাই এখনও সম্পূর্ণ নয়। ভারতে আমরা পাই সামাজিক সাম্যবাদ, যাহা অদ্বৈতের আধ্যাত্মিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত [প্রত্যেকের ভিতরে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন]। ইওরোপে সামাজিক দৃষ্টিতে তোমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী, কিন্তু তোমাদের চিন্তাধারা দ্বৈতমূলক [ব্যক্তি-কল্যাণ চাহিলেও তোমরা সেই সঙ্গে সমাজ-কল্যাণ চাহিতেছ] অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে সাম্যবাদী।

অতএব দেখা যাইতেছে, একদিকে আছে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের বেড়া দেওয়া সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং অপর দিকে সাম্যবাদের বেড়া দেওয়া ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যমূলক সমাজ।

এখন ভারতীয় পরীক্ষা যে-ধারায় চলিতেছে, ঠিক সেই ভাবেই চলিতে আমরা ইহাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিব। যে-সমস্ত আন্দোলন কোন বিষয়-বস্তুকে ঠিক তাহারই দিক হইতে সাহায্য না করে, সেগুলি সেই হিসাবে ভাল নয়। উদাহরণ হিসাবে ইওরোপে বিবাহ করা এবং বিবাহ না করা—এই উভয় ব্যবস্থার প্রতিই আমি গভীর শ্রদ্ধাশীল। ভুলিয়া যাইও না, মানুষের জীবনকে মহৎ এবং সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে গুণগুলি যতটা কাজে লাগে, দোষগুলিও ঠিক ততটা লাগে। অতএব যদি ইহা প্রমাণিতও হয় যে, কোন জাতির চরিত্রে কেবল দোষই আছে, তবুও আমরা যেন ঐ জাতির বিশেষত্বকে একেবারে উড়াইয়া না দিই।

২৫। তোমরা হয়তো বলিতে পারো যে, প্রতিমা বস্তুতঃ ঈশ্বর।

কিন্তু ভগবান্‌কে শুধু প্রতিমা বলিয়া ভাবিও না (ভাবারূপ ভুলটি সর্বদাই এড়াইয়া চলিতে হইবে)।

২৬। একবার হটেনটটদের জড়োপাসনাকে নিন্দা করার জন্য স্বামীজীকে অনুরোধ করা হইল। তিনি উত্তর দিলেন—জড়োপাসনা বলিতে কি বুঝায়, আমি জানি না। তখন দ্রুত বিবরণ-সাহায্যে তাঁহার সামনে একটি বীভৎস চিত্র হাজির করিয়া দেখানো হইল, কিরূপে একই বস্তুকে পর্যায়ক্রমে পূজা, প্রহার এবং স্তবস্তুতি করা হয়। তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'আমিও তো এই রকম'। কিছুটা বাদেই অবহেলিত এই লোকগুলির প্রতি তাহাদের অসাক্ষাতে এইরূপ অবিচারে ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া তিনি বলিতে লগিলেন, 'তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না, তোমরা কি দেখিতেছ না যে, জড়োপাসনা বলিয়া কিছুই নাই ? দেখ, তোমাদের হৃদয় কঠিন হইয়া গিয়াছে, তাই তোমরা বুঝিতে পার না যে, শিশুরা যাহা করে, তাহাই ঠিক। শিশুরা সব কিছুকেই জীবন্ত দেখে। জ্ঞানী হইয়া আমরা শিশুর সেই দৃষ্টি হারাইয়া ফেলি। অবশেষে উচ্চতর জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা আবার সেই দৃষ্টি ফিরিয়া পাই। পাহাড়, কাঠ, গাছ এবং অন্যান্য সব কিছুর মধ্যেই সে একটা জীবন্ত শক্তি দেখে। আর ইহাদের পিছনে কি সত্যই একটা জীবন্ত শক্তি নাই ? ইহা প্রতীকোপাসনা, জড়োপাসনা নয়। বুঝিলে কি ? সুতরাং ভগবানের নামই সব—তোমরা কি ইহা বুঝ না ?'

২৭। একদিন তিনি সত্যভামার ত্যাগ সম্বন্ধে গল্পটি বলতে গিয়ে বললেন, কিভাবে একটুকরা পত্রের ওপর 'কৃষ্ণ' কথাটি লিখে দাঁড়িপাল্লায় দিয়ে এবং অপর দিকে কৃষ্ণকে বসিয়ে দেওয়ার ফলে দাঁড়িপাল্লা কৃষ্ণনামের দিকে নেমে গিয়েছিল। তিনি আবার বললেন, গোঁড়া হিন্দুদের কাছে শ্রুতিই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ—সব কিছু। এই জিনিসটি হচ্ছে পূর্ব থেকে অস্তিত্ববান্ একটি চিরন্তন ভাবের সামান্য বিকাশমাত্র। ঈশ্বর নিজেই এই অনন্ত মনে এই ভাবের একটি স্থূল প্রকাশ। তুমি যে ব্যক্তি, এর চেয়ে তোমার নাম অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর অপেক্ষাও ঈশ্বরের নাম বড়। অতএব বাক্-সংযম কর।

২৮। আমি গ্রীকদের দেবতা মানি না। কেন না, তারা মানুষ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেবল তাঁদেরই পূজা-উপাসনা করা উচিত, যাঁরা ঠিক

আমাদেরই মতো, কিন্তু আমাদের অপেক্ষা মহত্তর। আমার ও দেবতাদের মধ্যে যে ব্যবধান, তা গুণগত তারতম্য মাত্র।

২৯। একটি পাথর পড়ে একটি কীটকে গুঁড়িয়ে দিল। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি, সমস্ত পাথরখণ্ডই পড়ে গেলে কীটদের গুঁড়িয়ে দেয়। এই রকম একটি যুক্তি কেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ ক'রব? অভিজ্ঞতা একটি ক্ষেত্রেই হয়েছে, কিন্তু মনে কর—এটি একবারই মাত্র হ'ল। একটি শিশুকে শূন্যে ছুঁড়ে দাও, সে কেঁদে উঠবে। এটা পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতা? কিন্তু ভবিষ্যতে আমরা কিভাবে এর প্রয়োগ ক'রব? এর কারণ—কতগুলি জিনিসের মধ্যে একটি প্রকৃত সম্পর্ক—একটি ব্যাপ্তি-শীলতা থাকে। আমাদের শুধু দেখতে হয় যে, গুণ দৃষ্টান্তের চেয়ে খুব বেশী বা কম না হয়ে পড়ে। এই পার্থক্য নিরূপণের উপরই সব মানবিক জ্ঞান নির্ভর করে। [উহাতে যাতে কোনরূপ অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি-দোষ না থাকে]।

ভ্রমাত্মক কোন বিষয় সম্বন্ধে এইটুকু স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যক্ষানুভূতি তখনই প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হ'তে পারে, যদি প্রত্যক্ষ অনুভব যে-যন্ত্রের মাধ্যমে হয়েছে, সেই যন্ত্রটি, অনুভবের পদ্ধতি এবং উহার স্থায়িত্ব-কালের পরিমাপ বিশুদ্ধ হয়। শারীরিক রোগ বা কোনরূপ ভাবপ্রবণতা এই পর্যবেক্ষণকে ভ্রমপূর্ণ করতে পারে। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান সিদ্ধান্তে পৌছবার একটি উপায় মাত্র। সুতরাং সব রকম মানবিক জ্ঞান, যাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, তা অনিশ্চিত এবং ত্রুটিপূর্ণ। প্রকৃত সাক্ষী কে? বিষয়টি যার প্রত্যক্ষ-গোচর হয়েছে। বেদসমূহ সত্য, কেন-না এইগুলি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিগণের বা আপ্তপুরুষগণের প্রত্যক্ষজ্ঞানের সাক্ষ্য-বিবরণ কিন্তু এই প্রত্যক্ষ অনুভবের শক্তি কি কোন ব্যক্তির বিশেষ ক্ষমতায় সীমাবদ্ধ? না। ঋষি, আর্য এবং ম্লেচ্ছ সবারই সমভাবে এই জ্ঞান হ'তে পারে। নব্যন্যায়ের অভিমত এই যে, এইরূপ আপ্তপুরুষের বাক্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অন্তর্গত, উপমা বা হেত্বাভাস যথার্থ অনুমানের সহায়ক নয়। সুতরাং প্রকৃত প্রমাণ বলতে আমরা দুটি জিনিস পাই—প্রত্যক্ষজ্ঞান এবং অনুমান।

একদল লোক আছে, যাহারা বহিঃপ্রকৃতির বিকাশকেই প্রাধান্য দেয়,

আবার অপরদল অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশকে। কোন্‌টি আগে—ডিমের আগে পাখি, না পাখির আগে ডিম? পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র? এই সমস্যার কোন মীমাংসা নেই। ছেড়ে দাও এ-সব। মায়া থেকে বেরিয়ে এস।

৩০। জগৎ না থাকলেই বা আমার কি? আমার মতে তা হ'লে তো খুব চমৎকার হবে! কিন্তু বাস্তবিক যা কিছু আমার প্রতিবন্ধক, সে-সবই শেষে আমার সহিত মিলিত হবে। আমি কি তাঁর (কালীর) সৈনিক নই?

৩১। হ্যাঁ, একজন বিরাট পুরুষের অনুপ্রেরণাতেই আমার জীবন পরিচালিত হচ্ছে, কিন্তু তাতে কি? প্রেরণা জিনিসটা এই পৃথিবীতে কোন এক জনের মাধ্যমে আসেনি। এটা সত্য যে, আমি বিশ্বাস করি—শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রত্যাদিষ্ট (দ্রষ্টা) পুরুষ ছিলেন, সুতরাং আমি নিজেও তা হ'লে প্রত্যাদিষ্ট হব এবং তোমরাও, তোমাদের শিষ্যেরাও হবে, তারপর তাদের শিষ্যেরাও। এইভাবে বরাবর চলতে থাকবে। তোমরা কি দেখছ না যে, নির্বাচিত কয়েকজনকে উদ্বুদ্ধ করার যুগ আর নেই। এতে ভালই হোক বা মন্দই হোক, সে দিন চলে গেছে, আর কখনও আসবে না। ভবিষ্যতে সত্য পৃথিবীতে অবারিত থাকবে।

৩২। সমস্ত পৃথিবীকে উপনিষদের যুগে উন্নীত করতে হবে—এই রকম চিন্তা ক'রে বুদ্ধ এক মস্ত ভুল করেছিলেন। মানুষের স্বার্থ-চিন্তা সব নষ্ট করেছিল। এ-বিষয়ে কৃষ্ণ ছিলেন বিজ্ঞতর, কারণ তিনি রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। কিন্তু বুদ্ধ কোন আপসের পক্ষপাতী ছিলেন না। আপস করার জন্য এর আগে কত অবতারের শিক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে, তাঁরা লোক-স্বীকৃতি পাননি, অত্যাচারিত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন। বুদ্ধ যদি মুহূর্তের জন্যও আপস করতেন, তবে তাঁর জীবিতকালেই সারা এশিয়াতে তিনি ঈশ্বর ব'লে পূজিত হতেন। তাঁর উত্তর ছিল কেবল এই—বুদ্ধত্ব একটি অবস্থা-প্রাপ্তি মাত্র, কোন ব্যক্তিবিশেষ নয়। বস্তুতঃ দেহধারীদের মধ্যে তাঁকেই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী বলা যায়।

৩৩। পাশ্চাত্ত্যে লোকে স্বামীজীকে বলেছিল, বুদ্ধের মহত্ত্ব আরও

হৃদয়গ্রাহী হ'ত, যদি তিনি ক্রুশবিদ্ধ হতেন। এটাকে তিনি রোমক বর্বরতা ব'লে অভিহিত করেছিলেন এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। কর্মের প্রতি যে আসক্তি, তা হ'ল খুব নিম্নস্তরের এবং পশুসুলভ। এই কারণেই জগতে মহাকাব্যের সমাদর সব সময়ে হবে। সৌভাগ্যবশতঃ ভারতে এমন এক মিল্টন জন্মগ্রহণ করেননি, যিনি মানুষকে সোজাসুজি গভীর অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়ে ফেলবেন। ব্রাউনিং-এর একটি লাইন বরং তার স্থানে দিলে ভাল হয়। গল্পটির মহাকাব্যিক চমৎকারিত্বই রোমানদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটাই রোমানদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মকে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি আবার বললেন: হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমরা পাশ্চাত্যেরা কাজ চাও। জীবনের সাধারণ ঘটনাগুলির মধ্যেও যে কাব্য রয়েছে, তা তোমরা এখনও অনুভব করতে পারনি। সেই যে অল্পবয়স্কা মা তার মৃত পুত্রকে নিয়ে বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, সেই গল্পের চেয়ে চমৎকার গল্প আর কি হ'তে পারে? অথবা সেই ছাগশিশুর ঘটনাটি? দেখ, মহান্ ত্যাগ যে জিনিস, তা ভারতে কিছু নূতন নয়। কিন্তু পরিনির্বাণের পর, এখানেও যে একটি কাব্য আছে, তা লক্ষ্য ক'রো।

সেটা ছিল বর্ষার রাত। তিনি বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির মধ্যে সেই গো-পালকের কুঁড়েঘরে চালার নীচে দেওয়াল ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছেন। ক্রমে বৃষ্টি জোরে এল এবং বাতাসও বেড়ে উঠল। ভিতর থেকে জানালা দিয়ে সেই গো-পালক কে একজনকে দেখতে পেয়ে চিন্তা করতে লাগলো—হাঃ হাঃ কাষায়ধারী, ঐখানেই থাকো। ঐস্থানই তোমার উপযুক্ত। তারপর সে গান ধরল:

আমার গরুগুলো সব গোয়ালে আছে, আগুন ভালভাবেই জ্বলছে। আমার স্ত্রী নিরাপদে রয়েছে এবং শিশুরা সুন্দর ঘুমোচ্ছে। অতএব ওহে মেঘ, তুমি আজ রাতে যত ইচ্ছা বর্ষণ করতে পারো।

বুদ্ধও বাইরে দাঁড়িয়ে এর উত্তর দিয়ে বললেন: আমার মন সংযত, আমার ইন্দ্রিয়বর্গ সংহৃত করেছি এবং আমার হৃদয় সুদৃঢ়। অতএব হে সংসার-মেঘ, তুমি আজ যত ইচ্ছা বর্ষণ করতে পারো।

সেই গোপালক আবার গেয়ে চ'লল: আমার শস্য সব কাটা হয়ে গেছে,

খড়গুলি সব ঘরে আনা হয়েছে। নদী জলে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, পথগুলি ভালই আছে, অতএব হে মেঘ, তুমি আজ ইচ্ছামত বর্ষণ কর।

...এইভাবে চলতে লাগলো, অবশেষে সেই গোপালক অনুতপ্ত এবং বিস্মিত হয়ে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল।

আবার সেই নাপিতের গল্প। তার চেয়ে সুন্দর আর কি হ'তে পারে?

একজন পবিত্র লোক আমার বাড়ির ধার দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি যে নাপিত—আমার বাড়ির নিকট দিয়ে! আমি ছুটে গেলাম, তিনি ফিরে দাঁড়ালেন এবং অপেক্ষা করলেন। আমি বললাম, 'প্রভু, আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?' এবং তিনি বললেন, 'হাঁ, নিশ্চয়ই।' তিনি 'হাঁ' বললেন আমার মতো নাপিতকেও! তারপর আমি বললাম, 'আমি কি আপনার অনুসরণ ক'রব?' তিনি বললেন, 'করতে পারো।' আমি যে সামান্য নাপিত, আমাকেও তিনি কৃপা করলেন!

৩৪। বৌদ্ধধর্ম এবং হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রধান পার্থক্য এই: বৌদ্ধধর্ম বলছে—সমস্ত কিছু ভ্রম বলেই জেনো; আবার হিন্দুধর্ম বলছে—জেনো যে, এই ভ্রমের (মায়া) মধ্যে সত্য বিরাজ করছে। এটি কিভাবে হবে, হিন্দুধর্মে এ-বিষয়ে কোন কঠিন নিয়ম নেই। বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলিকে জীবনে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন সন্ন্যাস-ধর্মের, কিন্তু হিন্দুধর্মের এই অনুশাসনগুলি জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই অনুসরণ করা যেতে পারে। সব পথই সেই এক সত্যে পৌঁছিবার পথ। এই ধর্মের শ্রেষ্ঠ এবং মহত্তম কথাগুলির একটি—একজন ব্যাধের (মাংস-বিক্রেতার) মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে; একজন বিবাহিতা নারীর দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি একজন সন্ন্যাসীকে ঐ শিক্ষা দিয়েছিলেন। এইভাবে দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসি-সঙ্ঘের ধর্মে পরিণত হয়েছে, কিন্তু হিন্দুধর্ম সন্ন্যাস-জীবনকে সর্বোচ্চ স্থান দিলেও জীবনের প্রাত্যহিক কর্তব্যপালনকে ঈশ্বর-লাভের অন্যতম পথ হিসাবে নির্দেশ করেছে।

৩৫। নারীদের সন্ন্যাস-জীবন-বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন: তোমাদের জন্য কি কি নিয়ম হবে, তা স্থির কর; তারপর ভাবগুলিকে ফুটিয়ে তোল এবং পারলে তার মধ্যে একটু সর্বজনীনতা রাখো।

কিন্তু স্মরণ রেখো যে, কোন সময়েই পৃথিবীতে এই আদর্শ জীবনে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত এমন লোক আধ-ডজনের বেশী পাবে না। সম্প্রদায়-গঠনের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সম্প্রদায়গত ভাবের উপরে উঠারও প্রয়োজন। তোমাদের উপায় তোমাদেরই উদ্ভাবন করতে হবে। আইন তৈরি কর, কিন্তু আইন এমন ভাবে কর যে, লোকে যখন আইনের অনুশাসন ছাড়াই চলতে অভ্যস্ত হবে, তখন যেন তারা আইনগুলি দূরে ফেলে দিতে পারে। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে পূর্ণ কর্তৃত্ব যুক্ত করার মধ্যেই আমাদের বৈশিষ্ট্য নিহিত। সন্ন্যাস-জীবনাদর্শেও এ জিনিসটি করা যেতে পারে।

৩৬। দুটি ভিন্ন জাতির একত্র মিশ্রণের ফলেই তাদের মধ্যে থেকে একটি শক্তিশালী বিশিষ্ট জাতির উৎপত্তি হয়। এরা মিশ্রণ থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলতে চায় এবং জাতের উৎপত্তি এখান থেকেই। এই আপেলের কথাই ধর। ভাল জাতের যেগুলি, সেগুলি মিশ্রণের দ্বারাই হয়েছে, কিন্তু একবার মিশ্রণ করার পর আমরা সেই জাতটা যাতে ঠিক থাকে, সেজন্য চেষ্টা করি।

৩৭। মেয়েদের শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে তিনি বললেন: দেবতাদের পূজায় তোমাদের জন্য মূর্তি অবশ্যই প্রয়োজন। তবে এই মূর্তিগুলির পরিবর্তন তোমরা করতে পারো। কালীমূর্তি যে সর্বদা একই রকম থাকবে, তার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁকে বিভিন্ন নূতন ভাবে যাতে আঁকা যায়, এ-বিষয়ে চিন্তা করার জন্য মেয়েদের তোমরা উৎসাহিত কর। সরস্বতীর এক-শ রকম বিভিন্ন ভাব কল্পনা হোক। তাদের ভাবগুলিকে অবলম্বন ক'রে তারা ছবি আঁকুক, ছোট পট-মূর্তি তৈরি করুক এবং রঙের কাজ করুক।

মন্দিরের ভিতর বেদীর সবচেয়ে নীচের ধাপে যে কলসীটা, তা যেন সব সময় জলে পূর্ণ থাকে এবং তামিল দেশের যে মাখনের প্রদীপ, সেগুলি সব সময় জ্বেলে রাখা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে যদি বরাবরের জন্য উপাসনাদির ব্যবস্থা রাখতে পারো, তবে হিন্দুভাবের দিক থেকে আর বেশী কিছু করার থাকবে না। কিন্তু যে অনুষ্ঠানগুলি পালন করবে, সেগুলি যেন বৈদিক হয়। একটি বৈদিক মতের বেদী থাকবে, যাতে পূজার সময় বৈদিক (যজ্ঞের) অগ্নি জ্বালা হবে। এ-রকম একটি ধর্মানুষ্ঠান ভারতের সব লোকেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে।

সব রকম জন্তু-জানোয়ার যোগাড় কর। গরু থেকে আরম্ভ করলে ভাল হয়, কিন্তু তার সঙ্গে বেড়াল, পাখি এবং অন্যান্য জন্তুগুলিও রেখো, ঐগুলিকে খাওয়ানো, যত্ন করা প্রভৃতি কাজ ছেলেমেয়েদের করতে দাও।

তারপর জ্ঞানযজ্ঞ। এটি সবচেয়ে সুন্দর জিনিস। তোমরা কি জানো যে, প্রত্যেক বই-ই ভারতে পবিত্র ব'লে বিবেচিত হয়—কেবল বেদই নয়, ইংরেজী ও মুসলমানদের বইগুলিও? সবই পবিত্র।

প্রাচীন শিল্পকলার পুনঃপ্রবর্তন কর। জমানো দুধ দিয়ে ফলের বিভিন্ন খাবার কিভাবে প্রস্তুত করা যায়, মেয়েদের সে-সব শেখাও। সৌখিন রান্নাবান্না, শেলাই-এর কাজ শেখাও। তারা ছবি আঁকা, ফটোর কাজ, কাগজ কেটে বিভিন্ন রকমের জিনিস তৈরি করা, সোনা-রূপোর উপর সুন্দর সুন্দর কাজ করা ইত্যাদি শিখুক। লক্ষ্য রাখো—তারা প্রত্যেকেই এমন কিছু শিখুক, যাতে প্রয়োজন হ'লে তাদের জীবিকা তারা অর্জন করতে পারে।

মানুষকে কখনও ভুলো না। সেবার দৃষ্টি নিয়ে মানুষকে পূজা করার ভাবটা ভারতে সূক্ষ্মাকারে বর্তমান, কিন্তু এটা কোন দিনই বিশিষ্ট মর্যাদা পায়নি। তোমাদের ছাত্রেরা এ-বিষয়ে চেষ্টা করুক। এদের বিষয়ে কবিতা রচনা কর, শিল্প সৃষ্টি কর। হাঁ, প্রত্যহ স্নানের পর খাওয়ার আগে কেউ যদি ভিখারীদের পায়ে গিয়ে পূজা করে, তবে তার হাত এবং মাথা দুটিরই আশ্চর্য-রকম শিক্ষা হবে। আবার কখন কিছুদিন ছোট-শিশুদের বা তোমাদের ছাত্রদেরও হয়তো পূজা করলে অথবা কারও নিকট থেকে শিশুদের চেয়ে এনে তাদের খাওয়ালে, পরিচর্যা করলে। মাতাজী[১] আমায় যা বলেছিলেন, তা কি?—স্বামীজী, আমি অসহায়, কিন্তু এই যে পবিত্রাত্মা এরা, এদের যে পূজা করি, এরাই আমায় মুক্তির দিকে নিয়ে যাবে। দেখ, তাঁর ভাব হ'ল যে, একটি কুমারীর মধ্য দিয়ে তিনি উমারই সেবা করছেন। এই ভাবদৃষ্টি এবং তা দিয়ে একটি বিদ্যালয়ের পত্তন করা খুবই আশ্চর্যের বিষয়।

৩৮। সব সময় আনন্দের অভিব্যক্তিই হ'ল ভালবাসা। এর মধ্যে দুঃখের এতটুকু ছায়াও হ'ল দেহাত্মিকতা এবং স্বার্থপরতা।

৩৯। পাশ্চাত্যে বিবাহ জিনিসটা আইনগত বন্ধন ছাড়া আর কিছুর

---

১ কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রী তপস্বিনী মাতাজী

উপর নির্ভর করে না। কিন্তু ভারতে এটি চিরকালের জন্য দুজনকে মিলিত করবার একটি সামাজিক বন্ধন। এই জীবনে বা পর জীবনে তারা ইচ্ছা করুক বা না করুক, তারা দু-জন একে অপরকে বরণ ক'রে নেবে। একজন অপর জনের সমস্ত শুভকর্মের অর্ধাংশের অংশীদার হবে। এদের মধ্যে একজন জীবনের পথে যদি পিছিয়ে পড়ে, তবে পরে যাতে সে আবার তার সহযাত্রী হ'তে পারে, তার জন্য চেষ্টা অপর জনকেই করতে হবে।

৪০। চৈতন্য হচ্ছে অবচেতন মন এবং পূর্ণজ্ঞানাবস্থা—এই দুই সমুদ্রের মাঝে একটা পাতলা ব্যবধান মাত্র।

৪১। আমি যখন পাশ্চাত্যের লোকদের চৈতন্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলতে শুনি, তখন নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারি না। চৈতন্য! কি হয়েছে চৈতন্যে? কেন, অবচেতন মনের অতল গভীরতা এবং পূর্ণ চৈতন্যাবস্থার উচ্চতার তুলনায় এটা কিছুই নয়। এ-বিষয়ে আমার কোনদিনই ভুল হবে না, কেন না আমি যে রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখেছি, তিনি কোন ব্যক্তির অবচেতন মনের খবর দশ মিনিটের মধ্যেই জানতে পারতেন এবং তা দেখে তিনি ঐ ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ এবং শক্তিলাভ প্রভৃতি সবই ব'লে দিতে পারতেন।

৪২। এই-সব অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারগুলি সব গৌণ বিষয়। এগুলি প্রকৃত যোগ নয়। আমাদের কথাগুলির যাথার্থ্য পরোক্ষভাবে নির্ণয় করতে এ-সকলের কিছু কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারে। এ-বিষয়ের সামান্যতম অনুভূতিতে মানুষ বিশ্বাসবান্ হয় যে, জড়-জগতের পিছনে একটা কিছু রয়েছে। তবুও এই-সব জিনিস নিয়ে যারা কালক্ষেপ করে, তারা ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়ে।

এই-সব যৌগিক শক্তিগুলি বাহ্য ঘটনা মাত্র। এগুলির সাহায্যে কোন জ্ঞান হ'লে কখনই তার স্থিরতা বা দৃঢ়তা থাকে না। আমি কি বলিনি যে, এগুলি বাহ্য ঘটনা মাত্র? সীমারেখা সব সময় সরে যাচ্ছে।

৪৩। অদ্বৈতের দিক দিয়ে বলা হয় যে, আত্মা জন্মানও না, মরেনও না। বিশ্বের এই-সব স্তর আকাশ ও প্রাণের বিভিন্ন সৃষ্টিমাত্র। অর্থাৎ সবচেয়ে যে নিম্নস্তর বা ঘনীভূত স্তর, তা হ'ল সৌরলোক; দৃশ্যমান জগৎকে নিয়েই এর পরিমিতি, এর মধ্যে প্রাণ বা জীবনী শক্তি এবং আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

পদার্থরূপে প্রতিভাত। এরপর চন্দ্রলোক—এটি সৌরমণ্ডলকে ঘিরে রয়েছে। এটি কিন্তু চন্দ্র বলতে যা বোঝায়, মোটেই তা নয়। এটি দেবতাগণের আরাম-ভূমি। এখানে প্রাণজীবন শক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা পঞ্চভূতরূপে প্রতিভাত। এরপরই আলোকমণ্ডল (বিদ্যুৎ-মণ্ডল)—এটি এমন একটি অবস্থা যে, একে আকাশ থেকে পৃথক্ করা যায় না এবং তোমাদের পক্ষে বলা খুবই অসম্ভব যে, বিদ্যুৎ জড় অথবা শক্তিবিশেষ। এরপর ব্রহ্মলোক—এখানে প্রাণ ও আকাশ বলতে আলাদা কিছু নেই, দুটি একীভূত হয়ে মনে সূক্ষ্ম-শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এখানে প্রাণ বা আকাশ কিছুই না থাকায় জীব সমস্ত বিশ্বকে সমষ্টিরূপে মহৎ তত্ত্ব বা 'সমষ্টি মন'রূপে চিন্তা করে। ইনিই পুরুষরূপে বা সমষ্টি সূক্ষ্ম আত্মারূপে আবির্ভূত হন। এখানে তখনও বহুত্ব-জ্ঞান আছে, তাই এই পুরুষ নিত্য নন। এখান থেকেই জীব শেষে একত্ব উপলব্ধি করে। অদ্বৈতমতে জীব—যার জন্ম মৃত্যু কোনটাই নেই, তার কাছে এই পর্যায়গুলিও পর পর ভেসে উঠতে থাকে। বর্তমান সৃষ্টিও সেই একভাবেই দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। সৃষ্টি ও প্রলয় একই পর্যায়ে হয়, একটি ভিতরে চলে যাওয়া এবং আর একটি বাইরে বেরিয়ে আসা মাত্র।

প্রত্যেকেই এইরূপে তার নিজের জগৎকেই দেখে—এই জগৎ তার কর্ম-ফলেই সৃষ্ট হয়, আবার তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়। অবশ্য অপর যারা বন্ধনগ্রস্ত, তাদের কাছে এর অস্তিত্ব তখনও থাকে। নাম এবং রূপই জগৎ। সমুদ্রের একটি ঢেউ নাম এবং রূপের দ্বারা সীমিত বলেই তার নাম ঢেউ। ঢেউ মিলিয়ে গেলে সমুদ্রই পড়ে থাকে। নাম-রূপও কিন্তু চিরকালের জন্য সঙ্গে সঙ্গেই চলে যায়, জল ব্যতিরেকে এই ঢেউ-এর নাম এবং রূপ কোন-দিনই সম্ভব নয় এবং এই নাম-রূপই জলকে ঢেউ-এ পরিণত করেছে, তবুও নাম এবং রূপ—এরা কিন্তু ঢেউ নয়। ঢেউ জলে মিলিত হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তারাও বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু অন্যান্য ঢেউ বর্তমান থাকায় তাদের নাম-রূপ থাকে। এই নাম-রূপ হ'ল মায়া এবং জল হ'ল ব্রহ্ম। ঢেউটির যতক্ষণ অস্তিত্ব ছিল, ততক্ষণ এটি জল ছাড়া আর কিছুই ছিল না, তবু ঢেউ হিসাবে এর একটি নাম এবং রূপ ছিল। আবার এই নাম ও রূপ ঢেউকে বাদ দিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও দাঁড়াতে পারে না, যদিও জল হিসাবে এই ঢেউ নাম এবং রূপ থেকে অনন্তকাল বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই নাম এবং

রূপকে স্বতন্ত্র ভেবে দেখা অসম্ভব, অতএব এগুলির কোন বাস্তব সত্তা নেই। অথচ এগুলি শূন্যও নয়। এরই নাম মায়া।

৪৪। আমি বুদ্ধের দাসানুদাসেরও দাস। সেই মহাপ্রাণ প্রভুর মতো কেউ কি কখনও হয়েছে? তিনি নিজের জন্য একটি কর্মও করলেন না, তাঁর হৃদয় দিয়ে সমগ্র পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেছিলেন সেই রাজকুমার এবং সন্ন্যাসীর এত দয়া যে, তিনি একটা সামান্য ছাগ-শিশুর জন্য নিজের জীবন দিতে উদ্যত হলেন; তাঁর এত ভালবাসা যে, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রীর সামনে নিজেকে সঁপে দিলেন, একজন অন্ত্যজের আতিথ্য গ্রহণ ক'রে তাকে আশীর্বাদ করলেন। আমি যখন সামান্য বালকমাত্র, তখন আমি তাঁকে আমার ঘরে দর্শন করেছিলাম এবং তাঁর পদতলে আত্মসমর্পণ করেছিলাম, কারণ আমি জেনেছিলাম যে, তিনি সেই প্রভু স্বয়ং।

৪৫। শুক হলেন আদর্শ পরমহংস। মানুষের মধ্যে তিনিই সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দ-সাগরের এক গণ্ডূষ জল পান করেছিলেন। অধিকাংশ সাধকই তীর থেকে এই সাগরের গর্জন শুনে মারা যান, কয়েকজন মাত্র এর দর্শন পান এবং আরও স্বল্প সংখ্যক এর স্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হন। কিন্তু তিনি এই অমৃত-সাগর থেকে পান করেছিলেন!

৪৬। ত্যাগকে বাদ দিয়ে যে-ভক্তি, তার অর্থ কি? এটি অত্যন্ত অনিষ্টকর।

৪৭। আমরা সুখ বা দুঃখ কোনটিই চাই না—এ-দুটির মধ্য দিয়ে আমরা সেই বস্তুর খোঁজ করছি, যা এই দুয়েরই ঊর্ধ্বে।

৪৮। শঙ্করাচার্য বেদের মধ্যে যে একটি ছন্দ-মাধুর্য, একটি জাতীয় জীবনের সুরপ্রবাহ আছে, তা ধরতে পেরেছিলেন। বাস্তবিকই আমার সব সময়ই মনে হয় যে, তিনি যখন বালক ছিলেন, তখন আমার মতো তাঁরও একটা অন্তর্দৃষ্টি হয়েছিল এবং এই দৃষ্টি দ্বারাই তিনি সেই সুপ্রাচীন সঙ্গীত-ধারাকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। যাই হোক, তাঁর সারা জীবনের কার্যাবলী বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এটি বেদ ও উপনিষদের মাধুর্যের ছন্দিত স্পন্দন ছাড়া আর কিছুই নয়।

৪৯। যদিও মায়ের ভালবাসা কোন কোন দিক দিয়ে মহত্তর, তথাপি পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ভালবাসা, তা যেন ঠিক পরমাত্মার প্রতি জীবাত্মার সম্পর্কের মতো। আদর্শকে এত বেশী জীবন্ত ক'রে তুলতে ভালবাসার মতো কিছুই নেই। ভালবাসার ফলে একজনের কল্পনার ছবি অপর জনের মধ্যে বাস্তব হয়ে উঠে। এই ভালবাসা তার প্রিয়কে রূপান্তরিত ক'রে ফেলে।

৫০। সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয়ে সিংহাসনে বসে সম্পদ্, যশ, স্ত্রীপুত্রাদিকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে জনকের মতো হওয়া কি এতই সহজ? পাশ্চাত্যে একের পর এক অনেকেই আমাকে বলেছেন যে, তাঁরা ঐ অবস্থা লাভ করেছেন, আমি কেবল বলেছি যে, এমন বিরাট পুরুষগণ ভারতে তো জন্ম গ্রহণ করেন না!

৫১। এই কথা তোমরাও ভুলো না এবং তোমাদের ছেলেমেয়েদেরও শিক্ষা দিতে ভুলো না যে, একটি জোনাকি পোকা ও জলন্ত সূর্যের মধ্যে, একটি ছোট ডোবা ও অসীম সমুদ্রের মধ্যে এবং একটা সরষের বীজ ও মেরুপর্বতের মধ্যে যে তফাত, গৃহী ও সন্ন্যাসীর মধ্যে ঠিক সেই রকম তফাত।

৫২। সব কিছুই ভয়ান্বিত, ত্যাগই কেবল নির্ভয়। যে-সব সাধু জাল (ঠক্‌বাজ) বা যারা জীবনে আদর্শ-রক্ষায় অসমর্থ হয়েছে, তারাও প্রশংসনীয়, যেহেতু আদর্শের সঙ্গে তাদের সম্যক্ পরিচয় হয়েছে, এবং এ দ্বারা তারা অপর সকলের সাফল্যলাভে কিছুটা সহায়ক। আমরা যেন আমাদের আদর্শ কখনও না ভুলি! রমতা সাধু বহতা পানি—যে-নদীতে স্রোত আছে সে-নদী পবিত্র থাকে, তেমনি যে-সাধু বিচরণশীল, তিনিও পবিত্র।

৫৩। সন্ন্যাসীর টাকার কথা ভাবা ও টাকা পাওয়ার চেষ্টা করা আত্মহত্যার সামিল।

৫৪। মহম্মদ বা বুদ্ধ মহান্ ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু এতে আমার কি? এর দ্বারা আমার কি কিছু ভাল বা মন্দ হবে? আমাদের নিজেদের তাগিদে এবং নিজেদের দায়িত্বেই নিজদিগকে ভাল হ'তে হবে।

৫৫। এ দেশে তোমরাও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য হারাবার ভয়ে খুবই ভীত। কিন্তু ব্যক্তিত্ব বলতে যা বুঝায়, তা তোমাদের এখনও হয়নি। তোমরা যখন তোমাদের নিজ নিজ প্রকৃতি জানতে পারবে, তখনই তোমরা যথার্থ ব্যক্তিত্ব

লাভ করবে, তার আগে নয়। আর একটা কথা সব সময় এদেশে শুনছি যে, আমাদের সব সময়ে প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা উচিত। 'তোমরা কি জান না যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যা উন্নতি হয়েছে, সবই প্রকৃতিকে জয় করেই হয়েছে? আমাদের কোনরূপ উন্নতি করতে হ'লে প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতিকে প্রতিরোধ করতে হবে।

৫৬। ভারতবর্ষে লোকে আমায় সাধারণের মধ্যে অদ্বৈত বেদান্ত শিক্ষা না দেওয়ার জন্য বলে, কিন্তু আমি বলি যে, একটি শিশুকেও এই জিনিসটা বুঝিয়ে দিতে পারি। উচ্চ আধ্যাত্মিক সত্যগুলির শিক্ষা একেবারে প্রথম হইতেই দেওয়া উচিত।

৫৭। যত কম পড়বে, তত মঙ্গল। গীতা এবং বেদান্তের উপর যে-সব ভাল ভাল গ্রন্থ রয়েছে, সেগুলি পড়। কেবল এইগুলি হলেই চলবে। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সবটাই ভুলে ভরা। চিন্তা করতে শেখবার আগেই মনটা নানা বিষয়ের সংবাদে পূর্ণ হয়ে উঠে। মনকে কেমন ক'রে সংযত করতে হয়, সেই শিক্ষাই প্রথম দেওয়া উচিত। আমাকে যদি আবার নূতন ক'রে শিখতে হয় এবং এই বিষয়ে আমার যদি কোন মতামত দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে আমি প্রথমে আমার মনকেই আয়ত্তে আনার চেষ্টা ক'রব এবং তারপর প্রয়োজন বোধ করলে অন্য কোন বিষয় শিখব। কোন বিষয় শিখতে লোকের অনেক দিন লেগে যায়, তার কারণ হ'ল তারা ইচ্ছামত মনকে সন্নিবিষ্ট করতে পারে না।

৫৮। দুঃসময় যদি আসে, তবে হয়েছে কি? ঘড়ির দোলন আবার অন্যদিকে ফিরে আসবে। কিন্তু এটাও খুব একটা ভাল কিছু নয়। যা করতে হবে, তা হ'ল একে একেবারে থামিয়ে দেওয়া।

তথ্যপঞ্জী

অতিরিক্ত তথ্যপঞ্জী

খণ্ড	পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	
৫ম	৯৭	৯	কুথুমি ও মোরিয়া : দুইজন বড় থিওজফিস্ট মহাত্মা (Master)। কথিত আছে, পঞ্চভূত ছাড়াও সাতটি রশ্মি মানুষের উপর ক্রিয়া করে। এই সাতটি রশ্মি সাতজন মহাত্মা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক মহাত্মা একটি রশ্মির তত্ত্বাবধায়ক—রশ্মির অধীন থাকিয়া মানুষ এরূপ রশ্মির দিকে স্পন্দিত হয়। মহাত্মা এল. মোরিয়ার তত্ত্বাবধানে প্রথম রশ্মি—ইচ্ছাশক্তি। এই রশ্মির অধীন থাকিয়া রাজা, শাসক, প্রশাসক, সৈনিক ও জনগণ কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করিবার পূর্বে তাঁহাদের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন। মহাত্মা কুথুমির পরিচালনায় দ্বিতীয় রশ্মি—দর্শন, জ্ঞান ও শিক্ষা। কুথুমি ও মোরিয়া গূঢ়ভাবে থিওজফিক্যাল সোসাইটি স্থাপন করেন। বর্ধমান ও বারাণসীর স্বামী বিশুদ্ধানন্দ তাঁহার পত্রাবলীতে মহাত্মা কুথুমির সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা লিখিয়াছেন এবং কুথুমিকে বহুশতবর্ষবয়স্ক যৌগিক সিদ্ধি ও অনুভূতি-সম্পন্ন জ্ঞানানন্দ স্বামী নামে বর্ণনা করিয়াছেন। (Justice P. B. Mukharji প্রেরিত ইংরাজী নোট হইতে)
৫ম	২২৫	৩	আল্লোপনিষদ্ : এই উপনিষদ্ দাক্ষিণাত্যের সেখ ভাবন (Shaykh Bhāvan) কর্তৃক রচিত। ব্রাহ্মণবংশে জাত ভাবন শেষজীবনে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সম্রাট্ আকবরের দীন-ই-ইলাহী ধর্মে প্রভাবিত হইয়া তাঁহারই নির্দেশে ভাবন আল্লোপনিষদ্ রচনা করেন। এই আধুনিক উপনিষদে আল্লার স্তুতি আছে এবং মহম্মদকে 'রজস্থল্লা' বলা হইয়াছে। (Dr. J. B. Chaudhury)
৯ম	৩৪	২৫	তপস্বিনী মাতাজী : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৮০৫ খৃ:) দক্ষিণ-ভারতে ভেলোর নামক এক ক্ষুদ্র করদ

খণ্ড পৃঃ পঙ্‌ক্তি

রাজ্যের রাজার কন্যার গর্ভে মাতাজী তপস্বিনী জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে নাম ছিল সুনন্দা দেবী। চিরকুমারী থাকিবার সংকল্প করিয়া সুনন্দা পঞ্চাগ্নি-ব্রত পালন করেন। পরে মান্দ্রাজের তাম্রলিপ্তা নদীর তীরে বহুকাল তপস্যা করিয়া মাতাজী নাম গ্রহণ করেন। তিনি ভারতের বহু স্থানে হিন্দু আদর্শে অনেক বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা মহাকালী পাঠশালার স্থাপয়িত্রীও এই পুণ্যবতী মহিলা।

(উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য)

৯ম ২৬৬ ২২ 'প্রিয়তমের মুখের......বিলাইয়া দিতে পারি।' তুলনীয়ঃ

অগর আঁ তুরকে সিরাজি বদস্ত আরদ দিলে মারা
বখালে হিন্দওস্ বক্সম সমরখন্দো বোখারারা।—হাফিজ

—যদি সেই সিরাজী আমাদের হৃদয় হাতে নেয়, তবে ঐ তিলটির জন্য আমি সমরখন্দ ও বোখারা দিয়ে দিতে পারি।

(শ্রীপ্রণব ঘোষ)

সংশোধনী

৫ম ৪৭৪ ১৫ 'চৈতন্য (১৪৮৫-১৬০৩)'র স্থলে পড়িবেন 'চৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩)'।

৭ম ৩৩৭ ৯ পাদটীকায় 'মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সুবর্ণ-জয়ন্তী—পঞ্চাশ-বর্ষ-পূর্তি'র স্থলে পড়িবেন 'মহারানী......হীরক-জয়ন্তী—ষাট-বর্ষ-পূর্তি (Diamond Jubilee : 1837—1897)'

প্রধান প্রধান লেখা ও রচনার সময়সূচী

বৎসর	মাস ও তারিখ	স্থান	বিষয়
১৮৮৯	—	কলিকাতা	ঈশানুসরণের স্বচনা
১৮৯৩	সেপ্টেম্বর ১৯	শিকাগো	Paper on Hinduism
১৮৯৪	মার্চ-এপ্রিল	„	Reason, Faith and Love
	গ্রীষ্মকাল		গাই গীত শুনাতে তোমায়
	সেপ্টেম্বর	বস্টন	Reply to Madras Address
১৮৯৫	বসন্তকাল	নিউ ইয়র্ক	*My Play is Done*
	মার্চ	„	Is the Soul Immortal ?
	গ্রীষ্মকাল	সহস্রদ্বীপোদ্যান	*Song of the Sannyasin*
	শরৎকাল	„	Reincarnation
		নিউ ইয়র্ক	Raja-Yoga (First Half)
১৮৯৫-৯৬	—	আমেরিকা	Reply to Address of Maharaja of Khetri
	—	—	Struggle for Expansion
			The Birth of Religion
১৮৯৫-৯৬	—	আমেরিকা	Four Paths of Yoga
			Cyclic Rest and Change
১৮৯৬	জানুআরি	নিউ ইয়র্ক	*To an Early Violet*
১৮৯৮	জুন	আলমোড়া	Requiescat in Pace
	জুলাই	শ্রীনগর	*To the Fourth of July*
		„	*To the Awakened India*
	শরৎকাল	কাশ্মীর	*Kali the Mother*
	নভেম্বর	কলিকাতা	শ্রীরামকৃষ্ণের স্তব (সংস্কৃত)
		„	*The Angels Unawares*
			উদ্বোধন পত্রিকার প্রস্তাবনা
	জানুআরি		সখার প্রতি

বৎসর	মাস ও তারিখ	স্থান	বিষয়
১৮৯৯	এপ্রিল	বেলুড় মঠ	উদ্বোধনের জন্য কয়েকটি রচনা
	—	আমেরিকা	Life-sketch of Pahari Baba
	জুন হইতে		পরিব্রাজক
	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	রিজলী ম্যানর	*Peace*
১৯০০	অগস্ট ১৭	প্যারিস	*Thou Blessed Dream*
	সেপ্টেম্বর		পারি-প্রদর্শনীর বিবরণ উদ্বোধন
১৯০১	জানুআরি	মায়াবতী	Aryans and Tamilians
			Review of Social Conference Addresses
			Stray Remarks on Theosophy
			প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—উদ্বোধন দ্বিতীয় বর্ষ আষাঢ় হইতে
	—	—	*The Cup*

দ্রষ্টব্য : ইটালিক্‌স্ অক্ষরে লিখিত বিষয়গুলি কবিতা

কথোপকথন ও বক্তৃতার সময়সূচী

(শুধু প্রধান প্রধানগুলির স্থান ও কাল প্রদত্ত হইল)

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিষয়
১৮৯২ ৯৩		—	ভারত	Notes of some Discussions taken down in Madras
১৮৯৩	অগস্ট		অ্যানিস্কোয়াম	Vengeance of History (recorded by Mrs. Wright)
	সেপ্টেম্বর	১১-২৭	শিকাগো	Addresses in the Parliament of Religions
		২২	”	Women of the East
		২৩	”	Congress of Religious Unity
		২৪	”	Love of God
	নভেম্বর	২৬	মিনিয়াপোলিস	Mercenaries in Religion
১৮৯৪	জানুআরি	১৫	মেমফিস্	Interview : Miracles
		১৭	”	The Destiny of Man
		১৯	”	Reincarnation
		২১	”	Comparative Theology
		২১	”	Conversation : Religion Civilisation and Miracles
	ফেব্রুআরি	১৪	ডেট্রয়েট	India
		”	”	Conv. : Religious Harmony
		২০	”	Love of God
		২১	”	Hindus and Christians
	মার্চ	১১	”	Christianity in India
		১৭	”	Conv. : Fallen Women
		১৯	”	Buddhism, Religion of the Light of Asia

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিষয়
	মার্চ-এপ্রিল		ডেট্রয়েট	Is India a benighted country ?
	ডিসেম্বর	৩০	ব্রুকলীন	Indian Religious Thoughts
			”	Hindu Religion
			”	Questions and Answers
	শেষভাগে		ক্যাম্ব্রিজ	Six Lessons on Raja Yoga (at Mrs. Bull's)
১৮৯৫	মে	১৬	পূর্ব উপকূলে (নিউ ইয়র্ক, ক্যাম্ব্রিজ ও বস্টনে)	Class Talks : Man the maker of his destiny, God personal and impersonal, Divine Incarnation or Avatara, Pranayama
			নিউ ইয়র্ক	Discourses on Jnana Yoga
	জুন	১৯	সহস্রদ্বীপোদ্যান	Inspired Talks
	অগস্ট	৬		
	অক্টোবর	২৩	লণ্ডন	Interview : Indian Yogi in London
	নভেম্বর	১৬	”	Religion of Love
		২৩	”	Jnana and Karma
		—	”	Religion, its Method and
		—	”	Purpose. The Nature of the Soul and its Goal
১৮৯৫	২৬ ডিসেম্বর ও জানুআরি		নিউ ইয়র্ক	Karma Yoga
		—	আমেরিকা	Steps to Realisation
১৮৯৬	জানুআরি		নিউ ইয়র্ক	Ideals of Universal Religion
		১৯	”	The Cosmos : Macrocosm
		২৬	”	: Microcosm
			”	Immortality

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিষয়
১৮৯৬	জানুআরি		নিউ ইয়র্ক	The Atman
		—	„	The Atman, its Bondages and Freedom
	ফেব্রুআরি		„	Real and Apparent Man
			„	Bhakti Yoga
		৯	„	Bhakti & Devotion
		২৪	„	My Master
১৮৯৬			নিউ ইয়র্ক	Soul, Nature and God
	ফেব্রুআরি মার্চ		„	The Series : Science and Philosophy of Religion
	মার্চ		বস্টন	Spirit and Influence of Vedanta
		২৫	হার্ভার্ড	The Vedanta Philosophy (Harvard Address) Discussions, Questions and Answers
		—	লণ্ডন	Interview : India's Mission
		—	„	„ : India & England
		—	„	„ : Indian Missionary's Mission to England
	মে জুন		„	Address on Bhakti Yoga
	মে জুলাই		„	Lessons on Raja Yoga
		—	„	Lessons on Bhakti Yoga
১৮৯৭	জানুআরি —ডিসেম্বর	১৬ ৩০	ভারতে	Lectures from Colombo to Almora
	ফেব্রুআরি		মাদুরায় ও মাদ্রাজে	The three interviews at Madura and Madras
১৮৯৮	মার্চ	১১	কলিকাতা	Influence of Indian Spiritual Thoughts

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিষয়
১৮৯৮	সেপ্টেম্বর	~	কলিকাতা	Interview : Re-awakening of Hinduism ; On Indian Women
১৮৯৯	এপ্রিল		বেলুড় মঠ	Interview : On Bounds of Hinduism
	জুন	১৯	„	Sannyasa : Its Ideal and Practice
১৯০০	জানুআরি	৪	লস এঞ্জেলেস	Work and its Secret
		৮	„	The Power of the Mind
			„	Hints on Practical Spirituality
			„	The Open Secret
			„	The Way to Blessedness
			প্যাসাডেনা	Christ the Messenger
		১৮	„	Women of India
		২৭	„	My Life and Mission
		২৮	„	The Way to Realisation of a Universal Religion
		৩১	„	The Ramayana
	ফেব্রুআরি	১	„	The Mahabharata
			„	The Story of Jadabharata
			„	The Story of Prahlada
		৩	„	The Great Teachers of the World
		২৫	ওকল্যাণ্ড	The Claims of Vedanta on Modern World
		২৮	„	The Vedanta Philosophy and Christianity
	মার্চ	৭	„	The Laws of Life and Death
		৮	„	The Reality and the Shadow

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিষয়
১৯০০	মার্চ	১২	ওকল্যাণ্ড	Way to Salvation
		১৬	স্যান ফ্রান্সিস্কো	Concentration
		১৮	"	Buddha's Message to the World
		১৯	ওকল্যাণ্ড	The People of India
		২০	স্যান ফ্রান্সিস্কো	'I am That I am'
		২৫	"	Mohammed
		২৭	"	The Goal
		২৯	"	Discipleship
	মার্চ-এপ্রিল		ক্যালিফর্নিয়া	Nature and Man
			"	Importance of Psychology
			"	Soul, God and Religion
	এপ্রিল	১	"	Krishna
			আলামেডা	Concentration and Breathing
		৩	স্যান ফ্রান্সিস্কো	Meditation
		৮	"	Is Vedanta the Future Religion?
		৯	"	Worshipper and Worshipped
		১০	"	Formal Worship
		১২	"	Divine Love
		১৩	আলামেডা	The Science of Yoga
		১৮	"	The Practice of Religion
	মে	২৬	স্যান ফ্রান্সিস্কো	The Gita I
		২৮	"	The Gita II
		২৯	"	The Gita III
		—	"	On Art in India
	জুন	১০	নিউ ইয়র্ক	Unity
	—			Vedic Religious Ideals

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিষয়
১৯০০	জুন	১৭	নিউ ইয়র্ক	What is Religion ?
		২৪	”	Worship of Divine Mother
১৯০১	মার্চ		ঢাকা	What have I learnt ?
				The Religion we are born in

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রমণপঞ্জী

বৎসর	মাস ও তারিখ	স্থান	বিশেষ তথ্য
১৮৮৬	এপ্রিল প্রথম সপ্তাহে	বুদ্ধগয়া	৩।৪ দিন অবস্থান; সঙ্গে তারক ও কালী; কাশীপুর বাগানবাড়ি হইতে যাত্রা গেরুয়া বস্ত্রে গমন।
	ডিসেম্বর তৃতীয় সপ্তাহে	আঁটপুর	সঙ্গে শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর, সারদা ও বাবুরাম; খ্রীষ্ট-মাসের রাত্রে সন্ন্যাসের সংকল্প গ্রহণ।
	ডিসেম্বর	তারকেশ্বর	মহাদেব দর্শন
১৮৮৮	প্রথম ভাগে	বারাণসী	প্রেমানন্দ সঙ্গে প্রায় ৭ দিন দ্বারকাদাসের আশ্রমে বাস
	গ্রীষ্মকালে	বারাণসী	বাবু প্রমদাদাস মিত্রের সাথে পরিচয়
		অযোধ্যা	লখনউ, আগ্রা
	অগস্ট	বৃন্দাবন	প্রায় ২।৩ সপ্তাহ কালাবাবুর কুঞ্জে বাস,
		হাত্রাস	শরৎচন্দ্র গুপ্ত (সদানন্দ)র সঙ্গে সাক্ষাৎ; তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ।
	সেপ্টেম্বর	হৃষীকেশ	ঐ সঙ্গে
	অক্টোবর	হাত্রাস	
	নভেম্বর	বরাহনগর মঠ	
১৮৮৯	ফেব্রুআরি	আঁটপুর	
	গ্রীষ্মকাল	সিমুলতলা	স্বাস্থ্যপ্রয়োজনে কয়েক দিন
	ডিসেম্বর,	বৈদ্যনাথ	৫।৭ দিন
		এলাহাবাদ	স্বামী যোগানন্দের শুশ্রূষা
১৮৯০	জানুআরি তৃতীয় সপ্তাহে	গাজীপুর	প্রায় তিন মাসকাল অবস্থান ও পওহারীবাবার সহিত সাক্ষাৎ
	এপ্রিল	বারাণসী	প্রমদাদাসবাবুর বাগানে বাস
	মে	বরাহনগর	

বৎসর	মাস ও তারিখ	স্থান	বিশেষ তথ্য
১৮৯০	অগস্ট	ভাগলপুর	অখণ্ডানন্দ সঙ্গে
		বৈদ্যনাথ	„
		বারাণসী	„
		অযোধ্যা	„ জানকীবর শরণের আশ্রমে
		নৈনীতাল	„ প্রায় একপক্ষকাল
		আলমোড়া	সঙ্গে অখণ্ডানন্দ, সারদানন্দ ও বৈকুণ্ঠনাথ
		কর্ণপ্রয়াগ	ঐ
		রুদ্রপ্রয়াগ	প্রায় সপ্তাহকাল চটিতে অসুস্থ
	শরৎকালে	শ্রীনগর	একমাস কাল বাস
		টিহিরী	২০ দিন অবস্থান
		মুশৌরী	রাজপুর
		ডেরাডুন	প্রায় তিন সপ্তাহ
		হৃষীকেশ	গুরুতর পীড়া ও দৈবে আরোগ্যলাভ
		হরিদ্বার	সাহারানপুর
		মীরাট	প্রায় পাঁচ মাস অবস্থান, সঙ্গে গুরু-
		দিল্লী	ভ্রাতাগণ
১৮৯১	জানুআরিশেষে		একাকী ভ্রমণে যাত্রা
	ফেব্রুআরি	আলোয়ার	পাণ্ডুপোল, তাহলা, নারায়ণী,
	ফেব্রুআরি-মার্চ	জয়পুর	দুই সপ্তাহকাল অবস্থান
	মার্চ শেষদিকে	আজমীঢ়	২।৩ সপ্তাহ অবস্থান
	এপ্রিল	আবুপাহাড়	ক্ষেত্রীর মহারাজার সাক্ষাৎ ও কয়েক-
			দিন অবস্থান
		ক্ষেত্রী	কয়েক সপ্তাহ
		আমেদাবাদ	কয়েকদিন
		ওয়াঢোয়ান	লিমডি, ভবনগর ও শিহোর
		জুনাগড়	কয়েক সপ্তাহ
		ভুজ	হইতে পালিটানা
		জুনাগড়	কয়েকদিন

বৎসর	মাস ও তারিখ	স্থান	বিশেষ তথ্য
১৮৯১		ভেরাওয়াল	ও প্রভাস
		সোমনাথ	
		জুনাগড়	
		পোরবন্দর	১১ মাস বাস; শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ সঙ্গে বেদ অনুবাদ, মহাভাষ্য পাঠ এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা।
১৮৯২		দ্বারকা	
		মাণ্ডবী	প্রায় একপক্ষকাল অবস্থান, পথে পালিটানাতে শত্রুঞ্জয় পর্বত দর্শন।
	এপ্রিল	বরোদা	নারায়ণ সরোবর, আশাপুরি, মাণ্ডবী ও ভুজ হইয়া বরোদা।
	জুন ১৫	পুনা	লিমডির ঠাকুর সাহেবের সাথে মহাবালেশ্বর হইয়া গমন।
	জুন শেষভাগ	খাণ্ডোয়া	প্রায় তিন সপ্তাহ, মাঝে একবার ইন্দোরে গমন।
	জুলাই শেষে	বোম্বাই	ছবিলদাসের গৃহে কয়েক সপ্তাহ
	সেপ্টেম্বর	পুনা	বালগঙ্গাধর তিলক গৃহে ৮।১০ দিন
	সেপ্টেম্বর-	মহাবালেশ্বর	—
	অক্টোবর	কোলাপুর	বেলগাঁও
		মারমুগোয়া	বেলগাঁও
		বাঙ্গালোর	মহীশূররাজের সহিত সাক্ষাৎ
		ত্রিচুর	কয়েকদিন
	ডিসেম্বর	ত্রিবান্দ্রাম	৯।১০দিন
		মাদুরা	রামনাদের রাজার সহিত সাক্ষাৎ
		রামেশ্বর	
		কন্যাকুমারী	বিবেকানন্দ-শিলায় ধ্যান
১৮৯২-৯৩	শীতকালে	মাদ্রাজ	রামনাদ ও পণ্ডিচেরী হইয়া মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ

বৎসর	মাস ও তারিখ	স্থান	বিশেষ তথ্য
	ফেব্রুআরি ১০	হায়দরাবাদ	প্রায় এক সপ্তাহ মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়ের আতিথ্য গ্রহণ
	১৮	মাদ্রাজ	পাশ্চাত্যে যাওয়ার ব্যবস্থা
	এপ্রিলের শেষ	ক্ষেত্রী	বোম্বাই ও জয়পুর হইয়া কয়েকদিন ক্ষেত্রীতে অবস্থান
	মে	আবুরোড স্টেশনে	স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ
	মে শেষদিকে	বোম্বাই	৩১ মে আমেরিকা যাত্রা
	জুন ৬	কলম্বো	জাহাজ একদিন থামে
		পেনাঙ	(মালয়)
		সিঙ্গাপুর	
		হংকং	তিন দিন অবস্থান, ক্যাণ্টন পরিদর্শন
		নাগাসাকি	অল্পসময়
	জুন-জুলাই	কোবি	জাহাজ ত্যাগ ও স্থলপথে
	জুলাই	ইয়োকোহামা	ওসাকা, কিয়োটো ও টোকিও
	জুলাই শেষভাগে	ভঙ্কুবর	কানাডা হইয়া যুক্তরাষ্ট্রে
	অগস্ট	শিকাগো	১২ দিন অবস্থান
১৮৯৩	অগস্ট	বস্টন	মিস্ কেট স্যানবর্ন-এর গোলাবাড়িতে, ব্রিজি মেডোজ গ্রামে বাস
	অগস্ট-সেপ্টেম্বর	সালেম	মিসেস টেনাট উডসের গৃহে কয়েকদিন
	সেপ্টেম্বর প্রথমে	শিকাগো	মিসেস হেলের সঙ্গে পরিচয়
	শেষভাগে	”	ধর্মমহাসভা
	১১-২৭	পূর্ব ও মধ্য-পশ্চিমে	বক্তৃতা কোম্পানির সঙ্গে : ঠিকানা শিকাগো
১৮৯৪	ফেব্রুআরি	ডেট্রয়েট	বক্তৃতা—প্রায় চার সপ্তাহ
	মধ্যভাগে		মিসেস ব্যাগলীর অতিথি
	এপ্রিল	নিউ ইয়র্ক	
	মে শেষভাগে	শিকাগো	একমাস অবস্থান

বৎসর	মাস ও তারিখ	স্থান	বিশেষ তথ্য
	জুলাই	নিউ ইয়র্ক	
	জুলাই-অগস্ট	গ্রীনএকার	কয়েকটি বক্তৃতা
	ডিসেম্বর	ব্রুকলীন	পাউচ ম্যানসনের বক্তৃতা
১৮৯৫	ফেব্রুআরি	নিউ ইয়র্ক	স্বাধীনভাবে ক্লাস—জুন পর্যন্ত
	জুন প্রথমভাগে	পার্সী	
	মধ্যভাগে	সহস্রদ্বীপোদ্যান	৬।৭ সপ্তাহ যোগ ও বেদান্তের ক্লাস—১০।১২ জন বিশিষ্ট ছাত্র-ছাত্রী
	১৭	নিউ ইয়র্ক	জাহাজ
	অগস্ট শেষে	প্যারিস	১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত
	সেপ্টেম্বর মধ্যভাগে	লণ্ডন	প্রায় দুই মাস
	নভেম্বর ২৭		আমেরিকা যাত্রা
	ডিসেম্বর ৬	নিউ ইয়র্ক	
	২৪	বস্টন	মিসেস ওলিবুলের বাড়িতে
১৮৯৬	জানুআরি প্রথমে	নিউ ইয়র্ক	বেদান্ত সমিতি গঠন
	৫		ফেব্রুআরি ২৪শে পর্যন্ত অবস্থান
	ফেব্রুআরি	ব্রুকলীন	রবিবারে হার্ডম্যান হলে বক্তৃতা; কয়েকটি বক্তৃতা আরম্ভ
		ডেট্রয়েট	দুই সপ্তাহ অবস্থান
	মার্চ ২৫	হার্ভার্ড	বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা
	এপ্রিল ১৫	নিউ ইয়র্ক	ইংলণ্ড যাত্রা
	এপ্রিল শেষে	লণ্ডন	জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত
	অগস্ট	ইওরোপ	ফরাসী, সুইজারল্যাণ্ড, ইতালী, জার্মানি, হল্যাণ্ড ইত্যাদি ভ্রমণ
	সেপ্টেম্বর মধ্যভাগে	লণ্ডন	ডিসেম্বর পর্যন্ত
	ডিসেম্বর ১৭	ইওরোপ	
	৩০		নেপ্‌লস্ হইতে ভারতযাত্রা
১৮৯৭	জানুআরি ১৫		কলম্বো ১০ দিন
	২৬	পামবান	৩ দিন

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিশেষ তথ্য
	জানুআরি শেষ		রামনাদ	
	ফেব্রুআরি	৬	মাদ্রাজ	৯ দিন ক্যাসল কারনানে অবস্থান
	ফেব্রুআরি শেষে		কলিকাতা	অভ্যর্থনা
	মার্চ		দার্জিলিং	এপ্রিল মধ্যভাগ পর্যন্ত
	এপ্রিল-৮মে		কলিকাতা	১লা মে মিশন প্রতিষ্ঠা
	মে		আলমোড়া	আড়াই মাস
	অগস্ট	৯	বেরিলী	৪ দিন অবস্থান
		১৩	আম্বালা	এক সপ্তাহ
		২০	অমৃতসর	৯।১০ দিন
	সেপ্টেম্বর প্রথমে		মুরী	এক সপ্তাহ
		১০	শ্রীনগর	(কাশ্মীর)
	অক্টোবর প্রথমে		মুরী	
		১৫	রাওয়ালপিণ্ডি	৫ দিন
		২১	জম্মু	৮।৯ দিন
			শিয়ালকোট	২।৩ দিন
	নভেম্বর		লাহোর	১০ দিন
			দেরাদুন	১০ দিন
			আলোয়ার	
	ডিসেম্বর		ক্ষেত্রী	
			যোধপুর	১০ দিন
১৮৯৮	জানুআরি		খাণ্ডোয়া	৭ দিন জর
		১৫	কলিকাতা ও	মঠে আড়াই মাস
	এপ্রিল		দার্জিলিং	এক মাস
	মে	৩	কলিকাতা	এক সপ্তাহ
			আলমোড়া	দেড় মাস
	জুন	২০	কাশ্মীর	চার মাস (২১শে জুন হইতে ২৫শে জুলাই পর্যন্ত শ্রীনগরে নৌকায়)
	অগস্ট	২	অমরনাথ	বারামুল্লা

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিশেষ তথ্য
	সেপ্টেম্বর		ক্ষীরভবানী	(কাশ্মীর)
	অক্টোবর	১৮	কলিকাতা ও	মঠ
	ডিসেম্বর	৯	বেলুড় মঠ	মঠ স্থাপন
		১৯	বৈদ্যনাথ	দেড় মাস
১৮৯৯	ফেব্রুআরি	৩	বেলুড় মঠ	
	জুন	২০	কলিকাতা	জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা
	জুলাই	৩১	লণ্ডন	দুই সপ্তাহ উইম্বলডনে বাস
	অগস্ট	১৬		আমেরিকা যাত্রা
		২৬	নিউ ইয়র্ক	একবেলা মাত্র
			রিজলী ম্যানর	মিঃ লেগেটের পল্লীগৃহে দুই মাস
	নভেম্বর	৮	নিউ ইয়র্ক	প্রায় একপক্ষকাল ক্যালিফর্নিয়ার পথে শিকাগো ; কয়েকদিন হেল-গৃহে
		২২	ক্যালিফর্নিয়া	
	ডিসেম্বর	•	লস এঞ্জেলেস	দেড় মাস
১৯০০	জানুআরি		প্যাসাডেনা	প্রায় এক মাস
	ফেব্রুআরি		স্যান ফ্রান্সিস্কো	
	মধ্যভাগে		ওকল্যাণ্ড	আটটি বক্তৃতা
	এপ্রিল		আলামেডা	বক্তৃতা
	জুন	৭	নিউ ইয়র্ক	এক মাস
			ডেট্রয়েট	৭ দিন
	জুলাই	২০	নিউ ইয়র্ক	ইওরোপ যাত্রা
	অগস্ট	১	প্যারিস	প্রায় আড়াই মাস, (কংগ্রেসে)
	অক্টোবর	২৫	ভিয়েনা(অষ্ট্রিয়া)	তিন দিন অবস্থান
		৩০	কনস্টান্টিনপোল	কয়েক দিন
	নভেম্বর		এথেন্স	৪ দিন
			মিশর	কয়েক দিন
	ডিসেম্বর	৯	বেলুড় মঠ	বোম্বাই হইয়া
		২৯	কাঠগোদাম	মায়াবতীর পথে

বৎসর	মাস ও তারিখ		স্থান	বিশেষ তথ্য
১৯০১	জানুআরি	৩	মায়াবতী	অদ্বৈত আশ্রম
		২৪	বেলুড় মঠ	প্রায় দুই মাস
	মার্চ	১৯	ঢাকা	(লাঙ্গলবন্ধে স্নান)
			চন্দ্রনাথ ও	কামাখ্যা
	এপ্রিল		শিলং	২।১ সপ্তাহ
	মে		বেলুড় মঠ	চিকিৎসাদি
১৯০২	জানুআরি		বুদ্ধগয়া	ওকাকুরার সঙ্গে, জন্ম-দিবসে
	ফেব্রুআরি		বারাণসী	প্রায় একমাস
	মার্চ প্রথমভাগে		বেলুড় মঠ	শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উৎসবে
	জুলাই	৪	„	মহাসমাধি ॥

নির্দেশিকা

বিষয়-নির্দেশিকা

বিষয়-নির্দেশিকা

স্থূল অক্ষরগুলি গ্রন্থাবলী-খণ্ডের ও ছোট অক্ষরগুলি পৃষ্ঠাসংখ্যার নির্ণায়ক